টাকাকড়ি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্
গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
১৯৩৬

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি
চক্রবর্ত্তী. চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ,
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা
৯নং পঞ্চানন ঘে

ভূমিকা

[যাদবপুর কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজির অধ্যাপক রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস, বি,-এস, সি-এইচ-ই (ইলিনয়) কর্ত্তৃক লিখিত]

প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিবার পর ১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারি অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার নিকট "আর্থিক উন্নতি" মাসিক চালাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন তাঁহাদের বন্ধুরা বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পত্রিকা প্রকাশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের স্বপক্ষে ছিলেন। কিন্তু বিনয় বাবু তাঁহাদের সকলকে এবং বর্ত্তমান ভূমিকা-লেখককেও এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন :—"আমি দেখাইয়া ছাড়িতে চাই যে, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ইত্যাদি ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বা গ্রন্থ বাহির হয় বাঙ্গলা ভাষায় বাহির হইলে তাহার অধিকাংশের মালই চৌদ্দ-পনের বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে পাকড়াও করিতে পারে।" ডক্টর নরেন্দ্রনাথ বিনয়কুমারের স্বপক্ষেই নিজ সহানুভূতি ও ভাবুকতা প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হন। এই সহযোগিতার ফলে দশ বৎসরের অধিক ধরিয়া বিনয় বাবুর সম্পাদকতায় "আর্থিক উন্নতি" চলিতেছে। * তাহারই অন্যতম ফল,—"নরেন লাহার বারান্দায়"

---

* (প্রথম দুই বৎসর শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি, এ ([illegible]) শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ (অক্‌সন্), বার অ্যাট্ ল

বৎসরে পাঁচ-সাত বার করিয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ নামক বিনয় বাবুর "টোল" বসে। এই পরিষৎ ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত। এই ধরণের "সেমিনার" বা টোল পরিচালনা আমেরিকায় ও জার্ম্মাণিতে অধ্যাপকদের অভ্যাস দেখিয়াছি। এইরূপ টোলের আলোচনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

পূর্ব্বে "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম লেখক এবং বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত প্রণীত "ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩২)। সেই বইয়ের ভূমিকায় আর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত বর্ত্তমান "টাকাকড়ি" গ্রন্থের "নিবেদনে" বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-প্রণালী সুন্দররূপে বিবৃত আছে। অতিরিক্ত মাত্র এইরূপ বলিতে পারি যে, এই পরিষদের ব্যবস্থায় কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থনৈতিক মতামত বা কর্ম্মপ্রণালীর স্বপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে দল পুষ্ট করিবার সুযোগ নাই। প্রত্যেক আলোচনার সময়েই গবেষকেরা এবং সমাগত অতিথিগণ নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া থাকেন। কোন সমস্যা সম্বন্ধে ভোট লইবার বা শেষ সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার ব্যবস্থা নাই।

স্বয়ং গবেষণাধ্যক্ষ বিনয় বাবু যে সকল মতের পৃষ্ঠপোষক তাহার বিরুদ্ধ মতও সুপ্রচারিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মুদ্রানীতি, শুল্ক-

---

(শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, বি এল, (ময়মনসিংহ), ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্ ডি, (কলিকাতা) এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ (উত্তরপাড়া) এই কয়জন সুধী জমিদারের সহযোগিতাও ছিল।

নীতি ইত্যাদি প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত মতামতের এত বিপরীত যে, তাঁহার স্বপক্ষে নেহাৎ বিশেষজ্ঞ মহল ছাড়া অন্যত্র কোন লোক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অপরদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহুসংখ্যক নিরপেক্ষ গ্রন্থ-সমালোচকেরা লিখিয়াছেন যে, যে সকল অর্থনৈতিক মতামত তাঁহার বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থাবলীতে বাহির হইয়াছে সেই সমুদয়ের যুক্তি সমূহ খণ্ডন করা যারপর নাই কঠিন। ইংল্যণ্ডের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ইকনমিক জার্ণ্যাল" পত্রিকায়ও অর্থশাস্ত্রী বিনয়কুমার সম্বন্ধে এইরূপ অভিমতই প্রকাশিত হইয়াছে (মার্চ্চ ১৯৩৬)।

আমাদের দেশে যাঁহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা জানেন যে, একমাত্র যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক বিদ্যার জোরে কোন কারবার চালান যায় না। সকলকেই বাজার-দর, যান-বাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা, টাকাকড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। অর্থাৎ এমন কি এঞ্জিনিয়ারদের পক্ষেও ধন-বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিলে চলে না। সুতরাং বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া দেশের ও জগতের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পরিয়াছি। আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার ছাত্রেরা ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যালাভের ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়। ইলিনয় প্রদেশে আর নিউ জার্সি প্রদেশের এডিসন্ এর কারখানায় এবং পরে জার্ম্মানির বার্লিন সহরের বর্জিস্ এর কারখানায় অনেক দিন ধরিয়া কাজ করিবার সময় ধনবিজ্ঞানকে এঞ্জিনিয়ার মাত্রের বিশেষ সহায়করূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম (১৯১৬-২৪)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদি গবেষকদের

সঙ্গে যোগাযোগের সাহায্যে আমি "পরামর্শ-দাতা" হিসাবে বহুবিধ ক্ষেত্রের গবেষণার ফল সমূহ বিনা পরিশ্রমে লাভ করিতে পারিয়াছি।

ব্যবসায়ী, এঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক এবং অধ্যাপক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর বন্ধুবর্গ অনেক সময় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনা সমূহ হইতে মাঝে মাঝে চিন্তার খোরাক পাইয়া থাকেন। যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আমাদের আলোচনা সমূহের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। পরিষৎও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকেরা অবৈতনিক,—এই কথা বলা আবশ্যক। তাহা সত্ত্বেও সকলেই প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিলে বাঙ্গালা দেশে ধনবিজ্ঞান-গবেষণা যে প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইতে পারে এই তের-চোদ্দ জন গবেষকের কর্ম্মবৃত্তান্ত হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়।

১৯২৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে ভারতীয় সংবাদ-পত্র-সেবী-সঙ্ঘ বিনয় বাবুকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন। এই বক্তৃতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল "ধনবিজ্ঞান ও সংবাদপত্র-সেবা"। তাহাতে তিনি অন্যান্য অনেক কথার ভিতর ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী রিকার্ডোর প্রচারিত ধনবিজ্ঞানের স্বপক্ষে খুব জোর দিয়াছিলেন। বক্তৃতার কিছু দিন পর দেখিলাম যে, দুই "তরুণ" সুধী,—শচীন সেন এম, এ, এবং সুধাকান্ত দে এম এ, বি এল,—রিকার্ডোর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের কয়েক পৃষ্ঠা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়াছেন।

পরে রিকার্ডোর গ্রন্থ বাঙ্গালা অনুবাদে "আর্থিক উন্নতি"তে প্রথম সংখ্যা হইতেই (এপ্রিল-মে ১৯২৬) ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছে। প্রথম প্রথম রচনার ভিতর দুইজন অনুবাদকেরই নাম থাকিত। পরবর্ত্তী অংশ সুধাকান্ত দে একাকী তৈয়ারি করিয়াছেন। সেই অনুবাদ-গ্রন্থ বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সভাপতি এলাহাবাদের মেজর বামনদাস বসু পরিষদ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরের ভিতরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৯৩০)। তাহার পর আমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতপ্রবর স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে আমাদের সভাপতিরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ফলে আমাদের গবেষকগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সভায় উপস্থিত হইতেন। কিন্তু চরম দুঃখের কথা তিনি বর্ত্তমানে শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক সময়ই আমাদিগকে সাহায্য করিতে অসমর্থ। তাহা সত্ত্বেও ১লা জুলাই তারিখে আমরা "পশ্চিম বঙ্গে দুর্ভিক্ষ" সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তাহাতে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিবার আশা দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে গবেষণাধ্যক্ষ বিনয় বাবু ও পরিষদের অন্যতম পরিচালক বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে তিনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সভার দিন তিনি রোগে হঠাৎ শয্যাগত হইয়া পড়েন। কাজেই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। চিঠিখানা অন্যের হাতের লেখা। কিন্তু সম্বোধন এবং শেষের নামসহি নিজের হাতে লেখা ছিল। অন্ধতাবশতঃ তাঁহার হাতের লেখা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া কষ্ট হয়।

সাড়ে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম অধিবেশন মালদহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাহার সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় বিনয়বাবু "সাহিত্য-সেবী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

"কি উপায়ে এবং কত দিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষনীয় বিষয় সমূহে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরেজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে"—ইহাই ছিল তাঁহার মতে "আমাদের এখন প্রধানতম বিবেচনার বিষয়।"

এই "মুদ্দা" সম্বন্ধে সেই বৎসরই এপ্রিল মাসে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মৈমনসিংহ অধিবেশনে বিনয় বাবু "সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব" উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাবের সমর্থকগণের মধ্যে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সাহিত্যরথী জলধর সেন, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং বরিশালের বাগ্মী সুরেন্দ্র নাথ সেন ইত্যাদির নাম দেখিতে পাই।

সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য বিনয় বাবুর প্রতিষ্ঠিত ধনভাণ্ডার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে আজও পরিচালিত হইতেছে।

তখনকার দিনে বিনয় বাবু বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক এবং মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির প্রবর্ত্তকরূপে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকায় "জাতীয়-শিক্ষা"-যুগের বাঙ্গালীর আদর্শই স্বকীয় ধারা রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেই আদর্শ,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে" বাংলা

ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা,—সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হওয়া কবে সম্ভব হইবে আজও অনুমান করা সুকঠিন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমলে বাংলা ভাষাকে ম্যাট্রিক-পরীক্ষার বাহন করা হইল। দুই তিন বৎসর পর এই নিয়মের পরীক্ষা প্রথম অনুষ্ঠিত হইবে। এই ব্যবস্থা কিছুদিন চলিবার পর বোধ হয় উচ্চতর পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে বাহন করার প্রস্তাব উঠিতে পারে। এই সকল ব্যবস্থায় বাঙ্গলা সাহিত্যে ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদিরও সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে আশা করা যায়।

কলিকাতা, বালিগঞ্জ,
২২ সাউথ এণ্ড পার্ক
"আনন্দ-নিলয়"
১৪ জুলাই ১৯৩৬

শ্রীবাণেশ্বর দাস
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের
গবেষকবর্গের পরামর্শদাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

হাজারিবাগ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺প্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয় অধ্যাপনা কালে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি বাংলা ভাষায় বুঝাইতে-বুঝাইতে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না বলিয়াই বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ এই বিষয়টীকে ভালবাসিতে শিখে না এবং সেই হেতু ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মৌলিক গবেষণার অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বাঙ্গলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি আলোচনা করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু ১৯২৩ সনে বি-এ পাশ করিবার পর কলিকাতায় কমার্সে (বাণিজ্য-বিজ্ঞানে) দুই বৎসর এম্-এ পাঠ করিয়াও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন একটা আগ্রহ অনুভব করিতে পারি নাই।

কিছুদিন পর একদিন কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড জংশনে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা বিক্রয় হইতে দেখি। "আর্থিক উন্নতি"র সেইটাই প্রথম বৎসর (১৯২৬)। কাগজখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, মন্দ লাগিল না। কাজেই মাসের পর মাস কিনিয়া কিঞ্চিৎ অনুসন্ধিৎসু হইয়া পাঠ করিতাম। ক্রমশঃ নিজেরও লিখিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে।

কলিকাতায় আইন পরীক্ষা শেষ করিয়া সেই বৎসরই হাজারিবাগ কোর্টে যাইতে সুরু করি (১৯২৬)। অবসর কালে "ষ্টেটস্ম্যান্", "ফরোয়ার্ড" প্রভৃতি পত্রিকার অন্তর্গত অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি মন দিয়া পড়িতাম। ৺মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের এক বিপুল লাইব্রেরী ছিল।

তিনি দার্শনিক সাহিত্যে পণ্ডিত। 'সোসিওলজি' (সমাজশাস্ত্র) বিষয়ক বহু অমূল্য গ্রন্থও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহেশবাবু তাঁহার এই বৃহৎ লাইব্রেরী আমার নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এবং নানা বিষয়ে আলোচনার দ্বারা আমার বিদ্যাচর্চ্চার ইচ্ছা বাড়াইয়া দেন।

দেখিতে দেখিতে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে একখানা বই বাংলা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার কিছু-কিছু 'আর্থিক উন্নতি'র সম্পাদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের নিকট পাঠাই। তখন তাঁহার নামই শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তিনি আমার লেখার পাণ্ডুলিপি যত্নের সহিত দেখিয়া তাহা 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় মুদ্রিত করেন (এপ্রিল-মে ১৯২৮)। অধিকন্তু চিঠি লিখিয়া কি প্রণালীতে লেখা-পড়া আর আলোচনা-গবেষণা চালাইতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই সকল নির্দ্দেশই—"বস্তুনিষ্ঠা" আর "দুনিয়ানিষ্ঠা"র হদিশই—আজ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় আমাকে সাহায্য করিতেছে।

যে যুগে "আর্থিক উন্নতি" প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়ে বাংলা-ভাষায় অর্থনীতি চর্চ্চা যে চলিতে পারে একথা সাধারণে খুব জোরের সহিত বিশ্বাস করিত না। আমার শ্রদ্ধা তাই এই কাগজটী সহজেই আকর্ষণ করে। সেইজন্য যখন অধ্যাপক সরকার "আর্থিক উন্নতি"র নিয়মিত লেখকগণকে লইয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন (অক্টোবর ১৯২৮), তখন আমিও তাহার অন্তর্গত হইয়া পড়ি। যে কয়জনকে লইয়া পরিষৎ গঠিত হইল তাঁহাদিগকে "গবেষক" রূপে বিবৃত করা হয়। আমি অন্যতম "গবেষক" হইলাম। তখনও আমি হাজারিবাগে।

পরিষৎ তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার বারান্দায়

চল্লিয়া আসিতেছে। এই বারান্দায় স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও উপস্থিত থাকিয়া গবেষকগণকে উৎসাহ দিয়াছেন। পরিষৎকে আমরা বিনয়বাবুর "টোল" বলিয়া থাকি। এই টোলের গবেষকেরা যার যেমন সময় ও সুযোগ সে সেইরূপ লোকজনের সঙ্গে "মোলাকাৎ" করে, দেশী ও বিদেশী কাগজপত্র পড়াশুনা করে ইত্যাদি। দরকার হইলে মাঝে মাঝে গবেষণাধ্যক্ষ বিনয় বাবুর বাড়ীতে গিয়া বাজার-পর্য্যটন, কারখানা-পরিদর্শন, পত্রিকা-পাঠ ইত্যাদি সম্বন্ধে হদিশ লওয়া হয়। বৎসরে পাঁচ-ছয়টা বৈঠক বসে। তাহাতে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলে।

১৯২৮ এর শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। সেই সময় বিনয়বাবুর সহিত পরিচয় হয়। তাহার কিছুদিনের ভিতরেই ১৯২৯ সনের মে মাসে তিনি দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু তখন হইতে আমি 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকার মাসিক লেখক। দেশবিদেশের নানা অর্থ-নৈতিক পত্রিকা হইতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী, ব্যাঙ্কিং, বীমা, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা এই গবেষণার আর রচনাবলীর অন্যতম অঙ্গ।

১৯২৯ সনে আমেরিকায় 'সঙ্কট' দেখা দিয়াছে। তাই সে বিষয়ে পড়াশুনা করিয়া 'ব্যাঙ্ক-ফেলের মর্ম্মকথা—আধুনিক মার্কিনের দৃষ্টান্ত,' 'ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচনে সতর্কতা', 'আমেরিকার বাড়্তি পণ্য নিবারণ', 'প্রাচুর্য্য কি বর না অভিশাপ', 'ষ্টক বাজারে দুর্য্যোগ ও ছোট খাট ষ্টক হোল্ডার' প্রভৃতি প্রবন্ধ 'আর্থিক উন্নতি'তে প্রকাশ করি। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত "উদয়ন" মাসিকেও 'মার্কিণের আর্থিক দুর্গতি ও তাহার সমাধানের প্রচেষ্টা' এবং 'মার্কিণের সংরক্ষণ-নীতি' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখি (১৯৩৪)।

১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে বিনয়বাবু দেশে ফিরিয়া আসেন। তখন বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের "টোল" জোরের সহিত চলিতে থাকে। এই সময়ে আমি তাঁহার নির্দ্দেশে আধুনিক জাপান সম্বন্ধে পড়াশোনা আরম্ভ করি। এই পড়াশোনার অন্যতম ফল,—'উদয়ন' পত্রিকায় জাপানের রাজস্ব সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ প্রকাশ। 'হিতবাদী'র সম্পাদক একটা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিবার মতলবে আমাকে প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। তাহার জন্যও 'জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য' সম্বন্ধে লিখি (১৯৩৪)। পর বৎসর "হিতবাদী"র বিশেষ সংখ্যার জন্য আবার তাগিদ আসে। তাহাতেও "জাপানের ব্যাঙ্ক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান" সম্বন্ধেই আলোচনা করি (জুলাই ১৯৩৫)।

"কলিকাতায় মালদহ"-সমিতি বলিয়া মালদহবাসীদের একটী প্রতিষ্ঠান আছে। যাদবপুর কলেজ অব্ এঞ্জিনিয়ারিংয়ের রসায়ন-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক। তাঁহাদের উদ্যোগে কলিকাতার মহাবোধি হলে আমি "জাপানের মজুর ও মজুরি" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করি (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। জাপানের যানবাহন সম্বন্ধে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনা করি (এপ্রিল ১৯৩৫)। আমেরিকার মতন জাপানবিষয়ক আলোচনাগুলাও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-গণ্ডীরই অন্তর্গত।

টোলের কয়েক বৈঠকে আলোচনার সময় অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে, মূল্য বিষয়ক অর্থশাস্ত্র (প্রাইস্ ইকনমিক্স্) সম্বন্ধে ভারতে বেশী গবেষণা হয় নাই,—এই দিকে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার দিকে আমার প্রবৃত্তি

হইল। ১৯২৯এর পর হইতে বিশেষতঃ স্বর্ণমান ত্যাগের পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় দরের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য কয়েক বৎসরের সরকারী 'ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড্ জার্ণাল' লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকি। যথা সময়ে 'মন্দার যুগে বাজার দর' সম্বন্ধে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে এক প্রবন্ধ পাঠ করি (১২ মে ১৯৩৫)। প্রবন্ধটি প্রথমে মাসিক "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

আজকাল অর্থনৈতিক প্রবন্ধ মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকগণের কথঞ্চিৎ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিষাণ' নামক পাক্ষিক পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র মহাশয় আর্থিক অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। তাহার ফলে 'পাটের দুর্গতি', 'বাণিজ্য প্রসারের উপায় কি?' 'তৈলবীজ সম্বন্ধে ভাববার কথা', 'কফি-সেস্,' 'ভারতীয় তূলার ভবিষ্যৎ' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সবও পরিষদের গবেষকগণের আলোচনা-ক্ষেত্রের ভিতর পড়ে। "আর্থিক উন্নতি"তে এই সকল বিষয়ে গবেষকদের রচনা নিয়মিতরূপে বাহির হয়।

টাকাকড়ি বিষয়ক আলোচনা সুরু করি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ঘোষ এম্-এ (ক্যাণ্টাব) মহাশয়ের সম্পাদিত "সদ্‌গোপ-পত্রিকায়"। তাঁহার নিকট আমি উৎসাহ পাইয়াছি। এই বই প্রকাশের সময় তাহা কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করা আবশ্যক।

বন্ধুবর অ্যাড্‌ভোকেট বিনয় দত্ত বি-এস-সি, বি-এল বইটার আগাগোড়া প্রুফ্ দেখিয়া এবং স্থানে-স্থানে ভাষার উন্নতি করিয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

'টাকার কথা' প্রণেতা নরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, রিকার্ডোর অনুবাদক সুধাকান্ত দে, এম্-এ, বি-এল্, "ধনবিজ্ঞানে সাকুরেতি" এবং "কন্‌ফ্লিক্‌টিং

টেন্‌ডেন্‌সিজ্‌ ইন ইণ্ডিয়ান্‌ ইকনমিক থট্‌" প্রণেতা শিবচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌, 'ইকনমিক সার্ভিসেজ্‌ অফ্‌ জমিন্‌দার্স'-প্রণেতা, অ্যাড্‌ভোকেট্‌ পঙ্কজকুমার মুখার্জ্জী এম্‌-এ, বি-এল্‌, সংখ্যা-বিজ্ঞান ও টাকাকড়ি বিষয়ক সন্দর্ভ-লেখক গোপালচন্দ্র রায় বি-এস্‌ সি, বি-এল, মজুর ও মজুরী বিষয়ক সন্দর্ভ-লেখক মন্মথ সরকার এম্‌-এ, বীমা বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক এবং বর্ত্তমানে ইতালির রোম-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মনীন্দ্রমোহন মৌলিক, বি, এ প্রভৃতি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-বন্ধুগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় অর্থনীতি বিষয়ক সমস্যাগুলির বিভিন্ন অঙ্গের সহিত সহজে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহাদের সহযোগিতা না পাইলে নীরস অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহ সরস ও সজীব মনে হইত কিনা সন্দেহ। তাই তাঁহারাও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সুহৃৎ ও অন্যতম পরিচালক এবং গবেষণার সহায়ক ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা আমাদের জন্য তাঁহার গ্রন্থাগার পুষ্ট করিয়া রাখেন। তাঁহার বাসভবনের বারান্দাতেই আমাদের টোল যথাসময়ে বসিয়া থাকে। অধিকন্তু মাসিক 'আর্থিক উন্নতি'র উপর তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি আছে। এই সাড়ে দশ বৎসর ধরিয়া ডক্টর লাহা আমাদের জন্য যাহা করিয়া চলিতেছেন, তাহা আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির বৃত্তান্তে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গবেষকদের ন্যায় আমিও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ডক্টর লাহার অমায়িক ব্যবস্থায় পরিষদের গবেষক বা অতিথিবর্গ কেহই "অনুগৃহীত" বোধ করেন না। বিনা ভাড়ায় বারান্দা পাইয়া আমরা সকলেই আনন্দিত। অধিকন্তু এই টোলের ভিতর "অফিস চালাইবার" অথবা নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে কোথাও যাইয়া উপস্থিত হইবার বাধ্য-বাধকতা নাই।

সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে আপন মনে গবেষণা করে এবং স্বাধীন ভাবে লেখাপড়া চালাইতে অভ্যস্ত। গবেষণাধ্যক্ষকেও নিজ গবেষণার বাহিরে যাইতে হয় না। বরং তিনি অনেক সময়ে বলিয়াছেন :—"পরিষদে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয় তাহার ফলে আমার নিজের পঠন-পাঠনের জন্য প্রচুর সাহায্য পাই।"

অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ফরোয়ার্ড, অ্যাডভান্স ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকার পরিচালকবর্গের নিকট আমার মতন অন্যান্য "তরুণ" লেখক ও গবেষকগণ যার পর নাই ঋণী। তাঁহারা আমাদের পরিষদের আলোচনা সমূহ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু আমাদের প্রবন্ধাবলী ও তর্কপ্রশ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দিতেছেন। তরুণ অর্থশাস্ত্রী ও অন্যান্য সাহিত্যসেবীদের তরফ হইতে আমি এই সুযোগে পত্রিকাসমূহের পরিচালকগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

৭৯/৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
৬ই জুলাই ১৯৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—টাকাকড়ির কাজ	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য	...	৭
তৃতীয় অধ্যায়—মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কৌশল	...	১২
চতুর্থ অধ্যায়—টাকাকড়ির পরিমাণ ও দর	...	২২
পঞ্চম অধ্যায়—দেশ-বিদেশের সিক্কা	...	৪০
ষষ্ঠ অধ্যায়—গ্রেশাম বিধি	...	৪৮
সপ্তম অধ্যায়—দ্বিধাতুমান	...	৫৮
অষ্টম অধ্যায়—কাগজী মুদ্রা	...	৭৮
নবম অধ্যায়—ক্রেডিট বা পসার ও ব্যাঙ্কের কাজ	...	৯১
দশম অধ্যায়—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক	...	১০২
একাদশ অধ্যায়—আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা	...	১১২
দ্বাদশ অধ্যায়—বিল ভাঙ্গান	...	১২৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়—রূপার বাজার	...	১৩৪
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—কারেন্সি ষ্টেবিলাইজেশন্ বা সিক্কা স্থিতিকরণ	...	১৩৭
পঞ্চদশ অধ্যায়—বাজার-দর, স্বর্ণমান ও অটাওয়া-চুক্তি	...	১৫৩
ষোড়শ অধ্যায়—টাকার বাজার ও সরকারী কর্জ্জ	...	১৮৫
পরিশিষ্ট—ভারতীয় টাকাকড়ি	..	১৮৯
গ্রন্থপঞ্জী	...	১৯৬
নির্ঘণ্ট	...	২০০

টাকাকড়ি

প্রথম অধ্যায়

টাকাকড়ির কাজ

ধাতব মুদ্রার প্রধান গুণ এই যে ইহার একটা বিনিময় মূল্য আছে। এই বিনিময় মূল্য থাকার জন্য ইহা টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে। সভ্য জগতে টাকাকড়ি পণ্য বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। ফরাসী অর্থনীতি বিশারদ ব্লক্ সুন্দরভাবে টাকাকড়ির বিশেষত্বগুলি বিবৃত করিয়াছেন:

"টাকাকড়ি পণ্যমাত্র হইলেও, ইহার বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা ইহা লোকে অধিক পছন্দ করে। সর্ব্বক্ষেত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার মূল্য একই থাকে—অন্ততঃপক্ষে যে-সকল টাকাকড়ির আকৃতি মূল্য, অভ্যন্তরীণ মূল্যের সমান হয় সেইগুলির। সৃষ্ট পণ্য বা কাঁচা মালের মত ইহা ব্যবহারিকদিগের হস্তে বিনষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য নির্ম্মিত হয় না, যেহেতু, হাত হইতে হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আবার গন্তব্যপথে যাওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।"

সমাজে, টাকাকড়ির কর্ত্তব্যের সহিত পথঘাটের কর্ত্তব্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অ্যাডাম স্মিথ্ বলেন, "কোন দেশে যে-সব সোণা

রূপার টাকাকড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের রাজপথের সহিত তুলনা করা চলে ; রাজপথ ঘুরিতে ঘুরিতে দেশের সমুদয় তৃণ ও শস্য বাজারে বহন করিয়া লইয়া যায় ; কিন্তু নিজে কোনটীর একটী আঁটিও উৎপাদন করে না।"

টাকাকড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পুঁজীর সহিত ইহার তফাৎটা জানিয়া রাখা আবশ্যক। টাকাকড়ি হইতেছে মাত্র এক প্রকারের পুঁজী ; পুঁজী বলিতে আরো অনেক কিছু বোঝায়। যাহা কিছু বিনিময়সাধ্য দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করে বা মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে তাহাই পুঁজীর অন্তর্গত।

এইবার দেখা যাউক টাকাকড়ির কাজ কি ? টাকাকড়ির প্রধানতঃ পাঁচটী কাজ—

(১) বিনিময়ের বাহন (৩) মূল্যের মান
(২) সাধারণ পরিজ্ঞাপক (৪) মূল্যের ভাণ্ডার
(৫) স্থগিত পরিশোধের নিদর্শন

(১) **বিনিময়ের বাহন**—প্রত্যেক সমাজেই টাকাকড়ির প্রধান কাজ হইতেছে বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতা করা। নিকোলসন্ বলেন,

"সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে একটা বিনিময়ের বাহন (মধ্যবর্ত্তী) থাকা একান্ত আবশ্যক। শ্রম-বিভাগের উপর উৎপাদন নির্ভর করে এবং শ্রম-বিভাগের উদ্দেশ্য, সহজে ও সত্বর বিনিময় সাধন করা ; সুতরাং সাধারণ মধ্যবর্ত্তিতার কথা আসিয়া পড়ে। ভাব আদান-প্রদানের জন্য ভাষা যেরূপ আবশ্যক, মাল আদান-প্রদানের জন্য টাকাকড়িও তদ্রূপ আবশ্যক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মাল আদান প্রদানের অর্থ এই যে, যে-কর্ম্মের দ্বারা মাল উৎপাদন হইয়াছে, সেই কর্ম্মের বিনিময়। তাই বিনিময়ের (বাহন) মধ্যবর্ত্তী হিসাবে টাকা-

কড়ির আবশ্যকতা—উর্দ্ধতন হইতে অধস্তন সকল প্রকার শ্রমের বিনিময়ের জন্য।”

(২) **সাধারণ পরিজ্ঞাপক**—একটা সাধারণ পরিজ্ঞাপক নাম থাকার সুবিধা এই যে ইহার দ্বারা সকল কিছুকেই একটা সাধারণ মানের অন্তর্গত করিয়া বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের তুলনা করা সম্ভব হয়। যদি এরূপ একটী পরিজ্ঞাপক না থাকিত তবে প্রত্যেক বস্তুর মূল্যকে অপর একটী পণ্যের মূল্যের মধ্যে আনিয়া হিসাব করিতে হইত। যদি একজোড়া ছাগল একটা চেয়ারের সমান হয় আর একটা জামা একজোড়া ছাতার সমান হয়, তবে চেয়ারের মূল্যের সহিত জামার মূল্যের তুলনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এস্থলে তুলনা করিতে হইলে একটী সাধারণ পরিজ্ঞাপক বা “কমন্ ডিনমিনেটর” করিয়া লইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ছাগলকে সাধারণ পরিজ্ঞাপক ধরিয়া লইলে, প্রথমতঃ, চেয়ারের সহিত ছাগলের সম্বন্ধটা দেখিতে হইবে; পরে আবার ছাগলের সহিত জামার অনুপাতটা দেখিলে তবেই চেয়ারের সহিত জামার মূল্য তুলনা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু একটা সাধারণ মান না থাকিলে ইহাও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। পরস্পর বিনিময়সাধ্য ১২টী বস্তুর তুলনা করিতে হইলে ৬৬টী বার হিসাব করিতে হইবে; প্রথমটীকে অবশিষ্ট ১১টীর সহিত তুলনা করিবার পর, দ্বিতীয়টীকে আবার ১১টীর সহিত তুলনা করিতে হইবে, শেষেরটী পর্য্যন্ত এইভাবে চলিতে হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই সমস্ত হিসাব স্মরণ রাখিয়া লেন-দেন করা প্রায় অসম্ভব। টাকাকড়িকে সাধারণ পরিজ্ঞাপক করিয়া মানুষ এই সব অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আমি যে মুহূর্ত্তেই জানিলাম যে আমার ১ মণ ধানের দাম ১০ টাকা, সেই মুহূর্ত্তেই এই ১০ টাকায় যে সব বস্তু

ক্রয় করা যাইবে তাহাদের এই ১ মণ ধানের সহিত তুলনা করিয়া লইলাম।

(৩) **মূল্যের মান**—দর বা মূল্য বস্তুগত নহে; ইহা মানবের অভাব বা সন্তোষ হইতে উদ্ভূত; ইহা বিভিন্ন মালের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে মাত্র। বস্তুর ওজন বা তাপের দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না; মানুষের মনের মধ্যে বস্তু বিশেষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহার দ্বারাই মূল্য স্থির হয়। সুতরাং মূল্যের মান বা "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" মূল্যের পরিমাণ হইতে পারে না; মূল্যের মান, মূল্য ব্যক্ত করিবার একটী সুবিধাজনক পাল্লা মাত্র।

বর্ত্তমান শিল্প সমাজে মূল্যের আদর্শ হিসাবে, টাকাকড়ির ব্যবহার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়ি সাধারণ পরিজ্ঞাপক বলিয়া সকল প্রকারের চুক্তি টাকাকড়ির ভাষায় ব্যক্ত হইতেছে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, 'মূল্যে'র মানের অপরিবর্ত্তনীয় মূল্য থাকা আবশ্যক। যদি আদর্শটী অপরিবর্ত্তনীয় না হয়, তবে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তির বাড়্তি-কম্তিতে চুক্তিকারীদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা না বাড়িয়া যদি টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি বাড়ে, তবে যে-ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইবে তাহাকে, ক্রয়শক্তি না বাড়িলে যাহা দিতে হইত তাহা অপেক্ষা অধিক দিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, তাহা হইলে সে চুক্তি করিবার সময় যে-পরিমাণ টাকা পাইবার আশা করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা কম পাইবে।

যে-সকল দেশে মূল্যের মান বা "ষ্ট্যান্ডার্ড্ অফ্ ভ্যালু" স্থির থাকে তথায় চুক্তিকারীরা ভবিষ্যতে আপেক্ষিক স্থির-মূল্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধাতু পাইবার আশা রাখে। এইরূপ ক্ষেত্রে অল্প মুনফায়

বৃহৎ বৃহৎ কারবার চালান সম্ভব হয়। কোন কোন দেশে মুদ্রার আকৃতি-মূল্য না কমাইয়া, ধাতুর পরিমাণ কম করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিনিময় হারের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে। যে-পরিমাণ ধাতু কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনুপাতে দর বাড়িয়া যায়; সেই সব সময়ে সম-পরিমাণ ধাতু দিয়া তবেই পণ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপের রাজন্যবর্গ সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য ও সরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য, এই পন্থা অবলম্বন করিতেন।

(৯) **মূল্যের ভাণ্ডার**—টাকাকড়ি মূল্যের ভাণ্ডার, যেহেতু ইহা এমন একটী পণ্যের মধ্যে মূল্য ধরিয়া রাখে যাহা সকলের নিকটই আদরণীয় ও যাহা সহজে নষ্ট হইয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

বিনিময়-সাধ্য বা নেগোশিয়েব্‌ল্ সিকিওরিটিস্ চলনের পূর্ব্বে টাকাকড়িই একমাত্র মূল্যের ভাণ্ডার ছিল। মাত্র তিন প্রকার বস্তুর বস্তুগত মূল্য আছে:—(১) ভোগ্য পণ্য (কাঁচামাল প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত); (২) স্থায়ী পুঁজী (যথা, ফ্যাক্টরী, রেলওয়ে ও জমি); (৩) টাকাকড়ি। ক্ষতি স্বীকার না করিয়া ভোগ্য বস্তু পুঁজী করিয়া রাখা যায় না। যদি টান না থাকে, তবে স্থায়ী পুঁজী বৃথা হইয়া দাঁড়ায়; তাহা ছাড়া নানা কারণে স্থায়ী পুঁজীর দর কমিতে পারে। "নেগোশিয়েব্‌ল্ সিকিওরিটিস্"কে এবংবিধ পুঁজীর প্রতীক বলা চলে; এই সিকিউরিটীগুলি যদিও বিনিময়-সাধ্য তথাপি ষ্টক-বাজারের কার্য্যকলাপের জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে ইহাদের দর কমিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে টাকাকড়িই একমাত্র বস্তু যাহার দর সহজে কমে না বা যাহা সহজেই বিনিময় করা চলে। যদিও নানা কারণে টাকাকড়ির দরের অদল-বদল হইতে পারে, তথাপি ইহার

বিশেষত্ব এই যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে ইহার পরিবর্ত্তে ইচ্ছানুযায়ী বস্তু পাইতে পারি।

টাকাকড়িই মূল্যের ভাণ্ডার হওয়ার আর এক সুবিধা এই যে, মাল রপ্তানি করিয়া ঋণ শোধ করিতে হয় না, টাকাকড়ি পাঠাইলেই চলে।

(৫) **স্থগিত পরিশোধের নিদর্শন**—সভ্য জগতে ক্রেডিট প্রণালী বিকাশ লাভ করিয়াছে; তাই টাকাকড়ি স্থগিত রাখা পরিশোধের নিদর্শনরূপেও ব্যবহৃত হয়। ভবিষ্যতে টাকাকড়ি দিবার চুক্তি এ যুগে প্রসার লাভ করিয়াছে; এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আদর্শ বা মান (ষ্ট্যাণ্ডার্ড্) ঠিক্ রাখার মূল্য বোঝা যায়। শিল্প জগতে অধিকাংশ লোককেই ভবিষ্যতে টাকাকড়ি পাইবার আশার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। মজুর আশা করিয়া থাকে যে অদূর ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী পাইবে; তাহা দ্বারা পরিবারের ও নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিবে। ভবিষ্যতে বিক্রয়ের আশা করিয়াই লোকে মাল উৎপাদন করে, অপরে আবার ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া মাল উৎপাদনের উপায়গুলি সৃষ্টি করে, এইরূপেই সমস্ত শিল্পজগৎ চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টাকা-কড়ির বৈশিষ্ট্য

সোণারূপা বহুশত বৎসর হইতে সভ্য জগতে বিনিময়ের বাহন ও মূল্যের নিদর্শনরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আদিম যুগে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখে নাই তখন জীবনধারণোপযোগী আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই ব্যক্তিমাত্রকেই উৎপাদন করিতে হইত। সমাজবদ্ধ হইয়া উঠিবার পর মানুষ পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় করিয়া অভাব পূরণ করিতে শিখে। এইরূপে দ্রব্য বিনিময় যখন সকলের মধ্যে চলিয়া গেল তখন দেখা গেল যে, এরূপ কতকগুলি পণ্য আছে যাহা সকলেই চায় এবং যাহার বিনিময়ে যে-কোন সময়ে অপর যে-কোন অভীপ্সিত বস্তু পাওয়া যাইতে পারে। পরিশেষে এইরূপ পণ্যই বিনিময়ের বাহন হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন কৃষি-উপজীবিকা প্রধান গ্রীক সমাজে গবাদি পশু বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইত। সকল পণ্যের মূল্য স্বরূপ গবাদি পশু গ্রহণ করা হইত। প্রাচীন গ্রীক সমাজে কর্ম্মপটু দাসীর মূল্য চারিটী ষণ্ডের সমান বলিয়া ধরা হইত। এযুগেও ভারতের বহু আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কন্যার মূল্য স্বরূপ ভাবী স্বামীর নিকট হইতে গবাদি পশু কন্যার পিতা আদায় করিয়া থাকেন। কোন কোন দেশে মৎস্য, চর্ম্ম, তামাক প্রভৃতিও টাকা-কড়িরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। শিল্প উন্নতি ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রচলনের পর বিনিময়ের বাহনরূপে ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। শস্য ও পশু দেশ-বিদেশে বহন করিয়া লইয়া

যাওয়া সকল ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নহে এবং বিদেশী ব্যাপারী সকল সময়ে তাহা লইতেও চাহে না। টিন, তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি ধাতু নানা কার্য্যে লাগে এবং স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াও সহজ, সেই হেতু সকল দেশের লোকের কাছে তাহাদের একটা মূল্য আছে। ধাতুগুলি তাই, সহজেই বিনিময়ের বাহন হইতে পারিয়াছিল। ধাতু ওজন করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হইত। কিন্তু যদি দ্রব্য আদান প্রদানের সময় সকল ক্ষেত্রে ধাতু ওজন করিয়া মূল্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে কাজের ঝঞ্ঝাট বাড়িয়া যায় এবং ওজনের জুয়াচুরি হইতে নিস্তার পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠে। এই ওজন ঠিক রাখিবার জন্য, যে সব সোণা, রূপা, তামা, টীনের তাল সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা কুঠিয়ালের হাতে আসিয়া পড়িত তাঁহারা তাহাতে স্বীয় স্বীয় নাম অঙ্কিত করিয়া দিতেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। তখন রাষ্ট্র, ধাতুর উপর স্বীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া লোকের বিশ্বাস বিনিময়ের বাহনের উপর অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। সকল ধাতুর মধ্য হইতে টাকাকড়ি নির্ম্মাণের জন্য সোণা-রূপাকে বিশেষভাবে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ সোণা-রূপার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে দেওয়া হইল :—

(১) **বিনিময় মূল্য**—টাকাকড়ি এরূপ একটী পণ্য হওয়া আবশ্যক যে, অপর কোন পণ্যের সহিত তাহার বিনিময় সাধন করিলে কোনরূপ লোকসান না হয়। বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই যে টাকাকড়ির মূল্য থাকে তাহা নহে, কেননা আদিম যুগে পণ্যরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই সোণা-রূপার মূল্য ছিল। সোণা-রূপা এখনও আমাদের ঘরে ঘরে অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত

হইয়া থাকে; আবার সোণা-রূপাই বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এত বিভিন্ন কার্য্যে সোণা-রূপাকে লাগান যায় যে একমাত্র সেই জন্যই তাহাদের বিনিময় মূল্য আছে।

(২) **মূল্যের স্থিরতা**—সোণা-রূপা এক রকম অক্ষয় বস্তু এবং ইহাদের যোগানেরও একটা সীমা আছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যদি সোণা-রূপার উৎপাদন সহজেই করা যাইত বা মাটী খুঁড়িয়া যদি শত সহস্র মণ সোণা তোলা সম্ভব হইত তবে যোগান কম বেশী হওয়ার জন্য বিনিময় মূল্য বাড়িত বা কমিত। অধিকন্তু সোণা অতি মূল্যবান ধাতু বিশেষ এবং দুষ্প্রাপ্যও বটে ও উৎপাদন করিতে খরচাও যথেষ্ট হয়। সুতরাং মূল্যের তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

(৩) **সমজাতীয় পদার্থ**—(হোমোজিনীটী অফ্ মেটিরিয়েল্) —সোণা-রূপা এরূপ এক শ্রেণীর পদার্থ, যে, দুইটী সমান ওজন বিশিষ্ট একবিধ ধাতুর মূল্য একই হয়। বিভিন্ন খনির সোনার রং একটু আধটু পৃথক হইতে পারে কিন্তু তাহার জন্য ধাতুর মূল্য পৃথক হয় না। ক্যালিফোর্ণিয়ার খনি হইতে উঠান একসের খাঁটী সোণার বিনিময়-মূল্য অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বা দাক্ষিণাত্য হইতে পাওয়া একসের খাঁটী সোণার সমান হয়। অপর কোন পণ্যই সাধারণতঃ এরূপ হইতে দেখা যায় না।

(৪) **স্থায়িত্ব**—সোণা-রূপা, কর্পূরাদির মত উড়িয়া যায় না বা মাছ-মাংসের মত পচিয়া যায় না। টিন, লোহা প্রভৃতিতে সহজে মরিচা পড়িয়া যায়। উন্মুক্ত স্থানে বহুদিন ধরিয়া রূপা রাখিলে চাকচিক্য একটু কমিয়া যায় বটে কিন্তু আভ্যন্তরিক মূল্য বা ওজন কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। খোলা স্থানে পড়িয়া থাকিলেও

সোণার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। সোণা ও রূপা বহু সহস্রবার হাতফের করিবার পর এত অল্প পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় যে, বহু বৎসর গত না হইলে ক্ষয় লক্ষিত হয় না এবং এই সামান্য ক্ষয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব হইতেই স্থির করা সম্ভব।

(৫) **মূল্য না কমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাওয়া**—একটা বড় সোণার তালকে যদি দশটা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় তবে এই দশ খণ্ড সোণার মূল্য ঐ বৃহৎ তালটীর মূল্যের সমানই হইবে, খণ্ড করা হইয়াছে বলিয়া মূল্য কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে না এবং ঐ ক্ষুদ্র একটী খণ্ডের মূল্য ঐ বৃহৎ সোণার তালের মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ হইবে। কেহ কেহ হীরককে টাকা কড়ি হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু হীরকের এই গুণটী নাই। দশ রতি ওজনের এক টুকরা হীরার মূল্য একরতি ওজনের একটী হীরার মূল্যের দশ গুণ অপেক্ষা অনেক অধিক। সোণা, পাউণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ঐ পাউণ্ডের সোণাকে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করিয়া আবার শিলিংরূপে ব্যবহার করা হয়। রূপায় টাকা হয় আবার সিকিও হয়।

(৬) **ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রচুর মূল্য**—অল্প একটুখানি দ্রব্যের মূল্য যদি অধিক হয় তবে তাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে চালান করা সহজ হইয়া পড়ে। সোণা-রূপার এই গুণটী আছে বলিয়া দুনিয়ার সকল অংশে একই সময়ে মূল্য প্রায় একই থাকে।

(৭) **মুদ্রাকরণের সুবিধা**—সোণা-রূপা একাধারে নমনীয় ও কঠিন বলিয়া যে কোন ছাপ ইহাদের উপর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া

যায়, তাহা কোন প্রকারেই নষ্ট হইয়া যায় না। যদি এই ধাতুগুলি অত্যন্ত কঠিন হইত তবে যৎসামান্য খরচায় কোনরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না। এবং যদি অত্যন্ত নমনীয় হইত তবে সহজেই ছাপ মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল এবং হাত ফের করার জন্য ওজন কম হইয়া মূল্যের ব্যতিক্রম ঘটান অসম্ভব ছিল না।

অন্যান্য অনেক ধাতুকেই টাকাকড়িরূপে ব্যবহারের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কোনটীই কার্য্যকরী হয় নাই। উর্য়াল্ পর্ব্বতে রুশ সরকার একটী প্লাটীনাম্ খনি আবিষ্কার করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্লাটীনামকে টাকাকড়ির আদর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলতা লাভ করেন নাই। *

* নরেন্দ্রনাথ রায়ের "টাকার কথা" দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কৌশল

আধুনিক সভ্যজগতে সোণা-রূপা মুদ্রারূপে কেন ব্যবহৃত হইতেছে সে কথা পূর্ব্ব অধ্যায়েই আলোচনা করা হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড ধাতুর উপর বিশেষ ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়া মুদ্রায় পরিণত করা হয়। সরকারের নিদর্শন বিশিষ্ট এইরূপ ধাতুখণ্ডকে **মুদ্রা** কহে। আধুনিক যুগে সকল দেশে মুদ্রা তৈয়ারী সরকারই করিয়া থাকেন, সরকারের উপর সাধারণের অটুট বিশ্বাস আছে বলিয়া সরকারের নাম অঙ্কিত মুদ্রা-গুলি সহজেই বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুদ্রাগুলি এরূপভাবে তৈয়ারী করা হয় যে, সেগুলির ধার হইতে স্বল্পতম অংশ কর্ত্তন করিয়া লইলেও তাহা সহজেই চোখে পড়া সম্ভব। তাই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠে ছাপ দেওয়া হয় ও ধারগুলি কাটা হইয়া থাকে। যদি মুদ্রাগুলি কেবলমাত্র গোলাকার চেপ্টা ও চিক্কণ ধার বিশিষ্ট হইত তবে ধার হইতে যদি কিয়দংশ কাটিয়া বা কুরিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইত তবে সেই সামান্য জুয়াচুরি সহজে ধরিয়া ফেলা যাইত না। আজকাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে মুদ্রাগুলি এরূপ নিপুণতার সহিত তৈয়ারী করা হয় যে এরূপ গোলযোগ হইবার উপায় কম।

খাঁটী সোণা বা রূপা দিয়া কখনও মুদ্রা তৈয়ারী করা হয় না। সোণা রূপার সহিত খাদ না মিলাইলে উচিত মত শক্ত হয় না, নরম থাকিয়া যায় এবং সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে; তাই সাধারণতঃ

কিঞ্চিৎ পরিমাণ খাদ মিলাইয়া মুদ্রা তৈয়ারী করা হয়। (সোণার সহিত রূপা ও তামা এবং রূপার সহিত তামা খাদ দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ মুদ্রায় খাদ থাকে দশ ভাগের এক ভাগ আর যুক্তরাজ্যে স্বর্ণমুদ্রায় খাদ থাকে বার ভাগের এক ভাগ।)

আধুনিক সভ্যদেশ সমূহে অবাধ মুদ্রা তৈয়ারী প্রথা আছে অর্থাৎ যে-কেহ সোণার তাল টাঁকশালে জমা দিয়া সেই তালে মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া লইতে পারেন। যে-কেহ এই ভাবে সোণার তালকে মুদ্রা করাইয়া লইতে পারেন বলিয়া, মুদ্রা ও সেই ওজনের সোণার তালের বিনিময় মূল্য একই থাকে, তফাৎ হয় না। যে সকল দেশে রাষ্ট্র, সোণার তালকে বিনি খরচায় মুদ্রায় পরিণত করিয়া দিতে বাধ্য, সেই সকল দেশে চলতি-টাকাকড়ির পরিমাণ রাষ্ট্র, নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সোণার তাল মুদ্রায় পরিণত করাইবার জন্য টাঁকশালে লইয়া আসেন তাঁহারা দেশের টাকাকড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করেন। মুদ্রার চাহিদা বাড়িলে সোণার তাল অবাধে টাঁকশালে আসিতে থাকে। আর মুদ্রার যোগান অধিক হইলে বাড়তি মুদ্রা গলাইয়া বিদেশে চালান দেওয়া যায় বা সোণার পাতে পরিণত করা চলে, কেন না, লোকে মনে মনে জানে যে মুদ্রার চাহিদা আবার বাড়িয়া গেলে, এই গলান মুদ্রাকে পুনরায় মুদ্রায় পরিণত করা যাইবে। টানযোগানের নিয়ম অনুসারে টাকাকড়ির পরিমাণ আপনা হইতেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

"অবাধ মুদ্রা তৈয়ারী" বলিতে শুধু "বিনা মূল্যে মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া" বোঝায় না। সোণার তালকে টাকাকড়িতে পরিণত করিতে গেলে একটা খরচা হইয়াই থাকে। এই খরচা ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র নিজেই বহন করিতে পারেন অথবা যাঁহারা সোণার তালের

পরিবর্ত্তে মুদ্রা, টঁাকশাল হইতে লইতে আসেন, তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। সোণার তালকে মুদ্রা-তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য যদি খরচা-মাত্র লওয়া হয় তবে তাহাকে "ব্রাসেজ্" কহে। আর যদি মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া দিবার ন্যায্য খরচা অপেক্ষা অধিক লওয়া হয় তবে তাহাকে "**বাণী**" কহে। শভালিয়ে বলেন যে, যখনই কোন সরকার টাকাকড়ি বাহির করিবার জন্য উৎপাদন খরচা অপেক্ষা অধিক একটা কর আদায় করে তখনই টাকাকড়ি পণ্যের পর্য্যায় হইতে "স্বেচ্ছাচারী নিদর্শনের" পর্য্যায়ে যাইয়া পড়ে। সুতরাং টাককাড়ি তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য বাণী গ্রহণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে বিধেয় নহে। প্রকৃত পক্ষে, দেশের মধ্যে অবাধ মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া দিবার কথা থাকিলে রাষ্ট্র দেশের টাকাকড়ির ব্যবস্থার মধ্যে বিপর্য্যয় আনয়ন না করিয়া বাণী আদায় করিতে পারেন না, কেন না বাণী না দিয়া সোণার তালকে মুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যাইবে না বলিয়া, লোকে সহজে সোণার তালকে মুদ্রায় পরিণত করিতে চাহিবে না এবং সেই হেতু টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া যাইবে। আবার টাকাকড়ির মূল্য সেই ওজনের সোণার তাল অপেক্ষা অধিক হওয়ার জন্য টাকাকড়ির পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অধিকতর হইলেও লোকে টাকাকড়ি গলাইয়া সোণার তালে পরিণত করিতে চাহিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুদ্রা তৈয়ারী করিবার জন্য যদি বাণী গ্রহণ করা হয় তবে মুদ্রা ও সোণার তালের দামের মধ্যে তারতম্য হয়।

সোণার তালের পরিবর্ত্তে যে-হারে মুদ্রা দেওয়া হয় তাহাকে সোণার "**টঁাকশালী দর**" (মিণ্ট্ প্রাইস) কহে। নিম্নে কয়েকটী দেশের সোণার টঁাকশালী দর দেওয়া হইল :—

দেশের নাম—	দর
যুক্তরাজ্য—	৩ পাঃ ১৭ শিং ১০½ পেঃ—আউন্স প্রতি।
ফ্রান্স—	৩৪৪৭·৭৪ ফ্রাঁ—কিলোগ্রাম প্রতি।
জার্ম্মাণী—	২৭৯০ মার্ক ,, ,,
যুক্তরাষ্ট্র—	২০·৬৭ ডলার আউন্স প্রতি।

ইংলণ্ডে মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য কোনরূপ বাণী গ্রহণ করা হয় না, সেই হেতু মূল্যও ঠিক থাকে। একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বোঝা যাইবে। সরকার যখন যে-কোন পরিমাণের সোণা আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিং ১০½ পেন্স দরে ক্রয় করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তখন কেহই ইহা অপেক্ষা অল্প দরে সোণা বিক্রয় করিতে চাহিবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন বিদেশী বণিক্ টাঁকশালী দর অপেক্ষা বেশী দর দেন, তবে লোকে তাহার নিকট বিক্রয়ার্থ এত অধিক পরিমাণ সোণা উপস্থিত করিবে যে সে সত্বরই দর কমাইয়া দিবে, কেননা, সভারিণ গলাইয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিতে কেহই দ্বিধা বোধ করিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্ব দেশেই সোণার দর টাঁকশালী দরের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। তবে এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রকৃতপক্ষে লণ্ডন বুলিয়ান মার্কেটে (বা লণ্ডনের সোণার বাজারে) সোণার দর ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেঃ হইতে ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০½ পেন্স এর মধ্যে বাড়ে কমে। ইহার কারণও আছে। টাঁকশালে সোণা লইয়া গিয়া মুদ্রা তৈয়ার করান ইংলণ্ডের দস্তুর নহে। যদিও সেরূপ করিবার কোন বাধা নাই তথাপি লোকে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে মুদ্রা গ্রহণ করা সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে। টাঁকশালে সোণা জমা দিয়া মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া লইবার অসুবিধা অনেক এবং সময়ও নষ্ট হয় যথেষ্ট আর এই দেরী হওয়ার জন্য সুদও

মুদ্রাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয় :—

(১) ষ্ট্যাণ্ডার্ড—ইহাদের আভ্যন্তরিক মূল্য ও দর্শনী বা আকৃতি মূল্য একই হয়।

(২) গৌণমুদ্রা বা টোকন্ মুদ্রা—এইগুলিতে যতটা পরিমাণ ধাতু থাকে তাহা অপেক্ষা দর্শনী-মূল্য অনেক বেশী।

ইংলণ্ডে রূপা, গৌণমুদ্রা তৈয়ারী করিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহা "আন্‌লিমিটেড্ লিগেল টেণ্ডার" নয় অর্থাৎ লোকে রৌপ্য-মুদ্রা অপরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। চল্লিশ শিলিং পর্য্যন্তই লোকে বাধ্য বা ঐ পর্য্যন্ত রৌপ্য মুদ্রা লিগ্যাল টেণ্ডার। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রৌপ্যমুদ্রায় ৩৭ ভাগ রূপা ও ৩৮ ভাগ তামা থাকে। এক ট্রয় পাউণ্ড ওজনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপাকে মুদ্রা করিলে ৬৬ শিলিং দাঁড়ায় ও ওজন হয় ৮৭·২৭২ গ্রেণ। রৌপ্য মুদ্রার মত ব্রঞ্জ নির্ম্মিত মুদ্রাও গৌণমুদ্রা। ইহাতে ৯৫ ভাগ তামা, ৪ ভাগ টীন ও ১ ভাগ দস্তা থাকে। ব্রঞ্জ নির্ম্মিত মুদ্রায় যে ব্রঞ্জ থাকে তাহার মূল্য ঐ মুদ্রার দর্শনী-মূল্য অপেক্ষা অনেক কম।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী ও সুইজার্ল্যাণ্ড—এই চারিটী দেশ একত্রে ল্যাটিন ইউনিয়ন বলিয়া খ্যাত। ফ্রান্সের মূল্যের ইউনিট্ ফ্রাঁ, ইটালির লিরা, স্পেনের পেসেতা ও গ্রীসের ড্রাকমা। রৌপ্য নির্ম্মিত ৫ ফ্রাঁতে ৩৪৭·২২০ খাঁটী ধাতু থাকে। ল্যাটীন ইউনিয়ান ব্যতিরেকে স্পেন, রুমানিয়া, সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়া এইভাবেই মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া থাকে। বলিভিয়া, ইকোয়েডর, পেরু, আর্জ্জেণ্টিনা রিপাব্লিক, ভেনেজুয়েলা, হেটী, কলম্বিয়া, ও সেণ্ট্রাল আমেরিকায় টাকাকড়ির চলনটা অনেক অংশে ল্যাটিন ইউনিয়নের অনুরূপ।

জার্ম্মাণীর ইউনিট্ মার্ক। ১৩৯½ গ্রেণ ১০-মার্ক মুদ্রার ওজন প্রায়

কেবল মাত্র সরকারী প্রয়োজনের জন্যই রৌপ্যমুদ্রা ৫০০,২০০,১০০, ও ৫০ রিস্ তৈয়ারী করা হয়। রৌপ্য নিম্মিত ১০০ রিস্‌কে টেষ্টুন বলে। ২০০ রিসের ওজন ৭৭·১৬ গ্রেণ। পর্ত্তুগালে এখন মুদ্রার নতুন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের ইউনিট ক্রোন বা ক্রাউন। এক কিলোগ্রাম খাঁটী সোনা হইতে ২,৪৮৬ ক্রোনার তৈয়ারী করা হয়। রূপা দিয়া কেবলমাত্র ১ ও ২ ক্রাউন তৈয়ারী করা হয়।

রুশিয়ার ইউনিট রৌপ্য নির্ম্মিত ১০০ কোপেকের রুব্‌ল্। সোনার সহিত রূপার অনুপাতটা ১:১৫½। স্বর্ণ নিম্মিত ইম্পিরিয়েলের মূল্য ১০ রুবল্। একটী ডুক্যাট ৩ রুব্‌লের সমান। রৌপ্য নির্ম্মিত রুব্‌লের ওজন ১৯·৯৯৫ গ্রাম। ইহা সমস্ত রুশিয়ায় লিগ্যাল টেণ্ডার।

তুরস্কের ইউনিট পিয়াস্‌ট্রেস্। ইহার ওজন ·০৭২১৬ গ্রাম। রৌপ্যমুদ্রার নাম মেদ্‌জিদিয়ে। ২০ পিয়াস্‌ট্রেসের মেদ্‌জিদিয়ের ওজন ২৪·০৫৫ গ্রাম।

ভারতবর্ষে রূপার টাকার চলনই বেশী। রূপার দর যাহাতে অযথা না বাড়ে-কমে সেজন্য সরকার রূপার স্বর্ণমূল্য ১ শিঃ ৬ পেঃ স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং এই দর ঠিক রাখিবার জন্য তহবিলে অনেক সোনা জমা করিয়া রাখিয়াছেন। টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ বা ১১·৬৬৪ গ্রাম। স্বর্ণমুদ্রার নাম মোহর এবং ১৫ টাকার সমান। ইহার ওজন টাকার ওজনের সমান।

হংকং-এ রৌপ্যনির্ম্মিত মেক্সিকান ডলারেরই চলন আর চীন দেশে রৌপ্য নির্ম্মিত তিল চলে; এই তিলের মূল্য প্রায় ২ শিঃ ১১৪ পেঃ।

জাপানের ইউনিট ইয়েন্। এদেশে সোনার সহিত রূপার অনুপাত

১:১৬·১৭। স্বর্ণ নির্ম্মিত ২০ ইয়েনের ওজন ১৬·৬৬৭ গ্রাম। কেবল মাত্র সরকারের প্রয়োজনের জন্যই রৌপ্যমুদ্রা তৈয়ারী করা হয়। মেক্সিকান ডলারের চলনও জাপানে যথেষ্ট আছে।

যুক্ত-রাষ্ট্রের ইউনিট ডলার ও ইহার ওজন ২৫·৮ গ্রেণ। সোনার সহিত রূপার অনুপাত ১:১৫·৯৮৮। অর্দ্ধ ডলার, সিকি ডলার ও ডাইম্ হইতেছে গৌণ মুদ্রা ইহাদের ওজন নীচে দেওয়া গেল :—

	গ্রেণ	খাঁটী রূপা
অর্দ্ধ ডলার	১৯২·৯	১৭৩·৬১
সিকি ডলার	৯৬ ৪৫	৮৬·৮০৫
ডাইম্	৩৮·৫৮	৩৪·৭২২

পাঁচ সেণ্ট নিকেল মুদ্রার ওজন ৭৭·১৬ গ্রেণ; ইহাতে ৭৫ ভাগ তামা ও ২৫ ভাগ নিকেল থাকে।

মেক্সিকোতে যথেষ্ট পরিমাণে রৌপ্য উৎপাদিত হয়। এখানে রৌপ্য ডলারেরই চলন; ইহার ওজন ৪১৭·৬৬৫৭ গ্রেণ। এদেশের ইউনিট রৌপ্য ডলার।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সমূহে প্রায় ল্যাটিন ইউনিয়নের অনুযায়ী মুদ্রার ব্যবস্থা আছে।

১০০ পিয়াসট্রেসের পাউণ্ডই ইজিপ্টের ইউনিট; ইহার ওজন ৮·৫ গ্রাম। আর পিয়াষ্ট্রেসের ওজন ১·৪ গ্রাম। ১, ½, ¼ ও $\frac{১}{১০}$ পিয়াষ্ট্রেস্ মূল্যের নিকেল-মুদ্রার চলনও যথেষ্ট আছে। $\frac{১}{২০}$ ও $\frac{১}{৪০}$ পিয়াষ্ট্রেস্ মূল্যের ব্রঞ্জ মুদ্রাও চলিয়া থাকে। কিছু দিন যাবৎ ইজিপ্ট ও সুডানে ইজিপ্‌টের স্বর্ণমুদ্রার বদলে ইংরাজি সভারেণই চলিতেছে।

ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্রের ১০ ডলারের ঈগ্‌ল্ ও যুক্তরাজ্যের সভারেণ এই দুইই লিগ্যাল টেণ্ডার। ইংলিশ সভারেণকে ৪·৮৬⅔ ডলারের

সমান বলিয়া ধরা হয়। রৌপ্যমুদ্রা মাত্র ১০ ডলার পর্য্যন্ত লিগ্যাল টেণ্ডার।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের স্বর্ণ নির্ম্মিত ডলারের মূল্য ১·৬৬৪ গ্রাম সোণার সমান এবং যুক্ত রাষ্ট্রের ১·০১৪ ডলারের সমান। এদেশে ২ ডলার মুদ্রারই চলন আছে। রৌপ্যমুদ্রা ১০ ডলার পর্য্যন্ত লিগ্যাল টেণ্ডার।*

* ইষ্টন্ প্রণীত "মনি, এক্স্‌চেন্‌জ্‌ অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং" দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত।

চতুর্থ অধ্যায়

টাকাকড়ির পরিমাণ ও দর

টাকাকড়ির মূল্য কিরূপে স্থিরীকৃত হয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায় পরিষ্কার রূপে বোঝা দরকার। মূল্য বলিতে কোন পণ্যের সেই বিশেষগুণ বা শক্তি বোঝায় যাহার বলে ঐ পণ্যের বিনিময়ে অন্যান্য পণ্য পাওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ পণ্যের সহিত পণ্যের বিনিময়ের তুলনা করিয়াই পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। ১০ সের চাউলের বদলে যদি ১৫ সের ময়দা পাওয়া যায়, তবে ১০ সের চাউলের মূল্য হইল ১৫ সের ময়দা। তেমনি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-পরিমাণ অন্যান্য পণ্য পাওয়া যায় তাহাই হইল ঐ পরিমাণ টাকাকড়ির মূল্য। এক টাকায় যদি ৮ সের চাউল ও ৫ সের ময়দা পাওয়া যায়, তবে এক টাকার মূল্য ৮ সের চাউল বা ৫ সের ময়দা বলিতে হয়। যেহেতু সকল দ্রব্যসামগ্রী টাকাকড়ির সহিত বিনিময় করা সম্ভব, সেই হেতু **টাকাকড়ির দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তিই উহার মূল্য**

অন্যান্য পণ্যের মত টাকাকড়ির মূল্যও টান-যোগানের উপর নির্ভর করে। বিনিময়ের বাহনরূপে যে পরিমাণ ধাতুমুদ্রা চলাচল করে তাহা হইতেই যোগানের অংশটা বোঝা যায়। অবশ্য টাকাকড়ির যোগান কেবলমাত্র ধাতুমুদ্রার উপর নির্ভর করে না, তথাপি আপাততঃ এইটুকু লক্ষ্য করিলেই চলিবে, পরে অন্যবিধ মুদ্রার কথা আলোচনা করা যাইবে। টাকাকড়ির টানের অংশটা নির্ভর করে টাকাকড়ির

সহিত বিনিময় পণ্যের পরিমাণের উপর। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, পণ্যদ্রব্যের দর চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং চল্‌তি টাকার মোট-পরিমাণও বিনিময় পণ্যের মোট পরিমাণের সহিত বাড়ে-কমে।

সকল পণ্যের 'মূল্য' কোন একসময়ে বাড়িয়া যাইতে পারে না বা কমিয়া যাইতে পারে না। কেননা মূল্য শব্দটী আপেক্ষিক অর্থাৎ একের তুলনায় কত কম বা বেশী। সুতরাং যদি কোন একটী পণ্যের মূল্য বাড়িয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ পণ্যের তুলনায় অপর কোন পণ্যের মূল্য কমিয়াছে; উভয়ের মূল্যই একসাথে বাড়িতে পারে না। ধরা যাক, একমণ চিনির বদলে দুইমণ ময়দা পাওয়া যায়; তাহা হইলে একমণ চিনির মূল্য হইল দুইমণ ময়দা। যদি কালক্রমে একমণ চিনির বদলে ৪ মণ ময়দা পাওয়া যায় তবে চিনির মূল্য বাড়িল বটে কিন্তু সাথে সাথে ময়দার মূল্য কমিয়া গেল; কেননা পূর্ব্বে দুইমণ ময়দার মূল্য ছিল একমণ চিনি, এখন দাঁড়াইল আধমণ চিনি। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, সকল পণ্যের মূল্য যুগপৎ বাড়িতে পারে না। **কিন্তু সকল পণ্যের 'দর' একই সময়ে বাড়িতে বা কমিতে পারে।** ধরা যাক, পূর্ব্বে এক টাকায় ১ মণ চিনি পাওয়া যাইত ও ২ মণ ময়দা পাওয়া যাইত। এখন তিন টাকায় ১ মণ চিনি ও ২ মণ ময়দা পাওয়া যায়। এখানে চিনি ও ময়দার পরস্পরের মূল্য কমে নাই। কিন্তু পূর্ব্বে এক টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ চিনি ও ময়দা পাওয়া যাইত এখন সেই পরিমাণ ঐ পণ্যগুলি পাইবার জন্য ৩৲ টাকা দিতে হয়। সুতরাং চিনি ও ময়দার মূল্য বাড়ে নাই বটে, কিন্তু দর বাড়িয়াছে।

সব জিনিষের দর চড়িয়া চলিয়াছে বা নামিয়া যাইতেছে দেখিলে

বুঝিতে হইবে যে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি কোন কারণে কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে। টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি পণ্য দ্রব্য সমূহের দরের উপর নির্ভর করে। কেননা যদি সকল পণ্যের দর চড়া হয় তবে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকায় অল্প পরিমাণ অন্যান্য পণ্য ক্রয় করা যাইবে। আর যদি অন্যান্য জিনিষ পত্রের দর সস্তা হয় তবে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকায় অধিক পরিমাণ অন্যান্য পণ্য খরিদ করিতে পারা যাইবে। পণ্যের দর ও টাকাকড়ির মূল্য বিপরীত ভাবাপন্ন—ঠিক তৌলদণ্ডের মত।

জিনিষপত্রের দর বাড়িতে বা কমিতে থাকিলে অনেক লোককেই একটু সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ধরা যাক, একজন কারখানার মালিক ১০ বৎসরের মিয়াদে ১০,০০০৲ টাকা ধার লইয়াছে এবং দশ বৎসর বাদে যখন ঐ টাকা তাহাকে শোধ করিতে হইবে তখন সকল পণ্যদ্রব্যের দর চড়িয়া গিয়াছে—যে পণ্য ঐ কারখানায় উৎপন্ন হয় তাহার দরও চড়িয়াছে। ঐ ঋণের টাকা শোধ দিবার জন্য এখন কারখানার মালিককে নিজের কারখানা-জাত মাল বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু জিনিষ পত্রের দর চড়িয়া যাওয়ায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে যে-পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়া ঐ ১০,০০০৲ যোগাড় করিতে হইত, এখন আর তাহা করিতে হইবে না; তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়াই সে ঐ টাকাটা উঠাইতে পারিবে। সুতরাং পূর্ব্বের তুলনায় এখন কম পরিমাণ টাকা দিয়াই ঋণ শোধ করিতে পারিবে। অতএব যদিও তাহাকে সেই ১০,০০০৲ এখনো দিতে হইবে, তথাপি দর চড়িয়া যাওয়ার দরুণ সে কিছু লাভ করিয়াছে, কেননা শোধ-দেওয়া টাকার মূল্য ধার-করা টাকার মূল্য অপেক্ষা কম। টাকাকড়ির মূল্য এই দশ বৎসরে কমিয়া গিয়াছে।

পণ্যের দর না বাড়িয়া যদি কমিয়া যাইত ঠিক ইহার বিপরীত ফল পাওয়া যাইত। অতএব বোঝা যাইতেছে যে, **জিনিষপত্রের দর চড়িলে খাতকের পক্ষে ভাল আর মহাজনের পক্ষে মন্দ আর দর কমিলে মহাজনের পক্ষে ভাল ও খাতকের পক্ষে মন্দ।**

টাকাকড়ির ক্রয়শক্তির পরিবর্ত্তনে, যে-সকল ব্যক্তির আয় নির্দ্দিষ্ট বা যাহাদের বেতন সহজে বাড়ে-কমে না তাহাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। শ্রমিকদিগের মজুরী এবং মসীজীবীদিগের বেতন, মূল্য পরিবর্ত্তনের সময় সহজে নড়চড় হয় না; তাই ইহারা দ্রব্য সামগ্রীর দর কমিলে সুখ ভোগ করে আর বাড়িলে দুঃখ ভোগ করে। ধরা যাক ২০ বৎসর পূর্ব্বে এক টাকায় ১ মণ চাউল ও ১৫ সের চিনি পাওয়া যাইত। এখন ৫৲ টাকায় ১ মণ চাউল ও ১৫ সের চিনি পাওয়া যায়। অথচ ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে কেরাণী ৪৫৲ টাকা বেতন পাইত সে এখনো যদি ৪৫৲ টাকাই পায়, তবে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। তখন সে ১ মণ চাউল ও ১৫ সের চিনি খরিদ করিতে যে টাকাটা খরচ করিত এখন তাহাকে সেই পরিমাণ ঐ উভয় জিনিষ খরিদ করিতে পাঁচ গুণ টাকা খরচ করিতে হয়। অতএব যে পরিমাণে জিনিষ পত্রের দর বাড়ে বা টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, কেরাণী প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর যে-সব ব্যক্তি বেতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে তাহাদের বেতন যদি সেই অনুপাতে না বাড়ে তবে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। বিগত মহাযুদ্ধের পর জিনিষ পত্রের দর তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতে থাকায় মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদিগকে তাই এত বিপন্ন করিয়াছে।

"অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যাহারা দরের কথা বুঝে না, তাহাদের সহিত যে-সকল দ্রব্য দিয়া হস্তিদন্ত ইত্যাদি অদল-বদল করা হয়, সেই সকল দ্রব্যের যদি মূল্য কমিয়া যায় এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণ সেই সকল দ্রব্য দিয়া যে পরিমাণ হস্তিদন্ত ইত্যাদির অদল-বদল হইত এখনও যদি সেই পরিমাণ ঐ সকল দ্রব্য দিয়া সেই পরিমাণ হস্তিদন্ত ইত্যাদির অদল-বদল হয়; তবে যাহারা অদল-বদল করে তাহাদের কোন ক্ষতি হইল না বটে কিন্তু যাহারা অদল-বদলে হস্তিদন্ত ইত্যাদি পাইল তাহারা বিশেষ লাভবান হইল। এই নিমিত্ত অসভ্য জাতির সহিত অদল-বদল করিয়া সভ্যজাতি অনেক সময়ে বিশেষ লাভ করিয়া আসিতেছেন।"

পণ্যের দর পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে সুদের হারও বাড়ে বা কমে। ধরা যাক প্রতি বৎসর ৩% হিসাবে পণ্যের দর বাড়িতেছে। তাহা হইলে যে ৫% সুদে এ বৎসর ১০০৲ টাকা ধার দিবে, বৎসর শেষে তাহার—

১০৩৲ টাকা (দঃ ৩% বাড়িয়াছে বলিয়া ১০০৲ টাকার মূল্য ১০৩৲ টাকা হইবে) +

১০৩৲ টাকার ৫% = মোট ১০৮·১৫৲ টাকা পাওয়া চাই। অর্থাৎ এক বৎসরের ৫% সুদ বৎসর শেষে ৮% সুদের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং দর যেরূপ ৩% বাড়িয়া যাইতেছে, সুদও তেমনি ৩% বাড়িয়া যাইবে। অতএব **দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদও বাড়িয়া যায়। আর দর কম হইলে সুদও কম হয়।**

সব পণ্যের দর এক সময়ে একভাবে বাড়ে না বা কমে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন একটা জিনিষের দর হয়ত বাড়িয়াছে,

অপর একটার দর কিছু কমিয়াছে, অন্য একটার দর হয়ত ঠিকই আছে সুতরাং দ্রব্য সামগ্রীর দরের গতি কোন দিকে বুঝিলেও তাহার ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ নহে। তাই আজকাল "**সূচি-সংখ্যা**" বা "ইণ্ডেক্স নাম্বার"-এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। একটী উদাহরণ দেখিলেই "সূচি-সংখ্যা" সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইবে। ধরা যাক, ১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারী—

লোহার দর—প্রতি টন ১৫ ডলার, তুলার দর—প্রতি পাউণ্ড ১০ সেণ্ট ;
গমের দর—প্রতি বুশেল ১ ডলার ; পশমের দর—প্রতি পাউণ্ড ৪০ সেণ্ট ;

এইগুলি গোড়ার দর অর্থাৎ যে-বৎসর যে-মাল ধরিয়া তুলনা করা হইবে সেই বৎসরের দর। ইহাকে "বনেদি দর" বা "**বেস্ প্রাইস্**" বলে। মনে কর ১০ বৎসর পরে ১লা জানুয়ারী ১৯১০ সালে পণ্যগুলির এই দর দাঁড়াইয়াছে।

লোহা—২০ ডলার		তুলা—১০ সেণ্ট	
গম—১·২৫ ডলার		পশম—৩৬ সেণ্ট	

১৯১০ সালের দরগুলিকে যদি 'বেস' দরের শতকরা হিসাবে লেখা যায় তাহা হইলে এই দাঁড়ায়—

	১৯০০		১৯১০	
	বেস্ দর	১০০	দর	বেস্ দরের শতকরা
লোহা	১৫·০০ ডলার	১০০	২০·০০ ডলার	১৩৩
গম	১·০০০ ,,	১০০	১·২৫ ,,	১২৫
তুলা	·১০ ,,	১০০	·১০ ,,	১০০
পশম	·৪০ ,,	১০০	·৩৬ ,,	৯০
		৪০০		৪৪৮
গড় বা অ্যাভারেজ		১০০		১১২

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ১৯০০ সালে সূচি-সংখ্যা ছিল ৪০০, ১৯১০ সালে হইয়াছে ৪৪৮ ; গড় হিসাব ধরিলে ১৯০০ সালের সূচি-সংখ্যা ১০০ আর ১৯১০ সালের ১১২। এই সূচি-সংখ্যায় দেখা যাইতেছে যে দর ১২% চড়িয়াছে। ৪টা পণ্যের বদলে ৫০টী কি ১০০টী পণ্যের দর লইয়া সূচি-সংখ্যা তৈরী করিলে দরের গতি ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা পাকা খবর পাওয়া যায়।

সূচি-সংখ্যা তৈরীর অনেকগুলি প্রণালী আছে, যথা—এরিথমেটিক অ্যাভারেজ, জিওমেট্রিক অ্যাভারেজ, ওয়েটেড্ অ্যাভারেজ প্রভৃতি। প্রত্যেক প্রণালীরই সুবিধা-অসুবিধা আছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। ইংলণ্ডে "ষ্ট্যাটিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত সয়ের্বেক্স ইণ্ডেক্স নাম্বার, "ইকনমিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত ইণ্ডেক্স নাম্বার ও গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডেক্স নাম্বার—এই তিনটীরই চলন বেশী। **দরের গতি কোন্ দিকে সূচি-সংখ্যা দেখিয়া সহজেই বলা যায়।**

সূচি-সংখ্যা আরও একটা কাজে লাগে। **সূচি-সংখ্যার সাহায্যে আমরা জীবনধারণোপযোগী খরচার পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বুঝিতে পারি।** এই নিমিত্ত যে সূচি-সংখ্যা তৈরী করা হয় তাহাতে একটু বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, কেননা সকল পণ্যদ্রব্য আমরা সম পরিমাণে খরিদ করি না ; তাই টাকাকড়ির ক্রয়শক্তির কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুধু জানিলে হয় না। খাদ্যদ্রব্য বা বসন-ভূষণের দর বাড়িলে-কমিলে জীবন-ধারণের জন্য যে-খরচা করিতে হয় তাহাও বাড়ে-কমে। সুতরাং বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে-খরচা হয় তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত যে সূচি-সংখ্যা তৈরী করা হয় তাহা এরূপ

ভাবে করা হয় যে, যে-পণ্যের খাতে যত বেশী খরচা হয় তাহাকে ততখানি (ওয়েট) "গুরুত্ব" দেওয়া হয়। ধনী ও গরীব, আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী, অন্ন যাহাদের প্রধান খাদ্য ও আটার রুটী যাহাদের প্রধান খাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের জন্য বিভিন্ন সূচি-সংখ্যা তৈয়ারী করা আবশ্যক। আমাদের দেশে এরূপভাবে তথ্য সংগ্রহ এখনো আরম্ভ হয় নাই। পূর্ব্বে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ধরা যাক, সেই সমাজে লোকে পশম খরিদ করিতে আয়ের যতটা অংশ ব্যয় করে, গমের জন্য তাহার চতুর্গুণ, তূলার জন্য দ্বিগুণ এবং লোহার জন্য তিন গুণ ব্যয় করে। তাহা হইলে উপরের সূচি-সংখ্যাটী নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইবে।—

	১৯০০			১৯১০		
	গুরুত্ব	বেস্ দর	গুরুত্ব বিশিষ্ট বেস্	দর	শতকরা দর পরিবর্ত্তন	দরেগুরুত্ব বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন
		ডলার		ডলার		
গম	৪	১·০০	৪০০	১·২৫	১২৫	৫০০
তূলা	২	·১০	২০০	·১০	১০০	২০০
পশম	১	·৪০	১০০	·৩৬	৯০	৯০
লোহা	৩	১৫·০০	৩০০	২০·০০	১৩৩⅓	৪০০
মোট	১০		১০০০			১১৯০
গড়			১০০			১১৯

এই "ওয়েটেড্ অ্যাভারেজ" বা 'গুরুত্ব বিশিষ্ট গড় দর' দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, দর ১০০ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে অথচ সোজাসুজি গড় হিসাব হইতে দেখা যায় যে দর ১০০ হইতে ১১২

মাত্র উঠিয়াছে। সুতরাং সহজ গড় হিসাব দেখিয়া বোঝা যায় না যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই দর বাড়াটা কতখানি ক্লেশকর হইয়াছে।

৪০ টাকা পর্য্যন্ত আয়বিশিষ্ট কতকগুলি ভারতীয় সহরবাসীর বিষয় লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক জেভনস্ বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে খরচা হয় তাহার এক সূচি-সংখ্যা তৈয়ারী করিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। তিনি পারিবারিক ব্যয়ের দিক্‌টা লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, এই সব লোকে ৫৫% খাদ্যে, ১০% কাপড়চোপড়ে এবং বাকীটা অন্য নানাবিধ বিষয়ে খরচ করে :—

জীবনধারণোপযোগী খরচা বৃদ্ধি, ১৯১৩—১৯১৯

বৎসর	অন্ন যাহাদের প্রধান খাদ্য	গম যাহাদের প্রধান খাদ্য	বাজরা যাহাদের প্রধান খাদ্য
১৯১৩	১০০	১০০	১০০
১৯১৪	১০৩	১০৬	১০২
১৯১৫	১১৫	১২১	১০৬
১৯১৬	১২৮	১৩০	১২৩
১৯১৭	১৩৮	১৪১	১২৭
১৯১৮	১৪৪	১৬৯	১৪৬
১৯১৯	১৭৩	১৯২	১৭২

বোঝা যাইতেছে যে, গম যাহাদের প্রধান খাদ্য অর্থাৎ পশ্চিমাদের পণ্যদ্রব্যের দর বাড়িয়া যাইবার ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে।

পণ্যের দর বাড়া-কমার সাথে যে, টাকাকড়ির মূল্যও বাড়ে-কমে তাহা বোঝা গেল। কিন্তু টাকাকড়ির মূল্য বাড়ে-কমে কি জন্য ?

টাকাকড়ির পরিমাণ যদি বাড়ান যায় তবে উহার মূল্য কমে আর পরিমাণ যদি কমান যায় তবে উহার মূল্য বাড়ে। ভবিষ্যতের জন্য লোকে যে টাকাকড়ি মজুত করিয়া রাখে, সেই মজুত-টাকা বাদে যে-টাকা পণ্য খরিদ করিবার জন্য খাটিতেছে তাহাকেই **চল্‌তি টাকাকড়ি** বলে। এই চল্‌তি টাকাকাড়র সংখ্যা যদি দ্বিগুণিত করা যায় তবে পণ্যের দর দ্বিগুণ হয় আর যদি চল্‌তি টাককড়ির পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়া যায় তবে পণ্যের দরও অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। ধরা যাক, এক সমাজে চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ মোট ২০০টী টাকা এবং বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ৫০টী মাত্র। অতএব একটী পণ্যদ্রব্যের দর ৪৲ টাকা; এখন চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইয়া যদি দ্বিগুণ করা যায় অর্থাৎ ৪০০৲ টাকা করা যায়, অথচ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ না বাড়ে তাহা হইলে ১টা পণ্যদ্রব্যের দর ৪৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৮৲ টাকা হইবে অর্থাৎ টাকা-কড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হইল বলিয়া পণ্যের দরও দ্বিগুণ হইল। তাই ধন-বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, **"আর সব অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া টাকাকড়ির পরিমাণ যদি ডবল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য ঠিক অর্দ্ধেক হইবে, অর্থাৎ জিনিষপত্রের দর আগের চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ বাড়িবে। তেম্‌নি টাকার পরিমাণ যদি অর্দ্ধেক হয়, এবং অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে টাকা-কড়ির মূল্য ঠিক ডবল হইবে, অর্থাৎ জিনিষ-পত্রের দর আগের চেয়ে ঠিক অর্দ্ধেক হইবে।"***

* নরেন্দ্রনাথ রায়ের "টাকার কথা" দ্রষ্টব্য।

বিক্রেতা প্রভৃতির হাতে বহুবার ঘুরিয়া তবেই ভোক্তার ভোগে লাগে। এই বহুবার বিক্রীত পণ্যের সমষ্টি করিলে তবেই জানা যাইবে পণ্যের পরিমাণ। এই পণ্য সমষ্টির সহিত ঐ ব্যয়িত টাকাকড়ির সম্বন্ধই ঐ সময়কার টাকাকড়ির মূল্য স্বরূপ। সুতরাং,—

$$\text{টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি} = \frac{\text{টাকাকড়ির সংখ্যা} \times \text{উহার হাতফের}}{\text{ক্রীত-বিক্রীত পণ্য সমষ্টি}}$$

প্রত্যেক দেশেই স্বর্ণনির্ম্মিত আদর্শ-মুদ্রা ছাড়াও অন্যান্য ধাতু-নির্ম্মিত নিদর্শক-মুদ্রা বা গৌণমুদ্রাও চলিয়া থাকে। এই সব নিদর্শক মুদ্রার অভ্যন্তরীণ-মূল্য বা ধাতু-মূল্য ও দর্শনী-মূল্য এক না হইলেও লোকে বিনা দ্বিধায় এইগুলিকে দর্শনী-মূল্যেই গ্রহণ করিয়া থাকে। অধিকন্তু শিল্প-প্রধান দেশসমূহে গভর্ণমেণ্ট কারেন্সী নোট, হুণ্ডী, চেক প্রভৃতি প্রতিজ্ঞা সম্বলিত নিদর্শন-পত্র দ্বারা বহু-বিস্তৃত ব্যবসায়-কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইতেছে। এই সব নিদর্শন-পত্র ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার ন্যায় কার্য্য করে বলিয়া ইহাদিগকে **"কাগজী-মুদ্রা"** বলে। সুতরাং দেশে চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ জানিতে হইলে, এইগুলির কথাও মনে রাখিতে হইবে।

"বিনিময়-সাম্য" বা "ইকোয়েশন অফ্ এক্সচেঞ্জ"-এর সাহায্যে এই পরিমাণ-তত্ত্ব আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেন-দেনে যে মোট-কারবার হয়, তাহাকে গণিতের সাহায্যে ব্যক্ত করিলেই তাহা **"বিনিময়-সাম্য"** হইল। প্রত্যেক আলাদা-আলাদা বেচা-কেনার বিনিময়-সাম্য যোগ করিয়াই সমাজের বিনিময়-সাম্য স্থির করা হয়। ধরা যাক্, কোন লোক ৫৲ টাকা মণ হিসাবে ৮ মণ চাউল খরিদ করিল; এই বিনিময় কারবারে

৮ মণ চাউল, ৪০৲ টাকার সমান ধরা হইয়াছে ; অর্থাৎ ৪০৲ টাকা =৮ মণ চাউল×মণ প্রতি ৫৲ টাকা। যে কোন কেনা-বেচার কারবারকে এইভাবে আঁকের সাহায্যে ব্যক্ত করা যায়। এবং এই সকল বিভিন্ন কারবারগুলিকে যোগ করিলে কোন সমাজের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বিনিময়-সাম্য পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ, ক্রয় করা পণ্যের মোট মূল্যের সমান। সুতরাং বিনিময়-সাম্যের দুইটা দিক আছে—একটা টাকাকড়ির আর অপরটা পণ্যের। চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণকে, যতবার টাকাকড়ি হাতফের করিয়াছে তাহা দিয়া গুণ করিলেই বিনিময়-সাম্যের টাকাকড়ির দিকটা পাওয়া যায়। আর ক্রয় করা বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণকে পণ্যের দর দিয়া গুণ করিলেই বিনিময়-সাম্যের পণ্যের দিকটা পাওয়া যায়।

ধরা যাক্, কোন সমাজে মোট ৫,০০,০০০৲ টাকা আছে এবং সেগুলি বৎসরে ২০ বার হাতফের করে ; তাহা হইলে সেই সমাজে প্রতি বৎসর মোট ৫,০০,০০০×২০=১,০০,০০,০০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। এইটা হইল বিনিময়-সাম্যের টাকাকড়ির দিক্।

যখন ১,০০,০০,০০০৲ টাকা পণ্য খরিদ্ করিতে ব্যয় হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ঠিক ঐ অত টাকা মূল্যের পণ্যও বেচা হইয়াছে। ধরা যাক্, মোটে তিনটী পণ্য লইয়াই কেনা-বেচা হইয়াছে। এবং এই তিনটী পণ্য যথাক্রমে :—

৩৲ মণ হিসাবে ৩০,০০০ মণ ময়দা

৫৲ টন হিসাবে ১৯,০০,০০০ টন কয়লা

১৲ গজ হিসাবে ৪,১০,০০০ গজ কাপড় বিক্রয় করা হইয়াছে। এইগুলির মোট মূল্য ১,০০,০০,০০০৲ টাকা। অতএব

বিনিময়-সাম্য দাঁড়াইল নিম্নলিখিতরূপ :—

৫০০,০০০৲ × ২০ বার ১ বৎসরে হাতফের

= ৩০,০০০ মণ ময়দা × ৩৲ মণ হিসাবে

+ ১৯,০০,০০০ টন কয়লা × ৫৲ টন হিসাবে

+ ৪,১০,০০০ গজ কাপড় × ১৲ গজ হিসাবে

অর্থাৎ চল্‌তি টাকার পরিমাণ × হাতফের

= 'ক' পণ্যের পরিমাণ × 'ক' পণ্যের দর

+ 'খ' পণ্যের ,, × 'খ' ,,

+ 'গ' পণ্যের ,, × 'গ' ,,

যাহা তিনটী পণ্যের পক্ষে সত্য তাহা আরো অধিক সংখ্যক পণ্যের পক্ষেও সত্য। সুতরাং যদি—

টাকাকড়ির পরিমাণ = ট

হাতফের = হ

পণ্যর পরিমাণ = প

এবং পণ্যর দর = দ

এই সাঙ্কেতিক ব্যবহার করা যায়

তবে—ট × হ = প × দ

$+প_১ \times দ_১$

$+প_২ \times দ_২$

$+প_৩ \times দ_৩$ ইত্যাদি

অথবা ট × হ = Σপ × দ

এখন ধরা যাক্ যে টাকার পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়াছে অথচ হাতফেরের মাত্রা বা বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ একই আছে।

সুতরাং বিনিময়-সাম্যের টাকাকড়ির দিকটা দাঁড়াইবে ১০,০০,০০০ × ২০ = ২,০০,০০,০০০৲ টাকা, কিন্তু যদি পণ্যের দরের পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে পণ্যের দিকটা ১০,০০,০০০৲ টাকাই থাকিবে এবং বিনিময়-সাম্য ব্যহত হইবে, কেননা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এই সাম্যের দুইটী দিক্ একবারে সমান হওয়া চাই। সুতরাং পণ্যের দিক্ ও টাকাকড়ির দিক্ সমান করিতে হইলে পণ্যগুলির দর এরূপভাবে বাড়া চাই যাহাতে পণ্যের দিক্‌টা ১,০০,০০,০০০৲ টাকা হইতে ২,০০,০০,০০০৲ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। যদি এখন সব পণ্যের দর একই ভাবে বাড়ে তাহা হইলে প্রত্যেক পণ্যের দর দ্বিগুণিত হইবে। অতএব বিনিময়-সাম্য দাঁড়াইবে :—

১,০০,০,০০০৲ × ২০ = ৩০,০০০ মণ ময়দা × ৬৲ মণ হিসাবে
+ ১৯,০০,০০০ টন কয়লা × ১০৲ টন হিসাবে.
+ ৪,১০,০০০ গজ কাপড় × ২৲ গজ হিসাবে

যদি সব পণ্যের দর ঠিক একই ভাবে না বাড়ে তাহা হইলে একটী আর একটীর চেয়ে অত্যধিক বাড়িয়া সবগুলি মিলাইয়া গড়ে সমস্ত পণ্যের দর দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিবে।

টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে যেরূপ পণ্যের দর বাড়িয়া যায়, তেমনি হাতফের বা পণ্যের পরিমাণ বাড়িলেও দর বাড়িয়া যায়। হাতফের বাড়িল অথচ টাকাকড়ি বা পণ্যের পরিমাণ বাড়িল না— তাহা হইলে :—

৫,০০,০০০৲ × ৪০ = ৩০,০০০ মণ ময়দা × ৬৲ মণ হিসাবে
+ ১৯,০০,০০০ টন কয়লা × ১০৲ টন হিসাবে
+ ৪,১০,০০০ গজ কাপড় × ২৲ গজ হিসাবে

আর যদি পণ্যের পরিমাণ বাড়িল অথচ হাতফের বা টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িল না, তাহা হইলে ঃ—

৫,০০,০০০৲ × ২০ = ৬০,০০০ মণ ময়দা × ১৷৷০ মণ হিসাবে
+ ৩৮,০০,০০০ টন কয়লা × ২৷৷০ টন হিসাবে
+ ৮,২০,০০০ গজ কাপড় × ৷৷০ গজ হিসাবে

যদি টাকাকড়ির পরিমাণ পণ্যের পরিমাণ ও হাতফের সবগুলি একই সাথে পরিবর্ত্তিত হয় বা কোন দুইটী একই সাথে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে পণ্যের দর এই সবগুলির যোগেই স্থির হইবে। যথা, যদি টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় আর হাতফেরের মাত্রা অর্দ্ধেক হয় ও পণ্যের পরিমাণ একই থাকে তবে পণ্যের দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। **সুতরাং টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণিত করিলেই যে পণ্যের দর দ্বিগুণিত হইবে এমন কোন কথা নাই।** আসলে টাকাকড়ির পরিমাণ পণ্যের দর-পরিবর্ত্তন সাধন করিবার তিনটী কারণের একটী কারণ। এবং এই জন্য পরিমাণ তত্ত্বটী বিবৃত করিবার সময় "অন্যান্য অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে" ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

পৃথিবীর সকল দেশে একই প্রকারের টাকা চলে না; বিভিন্ন দেশে কত বিভিন্ন রকমের টাকা প্রচলিত আছে, তার কিছু পরিচয় 'মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কৌশল' পরিচ্ছেদের শেষে দিয়াছি। এতক্ষণ "টাকার পরিমাণবাদ" সম্পর্কে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা মাত্র কোন একটা বিশেষ দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য অর্থাৎ যেটুকু অঞ্চলের মধ্যে কোন একটা বিশেষ মুদ্রা-নীতি প্রচলিত (এ গিভ্‌ন্ মনেটরী সিষ্টেম্) সেই স্থানটুকুতেই এই পরিমাণ-বাদ খাটে। টাকার আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের উপর টাকার পরিমাণ-

বাদের প্রভাব কতখানি এইবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। যখন দুইটী দেশের মধ্যে স্বর্ণমান* প্রচলিত অর্থাৎ দেশের চল্‌তি টাকাকে যখন ইচ্ছা নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিণত করা যায় তখন এই পরিবর্ত্তন-ক্ষমতাই বা 'কন্‌ভার্টিবিলিটী' দুইটী দেশের টাকার আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনে স্বর্ণমান প্রচলিত; একটা ডলারের বদলে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের সোণা পাওয়া যায় এবং একটা পাউণ্ডের বদলেও যদি তেমনি আর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোণা পাওয়া যায়, তাহা হইলে পাউণ্ড ও ডলারের আপেক্ষিক মূল্য বেশী নড়-চড় করিতে পারে না। কিন্তু যে-মূহুর্ত্তেই কোন দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে এবং সেইজন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সিক্কাকে সোণায় পরিণত করা যায় না, তখন দুইটী বিভিন্ন দেশের সিক্কাকে (টাকা) আর একটা-নির্দ্দিষ্ট-হারে হাতফের করা যায় না; সুতরাং বিনিময়-হারের মধ্যে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটী বিভিন্ন সিক্কার সাম্য ঠিক করা যায় কিরূপে? এই সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে গিয়ে অধ্যাপক গাষ্টেভ্ কাসেল **"পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটী"** কথা ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা বাংলায় "ক্রয়শক্তির সাম্য" বলিতে পারি। যদি এক পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ইংলণ্ডে যে-সকল পণ্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, সেই সব খরিদ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চার ডলার দিতে হয় তাহা হইলে বলা যায় যে ইংলণ্ড-যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্রয়শক্তির সাম্য' হইল ৪ ডলারে ১ পাউণ্ড। অধ্যাপক কাসেলের মতে **যে হারে ('রেট্') দুইটি বিভিন্ন দেশের চল্‌তি সিক্কার ক্রয়শক্তি**

---

* দেশ-বিদেশের সিক্কা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সমান হয় তাহাকে 'ইক্যুইলিব্রয়াম' রেট্ অফ্ এক্স্‌চেঞ্জ বা পার্‌চেসিং পাওয়ার প্যারিটী বা ক্রয়শক্তির সাম্য কহে। এই তত্ত্ব অনুসারে যদি একটা দেশে পণ্যের দর অপরটা অপেক্ষা চড়া হয় তাহা হইলে যে-দেশে দর চড়া তাহার দর পরিশেষে নামিতে বাধ্য। যেহেতু, বিদেশের বাজারে মাল সস্তায় পাওয়া যাইতেছে দেখিয়া আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইয়া দর নামাইয়া দিবে।

এইখানে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্ববিধ দরের উঠা-নামার ফল বৈদেশিক বিনিময়ের উপর একরূপ হয় না। পণ্য যদি এরূপ হয় যে তাহার চাহিদা উৎপাদক দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা হইলে দুইটী বিভিন্ন দেশে দর দুইপ্রকার থাকিলেও সিক্কার আপেক্ষিক মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীর দর কমিয়া যায় তাহা বলিয়া এ আশা করা যায় না যে ইংলণ্ডের লোক অমনি বাড়ীঘর যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করিতে থাকিবে; সুতরাং ডলার পাউণ্ডের মূল্যেরও কোন তারতম্য হইবে না। যে-সব পণ্যের রপ্তানী আমদানীর একটা আন্তর্জ্জাতিক বাজার আছে, সেইসব ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ "পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটী থিওরী" প্রযোজ্য। অধিকন্তু শুল্ক নির্দ্ধারণ ও পুঁজির চলাচলের ('ক্যাপিট্যাল্ মুভ্‌মেণ্ট') ফলও এই তত্ত্বটীকে কিঞ্চিৎ প্রতিহত করে। *

* অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "ইণ্ডিয়ান কারেন্সি অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেম্‌স্" পৃঃ ৬৬-৬৭।

পঞ্চম অধ্যায়

দেশ-বিদেশের সিক্কা

প্রত্যেক সভ্য সমাজেই নানা রকম মূল্যের নানা রকম মুদ্রার চলন দেখা যায়। এই সব বিবিধ মুদ্রার পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আইনতঃ স্থির করিয়া দেওয়া হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন দেশের মুদ্রার পরস্পরের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে সেই দেশের "সিক্কা-ব্যবস্থা" বা "কারেন্সী সিষ্টেম" বলে। দেশ অনুসারে সিক্কা-ব্যবস্থা বিভিন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সিক্কা প্রণালীকে মূলতঃ সাতটী ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **একবিধ ধাতুমান**—যদি কোন দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণের সময় কোন বিশেষ একটী ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাগুলিকে মান ধরা হয় এবং ঐ বিশেষ ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারাই কেবল ঋণ শোধ করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে ঐ দেশে একবিধ ধাতুমান প্রচলিত আছে। ল্যরোয় বোলো বলেন যে এই প্রকার সিক্কা-ব্যবস্থায় সরকার একটী মাত্র ধাতুকে দেশের টাকাকড়ির ব্যবস্থার একমাত্র ও স্থায়ী ভিত্তিরূপে ধরিয়া লয়েন এবং ঐ ধাতুটীকে ঋণ পরিশোধ করিবার অপরিমিত ক্ষমতা দেন অর্থাৎ ঐ ধাতু নির্ম্মিত টাকাকড়ির দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা যায়—সে ঋণ যত অধিক পরিমাণেরই হউক না কেন—তাহা গ্রহণ করিতে ঋণদাতা অস্বীকার করিতে পারেন না এবং করিলে দেশের আইন অনুযায়ী তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। অন্যান্য ধাতু-মুদ্রার চলন যে একেবারে থাকে না এমন নহে। তবে এই সব ধাতু মুদ্রা দ্বারা কেবল

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেনা-পাওনাই মিটান যায় অথবা লোকে সুবিধা মনে করিলে এই সব ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা যে কোন পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে, তবে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আদর্শ-মুদ্রা বা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড কয়েন' নির্ম্মাণের জন্য সোণাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাই একবিধ ধাতুমানকে স্বর্ণমান বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে স্বর্ণমানের চলন আছে কেননা সে দেশে স্বর্ণ দিয়াই মূল্যের পরিমাণ করা হয়। তথাপি রূপা ও কাগজ পত্রের সিক্কা হিসাবে চলন কম নহে।

(২) **দ্বিধাতু মান**—এক সময়েই দুইটী ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা যদি চলৎ-সিক্কারূপে প্রচলিত থাকে এবং যদি যে কোন লোক টাঁকশালে ঐ দুইটী ধাতুর কোনটী বা দুইটীই লইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ঐ মূল্যের মুদ্রা পাইতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে সেই দেশে দ্বিধাতু মান প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যত পরিমাণে ঋণ হউক না কেন, এই দুইটী ধাতুর যে-কোন ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারা বা উভয় ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারায় সেই ঋণ পরিশোধ করা আইন সম্মত হইবে। অর্থাৎ উভয় ধাতুই চলৎ-সিক্কারূপে গণ্য হয়। সাধারণতঃ এই ব্যবস্থায় মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য সোণা ও রূপাকেই গ্রহণ করা হয়। কত পরিমাণ সোণার মুদ্রা, কত পরিমাণ রূপার মুদ্রার সমান হইবে তাহারও একটা অনুপাত স্থির থাকে। ফ্রান্সে শতাধিক বর্ষকাল রূপার সহিত সোণার অনুপাত ছিল ১৫½ : ১। ইহার অর্থ এই যে ১৫½ আউন্স রূপা টাঁকশালে গলাইয়া যে মূল্যের মুদ্রা পাওয়া যাইবে, ১ আউন্স সোণার বদলেও সেই মূল্যের মুদ্রা পাওয়া যাইবে।

(৩) **স্বর্ণ-বিনিময় মান**—এই ব্যবস্থায়ও সোণা ও রূপা দুইটী মুদ্রাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এই ব্যবস্থায় কেবল সোণা টাঁকশালে দিয়া লোকে সেই সোণার পরিবর্ত্তে সেই মূল্যের মুদ্রা

পাইতে পারে এবং কেবল মাত্র স্বর্ণ মুদ্রাই চলৎ-সিক্কারূপে ব্যবহৃত হয়। রূপা হইতেও মুদ্রা প্রস্তুত করা হইলেও কেবল মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন মাফিকই করা হয় অর্থাৎ রূপার মুদ্রা গৌণমুদ্রা হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য মূল্যের লেন-দেন ব্যাপারে স্বর্ণ মুদ্রায় সুবিধা হয় না, কেননা উহার মূল্য অধিক। আমাদের দেশে ক্ষুদ্রতম স্বর্ণ মুদ্রা হইল মোহর। এখন যদি আমায় দোকানদারকে চা খরিদ করিয়া ১৷৷০ টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে ঐ মোহর দিয়া সে কাজ চলে না, তাই অল্প মূল্যের রূপার টাকা ব্যবহার করিতে হয়। এই ব্যবস্থাকে **"লিম্পিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড"**ও বলা হয়। যে-দেশে লিম্পিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের চলন আছে সে-দেশে রৌপ্যমুদ্রা অল্পে অল্পে বিস্তৃতি লাভ করিলেও স্বর্ণমুদ্রাই চলৎ-সিক্কারূপে ব্যবহৃত হয়। আর যে দেশে "স্বর্ণ-বিনিময় মান" বা "গোল্ড-এক্সচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড" চলিয়া থাকে, সে দেশে স্বর্ণমুদ্রাই আদর্শ-মুদ্রা হইলেও রৌপ্যমুদ্রাই দেশে চলিয়া থাকে, কেবল মাত্র বিদেশী পাওনাদারের ঋণ শোধ করিবার সময় একটা স্থির হারে রূপার বদলে সোণা লওয়া হয়; অধিকন্তু রৌপ্যমুদ্রা দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মিটানোর সময় চলৎ-সিক্কারূপে গণ্য করা হয়। ফ্রান্স ও অন্যান্য ল্যাটীন ইউনিয়নের দেশ সমূহে লিম্পিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের রেওয়াজ আছে। আর ভারতবর্ষ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পানামা ও মেক্সিকো দেশ সমূহে স্বর্ণ-বিনিময় মান বর্ত্তমান। এই দুই ব্যবস্থায় যে-ধাতুটী টাঁকশালায় পাঠাইয়া মুদ্রায় পরিণত করা যায় না, সেই-ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার মুদ্রা-মূল্য উহার মধ্যে যতটা ধাতু থাকে তাহার মূল্য অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। আমাদের দেশে একটা টাকায় যে পরিমাণ রূপা আছে তাহার মূল্য ষোল-আনা অপেক্ষা অনেক কম, অথচ টাকা কাজ চালায় ষোল-আনার। এই সব নিদর্শক-মুদ্রা বা গৌণমুদ্রার মুদ্রা-মূল্য স্থির

রাখিবার জন্য সরকারকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ এরূপ মুদ্রার পরিমাণ অযথা বাড়িতে দেওয়া হয় না। যে-কেহ টাঁকশালে রূপা, জমা দিয়া, মুদ্রায় পরিণত করিতে পারে না। সরকার বুলিয়ন বাজারে (সোণারূপার বাজারে) রূপার তাল খরিদ করিয়া প্রয়োজন মত মুদ্রা তৈয়ারী করেন। অতএব রৌপ্য মুদ্রার যোগান অপরিমিতভাবে বাড়িতে পারে না। এই সব মুদ্রার ধাতু-মূল্য মুদ্রা-মূল্য অপেক্ষা অনেক কম হওয়ার জন্য কেহ রৌপ্য মুদ্রা গলাইয়া গহনাদি করিতে চাহিবে না বা বিদেশে রপ্তানিও কবিবে না, যেহেতু তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে লোকসান সহ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ খাজনা, মালগুজারী প্রভৃতি যে-কোন কারণে সরকারকে তাঁহার প্রাপ্য উশুল দিতে গেলে সরকার ঐ সব মুদ্রা মুদ্রা-মূল্যেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

["ভারতে আজকাল যে মুদ্রানীতি চলিতেছে তাহাতে পাই আমরা গোল্ড-এক্সচেঞ্জ-ষ্ট্যাণ্ডার্ড (স্বর্ণ-বিনিময়-মান)। সরকারী কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবে যে মুদ্রানীতি কায়েম হইবে বলিয়া কথা উঠিয়াছে (১৯২৬) তাহার ফলে দেখা দিবে "গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ('স্বর্ণতালমান)। আর যে মুদ্রানীতি ভারতের নরনারী চাহিতেছে এবং যে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের আপত্তিও এক প্রকার নাই, তাহার নিয়মানুযায়ী মানকে বলা হয় "গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-মান)। দেখা যাইতেছে যে, এই তিন প্রকার মানেই সোণার দাগ বা গন্ধ আছে। কিন্তু এই সকল মান অনুসারে যে-সব টাকা জারি হয় তাহার সকল গুলাকেই "সোণার টাকা" বলা চলে কি ?

সোণার টাকা কাহাকে বলে এই প্রশ্নের জবাব মাথলুপ (জার্ম্মাণ লেখক) দিয়াছেন অতি সোজা। সোণার সঙ্গে টাকার (মুদ্রার) বিনিময়

সম্বন্ধটা স্থির নির্দ্দিষ্ট থাকিলেই সোণার টাকা জারি আছে মাথ্‌লুপ এইরূপ সম্‌ঝিয়া থাকেন। সোণার তৈরী টাকা আদৌ বাজারে চলিতেছে কিনা দেখিবার দরকার নাই। এই হিসাবে ভারতে আজকাল যে টাকা চলিতেছে তাহা "সোণার টাকা।"……"দেশ" বা "জাতি" হিসাবে "গোল্ড-ক্যার্ণ-হ্বেয়রুং" কে একঘরে করিয়া রাখা অসম্ভব। কি এসিয়া, কি ইয়োরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা—জগতের সকল জনপদেই এই প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার এই প্রথাকে রাষ্ট্রীয় হিসাবে স্বাধীনতা-হীন দেশের অথবা নিম-স্বাধীন মুল্লুকের এবং "কলনি-জাতীয় জনপদের পক্ষে স্বাভাবিক প্রথা বিবেচনা করাও চলিবে না।

"গোল্ড-ক্যার্ণ-হ্বেয়রুং" নামক বিচিত্র "সোণার টাকার" গোত্র-লক্ষণ কি কি? প্রথমতঃ সোণায় তৈরী টাকা বাজারে চলে না। চলিলেও পরিমাণ হিসাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। দ্বিতীয়তঃ—যে টাকাটা বাজারে চলে তাহা ভাঙ্গাইয়া তাহার বদলে গভর্ণমেণ্ট সোণার তৈরী টাকা অথবা সোণার তাল দিতে বাধ্য নয়। তৃতীয়তঃ বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকেরা দেশী টাকাটা সোণার টাকায় ভাঙ্গাইয়া লয়। বিনিময়ের হারটা নির্দ্দিষ্ট থাকে। হারটা নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় উচ্চতম সীমানার দিকে লক্ষ্য রাখা। টাকা ভাঙ্গাইবার কাজটা সারা হয় সরকারী বা নিম-সরকারী "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক" নামক কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। যে সকল দেশে এরূপ ব্যাঙ্ক নাই সেই সকল দেশে বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকে খোদ গভর্ণমেণ্টের হাতে। চতুর্থতঃ দেশী টাকা সোণার টাকায় পরিণত করিবার জন্য যে পরিমাণ সোণা আবশ্যক তাহা স্বদেশের ভিতর এক প্রকার রাখা হয় না—রাখা হয় প্রধানতঃ বিদেশে। মাত্র অল্প পরিমাণ "তাল" বা "সোণার কাগজ" স্বদেশে রাখা হয়।

এই চার-লক্ষণওয়ালা "স্বর্ণতালমানের প্রকৃতি আরও সংক্ষেপে বিবৃত করা সম্ভব। প্রথম কথাই হইতেছে বহির্বাণিজ্যের দেনা শুধিবার জন্য সোণার রেওয়াজ। আর ঘরোয়া কাজে সোণার সঙ্গে অসহযোগ।"*]

(৪) **পরিশোধনীয় কোম্পানীর কাগজ**—ইহা সরকার প্রচলিত প্রতিজ্ঞা সম্বলিত এক প্রকার কাগজের মুদ্রা। এরূপ প্রতিজ্ঞা পত্র থোক্ টাকায় লেখা হইয়া থাকে অর্থাৎ ৫,১০,২০,১০০ ইত্যাদি পরিমাণের হয়; ৫$\frac{১}{২}$, ১০০$\frac{১}{৩}$ প্রভৃতি পরিমাণের হয় না। এরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা থাকে যে এই কাগজ উপস্থিত করিয়া দাবী করিলেই বাহককে দেশের প্রচলিত ধাতু মুদ্রায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা শোধ দেওয়া হইবে। সাধারণতঃ এরূপ কাগজী-মুদ্রা মহাজন খাতকের নিকট হইতে ঋণের উশুল বাবদ লইতে বাধ্য। যতক্ষণ সরকার, কোম্পানীর কাগজ উপস্থিত করিলেই প্রচলিত ধাতুমুদ্রা দিয়া থাকেন ততক্ষণ ধাতুমুদ্রা ও কোম্পানীর কাগজের মূল্য একই থাকে এবং দেশের মধ্যে টাকাকড়ির কাজ কোম্পানীর কাগজ ঠিক ধাতুমুদ্রার মতই চালাইতে সক্ষম। তবে কোম্পানীর কাগজের মুস্কিল এই যে বাণিজ্য জগতের টান যোগানের বাড়া-কমার সহিত ইহার পরিমাণ বাড়ান-কমান যায় না। কারণ সরকারী কর্ম্মচারীর খেয়াল-খুসী মত বা সরকারী তহবিলে টান পড়িলেই কোম্পানীর কাগজ ছাড়া হয়। তাহা ছাড়া যদি ইহার পরিমাণ অত্যধিক হয়, তাহা হইলে ইহা বিদেশে রপ্তানি করা যায় না এবং যদি একই সময়ে হঠাৎ অনেক লোকে ইহার বদলে ধাতুমুদ্রা দাবী

---

* বিনয় সরকারের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রথম ভাগ পৃঃ ১৯০-৯৪।

করিয়া বসে তবে সরকারী তহবিলে টান পড়া আশ্চর্য্য নহে। অধিকন্তু ইহা প্রতিজ্ঞাপত্র ছাড়া কিছুই নহে ; খাতক ইচ্ছা করিলে সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন, নাও রাখিতে পারেন ; সরকারকে কেহ আইন-আদালত করিয়া এই টাকা দিতে বাধ্য করিতে পারে না। সুতরাং মহাজনকে কেবলমাত্র খাতকের গুড-উইলের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিতে হয়।

(৫) **অপরিশোধনীয় কাগজের মুদ্রা**—পূর্ব্ব বর্ণিত কাগজী মুদ্রার মত ইহাও সরকারের প্রতিজ্ঞা সম্বলিত পত্র। ইহাতেও লেখা থাকে যে উপস্থিত করিলে প্রতিজ্ঞামত ধাতুমুদ্রা দেওয়া হইবে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখা হয় না। এরূপ কাগজী-মুদ্রার মূল্য, দর্শনীমূল্য অপেক্ষা সহজেই কম হইতে দেখা যায় ; তখন ইহাকে "ডিপ্রিসিয়েটেড" বা হতাদর কাগজ কহে। দেশের আইন অনুসারে ও দশের সম্মতিক্রমে এই অপরিশোধনীয় কাগজী-মুদ্রা দ্বারা ধাতুমুদ্রার মত সকল কাজ চালান যায় বলিয়া ধাতু মুদ্রার পরিবর্ত্তে এই কাগজী-মুদ্রা চলিতে দেখা যায়। কিন্তু যদি সরকারের উপর লোকের আস্থা না থাকে বা কাগজ গ্রহণ করিতে না চায়, তবে এই প্রকারের কাগজী মুদ্রার চলন সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৬২—১৮৭৯ সালের ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে পাওয়া যায়। সে সময়ে যুক্ত-রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এত অধিক পরিমাণে কাগজী মুদ্রা চালাইয়াছিলেন যে জিনিষপত্রের দর, বাড়িয়া গিয়াছিল এবং মুদ্রার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে সরকারের প্রাপ্য মিটাইতে কাগজী-মুদ্রা দেওয়া চলিত এবং লোকেরাও যে সরকারের উপর আস্থা হারাইয়াছিল এমন নহে। কিন্তু তখন লোকের কাগজ অপেক্ষা সোণার প্রতিই বেশী টান দেখা যায়। খাতক

ইচ্ছা করিলে অধঃপতিত বা হতাদর কাগজী-মুদ্রায় তাহার ঋণ শোধ করিতে পারিত ; কিন্তু যদি কেহ সেরূপ পন্থা অবলম্বন করিত তবে সকলেই তাহাকে চিনিয়া রাখিত ও কোন মহাজন পরে আর তাহাকে ধার দিত না। সুতরাং কেহই দেনা-পাওনায় কাগজ ব্যবহার করিত না।

(৬) **পরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক নোট**—ইহা ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা সম্বলিত কাগজের অর্থ। ইহাতে লেখা থাকে যে দাবী করিলে প্রতিজ্ঞামত প্রচলিত ধাতুমুদ্রা দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কের ওয়াশীল দিবার ক্ষমতার উপর এইরূপ কাগজের মূল্য নির্ভর করে। যদি ব্যাঙ্কের টাকা দিবার ক্ষমতার উপর লোকের বিশ্বাস থাকে, তবে এই ব্যাঙ্ক নোট আইনতঃ চলৎ-সিক্কায় পরিণত না করিলেও লোকে পাওনার উশুল হিসাবে গ্রহণ করিবে। ইউরোপের অনেক দেশেই মাত্র একটী ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। যথা, ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ জার্ম্মাণী, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড, ব্যাঙ্ক অফ্ রাশিয়া প্রভৃতির নোট চালানোর ক্ষমতা আছে। এই সব বড় বড় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের গভর্ণর সরকারই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ্ রুশিয়া ছাড়া অন্য কোনটীর মালিক সরকার নহেন।

(৭) **অপরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক নোট**—ইহাও ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা-পত্র। ইহাতেও প্রতিজ্ঞানুযায়ী টাকা দিবার কথা লেখা থাকিলেও ব্যাঙ্ক সে প্রতিজ্ঞা রাখেন না। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার যে সব বিপদ আছে, সে সকলগুলিই ইহাতে বর্ত্তমান।*

---

* ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রেশাম-বিধি

যতগুলি সিক্কা বা 'কারেন্সী' ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রায় ২।৩টী কি অধিক একই সাথে প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত আছে ; মাত্র কোন-একটীর দ্বারা কোন দেশের টাকাকড়ির সকল কাজ চালান দুরূহ। বিজ্ঞানের তরফ হইতে একাধিক ধাতুমানের সহিত পরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক-নোট প্রচলিত থাকা সকল কারেন্সী বা সিক্কা ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শ ব্যবস্থা। এরূপ আদর্শ সিক্কা ব্যবস্থায় যে কেহ টাঁকশালে সোণা জমা দিয়া মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া লইতে পারে বলিয়া, দেশের ধাতু-মুদ্রা বিদেশের ধাতু-মুদ্রার চাহিদার অনুসরণ করিতে পারে। তাহা হইলে দর ও পুঁজীর সুদ বাড়া-কমার সাথে সাথে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধাতু-মুদ্রা দেশের বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। দেশের মধ্যে মজুত সোণার পরিমাণ যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে সুদের হার বাড়িবে এবং বিদেশ হইতে সোণা আমদানি হইতে থাকিবে। আর যদি সোণার ষ্টকের পরিমাণ এত অধিক হইয়া দাঁড়ায় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় সুদ কমিয়া যায়, তবে বিদেশে সোণা পাঠাইয়া দেওয়াই লাভজনক হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব মাত্র একবিধ ধাতুমুদ্রা সিক্কারূপে প্রচলিত থাকিলে, যে-সব দেশে ঐ ধাতুমান প্রচলিত, তথাকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থদ্বারাই ঐ সিক্কা নিয়ন্ত্রিত হইবে। আর এক কথা। এরূপ ব্যবস্থায় মুদ্রার বিনিময়-মূল্য এবং ধাতু-মূল্য সর্ব্বদা এক থাকে। এবং সেইজন্য

স্বতঃই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে কেন না একদেশের মুদ্রা গলাইয়া অন্যদেশের মুদ্রায় পরিণত করা যায় অথচ সে জন্য কোন লোকসান সহ্য করিতে হয় না।

অন্যান্য রকমের ক্রেডিটের মত, পরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক নোটও টাকা-কড়ির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ধাতুমুদ্রা ব্যবহারে কৃচ্ছতা আনয়ন করে। দাবী করা মাত্র নোটের বদলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মুদ্রা দিতে হয় বলিয়া সহজে ব্যাঙ্ক অত্যধিক পরিমাণে নোট ছাড়ে না। বেশী নোট ছাড়িলেই তাহা শীঘ্রই আবার ব্যাঙ্কে ঘুরিয়া আসে এবং ব্যাঙ্ককে বদলে আদর্শ মুদ্রা দিতে হয়; সুতরাং ব্যাঙ্ককে শপথ রাখিবার জন্য কমিয়া যাওয়া মুদ্রার ষ্টক বাড়াইবার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় ধাতু-মুদ্রার পরিমাণ ও কাগজী-মুদ্রার পরিমাণ আপনা হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনের সহিত মিলিয়া যায়।

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও মিশরদেশে যে কারেন্সী ব্যবস্থা আছে তাহাতে এই একবিধ ধাতুমানের সহিত পরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক-নোটের চলনই দেখা যায়। তবে অষ্ট্রেলিয়া ও মিশর দেশে এত অধিক পরিমাণে কেবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধাতুমুদ্রা চলিয়া থাকে যে একবিধ ধাতুমুদ্রা প্রচলিত আছে বলিলেও নেহাৎ ভুল হয় না।

প্রায় সকল দেশেই আদর্শ মুদ্রার সহিত রূপা, তামা বা অন্য কোন ধাতু নির্ম্মিত গৌণমুদ্রা প্রচলিত থাকে। এই সব গৌণমুদ্রায় যতটা পরিমাণ ধাতু থাকে তাহা অপেক্ষা উহার দর্শনীমূল্য বা মুদ্রামূল্য অধিক হয়। যদি ঐ গৌণমুদ্রাগুলিতে যতটা ধাতু থাকে তাহার মূল্য, মুদ্রামূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে লোকে ঐ সব মুদ্রা গলাইয়া ফেলিবে এবং দেশেও আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা দেখা যাইবে না। এই সব গৌণমুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য প্রত্যেক দেশেই সরকার নিজেই

বুলিয়ন ক্রয় করিয়া থাকেন। সরকার এইরূপে পরিমাণ সীমাবদ্ধ করেন বলিয়া মুদ্রামূল্যের কোন ব্যত্যয় হয় না। গৌণমুদ্রাগুলি অপরিমিত ক্ষমতাবিশিষ্ট চলৎসিক্কা নহে বলিয়া দেশের টাকাকড়ির আদর্শ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ন্ত্রণ করে না।

লিম্পিং-ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা স্বর্ণ-বিনিময়-মান একবিধ ধাতুমানের মত উপযোগী নহে বা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। যে সব দেশে দ্বিধাতুমান প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সেই সব দেশে তাহা কার্য্যকরী না হওয়ায় লিম্পিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও স্বর্ণবিনিময় মান উদ্ভূত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী ও সুইজার্ল্যাণ্ডে দুইটী ধাতু চলিলেও যে-কেহ রূপা টাঁকশালে দিয়া মুদ্রা তৈয়ার করিয়া লইতে পারে না, যদিও সোণা জমা দিয়া সেরূপ করাইতে পারে।

ধাতুমুদ্রা ও পরিশোধনীয় ব্যাঙ্কনোটের সাথে সাথে, কোম্পানীর কাগজ বা সরকার প্রচলিত কাগজীমুদ্রা প্রচলিত থাকিলে কারেন্সী ব্যবস্থার মধ্যে আরো জটিলতা আসিয়া পড়ে। সাধারণতঃ সরকারী কাগজীমুদ্রা অন্যান্য প্রকারের মুদ্রাকে ক্রমশঃ সরাইয়া দেয়। এই কাগজীমুদ্রা পরিশোধনীয় হইলেও একথা কতক কতক খাটে; আর অপরিশোধনীয় হইলে ত কথাই নাই। আবার এই অপরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রা যদি চলৎ-সিক্কা হয় তবে "গ্রেশাম-বিধি"র কার্য্যকারীতা দেখা যায়। রাণী এলিজাবেথের বাণিজ্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা স্যার টমাস গ্রেশাম আনুমানিক ১৫৪৯ খৃঃ এই নিয়মটী সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। নিয়মটী এই, **"যে-দেশেই দুই ধাতুর মুদ্রা একসঙ্গে চলৎ-সিক্কা বলিয়া প্রচলিত সেই দেশেই মানুষ ঐ দুই রকম মুদ্রার মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত মন্দ**

সেই অর্থদ্বারা বিনিময়ের কাজ চালায়, আর ভাল অর্থ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে।" ইহাকেই সংক্ষেপে বলা হয় যে "নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে সরাইয়া দেয়।" কথাটা শুনিলে একটু ধাঁধাঁর মত ঠেকে; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রধাণতঃ ঋণ-পরিশোধের জন্যই মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আইনতঃ যদি দুইটী বিভিন্ন ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারায় ঋণ পরিশোধ করা যায় (দুইটী মুদ্রাই চলৎ-সিক্কা বলিতে ইহাই বুঝায়) তবে স্বভাবতঃই লোকে দুইটীর মধ্যে যেটী নিকৃষ্ট সেইটী দিয়াই ঋণ পরিশোধ করিবে এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী নিজের কাছেই রাখিয়া দিবে। দুইটী মুদ্রার একটী উৎকৃষ্ট ও অপরটী নিকৃষ্ট বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, দুইটীর যে কোনটীর দ্বারায়ই ঋণ পরিশোধ করা গেলেও, সোণা-রূপার (বা বুলিয়ন্) বাজারে বা সেকরার দোকানে দুইটীর সমান মূল্য নাই। সেখানে সোণার দর রূপার চেয়ে কিছু চড়া অর্থাৎ সোনার উপর একটা "প্রিমিয়ম্" বা ধরাট আছে। সুতরাং ঋণ পরিশোধ করিতে শুধু রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করিয়া স্বর্ণমুদ্রা নিজের কাছে রাখিয়া বুলিয়ন বাজারে বা সেকরার কাছে বিক্রয় করাই লাভজনক। অতএব যখন দেখা যাইবে যে, স্বর্ণ বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে বা সরিয়া পড়িয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে লোকে উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী রাখিয়া নিকৃষ্ট মুদ্রাটীই ছাড়িয়া দিতেছে। সকলেই হতাদর বা অধঃপতিত মুদ্রাই ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী লাভজনক ভাবে খাটাইবার জন্য রাখিয়া দেয়। ধরা যাক্, টাঁকশালে ১৬ আউন্স রূপা জমা দিলে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়, এক আউন্স সোণা জমা দিলেও ঠিক ততটা

মূল্যের মুদ্রা পাওয়া যায়; তাহা হইলে আমার ১৬ আউন্স রূপা ১ আউন্স সোণার সমান দাঁড়াইল; আরও ধরা যাক, বুলিয়ন বাজারেও সোণা-রূপা এইহারে কেনা-বেচা হয়; তাহা হইলে আমায় যখন ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, তখন আমি যেটী ইচ্ছা সেইটী দিয়াই করিব, কেন না উভয় মুদ্রাই সমান উৎকৃষ্ট বা সমান নিকৃষ্ট, সুতরাং কোন একটী বিশেষ ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাকে হাতছাড়া করিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু যদি বুলিয়ন বাজারে কোন কারণে ১৭ আউন্স রূপার মূল্য এক আউন্স সোণা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বাজার দর হিসাবে সোণার ধরাট থাকিবে এবং রৌপ্যমুদ্রা নিকৃষ্ট-মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইবে, কেন না এই অবস্থায় ১ আউন্স সোণা বুলিয়ন বাজারে বিক্রয় করিলে ১৭ আউন্স রূপা পাওয়া যায়। আবার এই ১৭ আউন্স রূপা টাঁকশালে জমা দিলে ১৬ আউন্স রূপার বদলে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া যাইত তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যাইবে। অতএব স্বর্ণমুদ্রা কাছে রাখিয়া সোণারূপার বাজারে বিক্রয় করিয়া, সেই রূপায় টাঁকশাল হইতে মুদ্রা করাইয়া লইয়া ঋণ-পরিশোধ করাই লাভজনক। ফলে এই দাঁড়াইবে যে, দেশের টাকাকড়ির মধ্যে আর স্বর্ণমুদ্রা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, রৌপ্য মুদ্রারই প্রাধান্য দেখা যাইবে।

কোন্ কোন্ অবস্থায় গ্রেশাম-বিধি খাটিতে দেখা যাইবে তাহা দুই-একটি উদাহরণ দেখিলেই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যাইবে। কোন দেশের সরকার যখন পুরাতন মুদ্রা বা ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিকে টাকাকড়ির বাজার হইতে সরাইয়া ফেলিতে চাহেন তখন এই নিয়ম খাটিতে দেখা যায়। যদিও পুরাতন মুদ্রা ও নতুন মুদ্রা উভয়েরই ক্রয়শক্তি এক তথাপি লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নতুন মুদ্রা হাতে পাইলেই রাখিয়া দিতে চেষ্টা করে। মনে কর, তোমাকে কিছু টাকা অপর এক

ব্যক্তিকে দিতে হইবে ; তুমি পকেটে হাত দিয়া এক মুঠা টাকা বাহির করিলে—দেখিবে যে তুমি তোমার অজানিতেই চক্‌চকে টাকাগুলি নিজের পকেটে রাখিয়া ময়লা টাকাগুলি তাহাকে দিবে। সুতরাং নতুন মুদ্রাগুলি বাজারে আসিবার সাথে সাথেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পুরাতন মুদ্রাগুলিকে দেখা যায়। এবং যদি সরকার নতুন মুদ্রা যেরূপভাবে ছাড়িতে থাকিবেন সেইরূপ ভাবে পুরাতন মুদ্রা তাঁহার হাতে আসিলে যদি তাহা আটকাইয়া না রাখেন, তবে বহু দিন পর্য্যন্ত কেবল পুরাতন মুদ্রাই বাজারে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা, যদি কারেন্সীর যোগান একা পুরাতন মুদ্রা সম্পূর্ণ মিটাইতে না পারে, তবে পুরাতন মুদ্রার সহিত নতুন মুদ্রাও চলিতে দেখা যাইবে। দুইটী ধাতু চলৎ-সিক্কা রূপে প্রচলিত থাকিলে, যে ধাতু-মুদ্রাটী হতাদর হয় তাহা অপরটীকে বাজার হইতে সরাইয়া ফেলে। পূর্ব্বেই স্বর্ণমুদ্রা ও হতাদর রৌপ্য মুদ্রার উদাহরণ দিয়া একথা বোঝাইয়াছি।

১৮৮৫ খৃঃ মিশর দেশে মুদ্রা প্রস্তুত ব্যবস্থার সংস্কারের পর এই গ্রেশামের নিয়ম খাটিতে দেখা গিয়াছিল। সংস্কারের পূর্ব্বে মিশর দেশীয় পাউণ্ড ছাড়াও টার্কিশ পাউণ্ড, ফ্রেঞ্চ নেপোলিয়ন ও ইংলিশ সভারিণ প্রচলিত ছিল। এ তিনটী বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা চলৎ-সিক্কারূপে একটী নির্দ্দিষ্ট শুল্ক-হারে দেশের মধ্যে অবাধ ভাবে প্রচলিত ছিল। মহম্মদ আলির সময় যখন এই শুল্ক-হার স্থির করিয়া দেওয়া হয় তখন টার্কিশ মুদ্রার শুল্কের হার ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ফ্রেঞ্চ মুদ্রার তাহা অপেক্ষা অল্প এবং ইংলিশ মুদ্রার সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই পক্ষপাতিতার ফল কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশেই, যথেষ্ট পরিমাণে সোণা ছিল না বলিয়া যে কোন পরিমাণ বিদেশ হইতে আসিত সকলই

নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু ১৮৮৫ খৃঃ পরই নানা কারণে প্রচুর পরিমাণে সোণা দেশে আসিতে থাকে এবং গ্রেশামের নিয়ম খাটিতে দেখা যায়, কিন্তু একটু বিভিন্ন ভাবে। এই ১৮৮৫ খৃঃ পূর্ব্ব বা পরেই মিশরীয় পাউণ্ড তেমন যথেষ্ট পরিমাণে চালান হয় নাই; সুতরাং এই তিনটী বিদেশী মুদ্রার মধ্যেই টক্কর লাগে। সে সময়ে মিশরীয় পাউণ্ডের তুলনায় এই তিন মুদ্রাই উৎকৃষ্ট দাঁড়াইয়াছিল; তবে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল ইংলিশ মুদ্রা, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল ফরাসী মুদ্রা এবং টাকিশ মুদ্রা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ফলে দাঁড়াইল এই যে অন্য দুটীর তুলনায় ইংলিশ সভারিণ নিকৃষ্ট ছিল বলিয়া ঐ দুটী মুদ্রাকে বাজার হইতে সরাইয়া দিল।

ধাতুমুদ্রা বিশেষতঃ স্বর্ণমুদ্রার সহিত যদি হতাদর কাগজী-মুদ্রা চলৎ-সিক্কারূপে প্রচলিত থাকে তবে এই নিয়মটী খাটিতে দেখা যাইবে। সমগ্র ইউরোপব্যাপী মহাসমরের পর এই নিয়ম অনুসারে কাগজী মুদ্রার চলন বড় বেশী দেখা যায়।

গ্রেশাম-বিধি অনুসারে উৎকৃষ্ট মুদ্রা সরিয়া পড়ে—একথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এই উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি যায় কোথা? প্রথমতঃ সৌভাগ্য বশতঃ যাহার হস্তে এই মুদ্রাগুলি যাইয়া পড়ে তাহার যদি সেগুলি জমা করিয়া রাখিবার মত ক্ষমতা থাকে তবে সে সেগুলি বাক্সবন্দী করিয়া রাখে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি সঞ্চিত হইতে থাকে বা গাদা করিয়া রাখা হয়। কোন লোকে যদি টাকাকড়ি জমা করিয়া বাক্সবন্দী করিয়া রাখিতে চায় তবে স্বভাবতঃই সে নতুন চক্‌চকে মুদ্রাগুলি পাইলে আগে সেইগুলিকেই রাখিয়া দিবে। মিশরীয়দের মধ্যে এই অভ্যাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখনি দেশে টাকাকড়ির অভাব উপস্থিত হইত, তখনি বাজারে বহু বৎসর

পূর্ব্বেকার ছাপ দেওয়া টাকা বেশ চক্‌চকে অবস্থায় দেখা যাইত। ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পর আমাদের দেশেও লোকে টাকা বা গিনি হাতছাড়া করিতে চাহে নাই। কিন্তু যে দেশে লোকে নিজের কাছে বাক্সে বন্ধ করিয়া বা মাটী খুঁড়িয়া পুঁতিয়া না রাখিয়া টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখে, সেখানে এই বিধি একটু বিভিন্ন ভাবে খাটিতে দেখা যায়। ব্যাঙ্ককে মাঝে মাঝে টাকাকড়ি বিদেশে চালান দিতে হয়। যে-সব লোকের ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব থাকে, তাহাদিগকে বিদেশ হইতে মাল আমদানী করার জন্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কের মারফতেই পাঠাইতে হয়। ব্যাঙ্ক স্বভাবতঃই সোণা ঋণ পরিশোধের জন্য পাঠাইয়া থাকে কেননা যদি সোণার বদলে ব্যাঙ্ক রূপা পাঠাইতে চায় তবে তাহাকে তাহা রূপার বুলিয়ান দরেই পাঠাইতে হইবে, অথচ দেশের মধ্যে রূপার মুদ্রার দর থাকে বেশী যেহেতু রূপার মুদ্রা-মূল্য, ধাতু-মূল্য অপেক্ষা বেশী থাকে। এইভাবে দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্য রূপা থাকিয়া যায় আর সোণা বিদেশী ঋণ-পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী বিদেশে চলিয়া যায়। অধিকন্তু উৎকৃষ্ট মুদ্রাটীকে বুলিয়ান হিসাবে বিক্রয় করিলেও লাভ হয়। যতদিন কোন একটা দেশে রূপা টাঁকশালে পাঠাইয়া মুদ্রায় পরিণত করা যায়, ততদিন সেই দেশে রূপার বুলিয়ান মূল্য খুব বেশী অধঃপতিত হইতে পারে না এবং রূপার তালের স্থানীয় মূল্য কৃত্রিম ভাবে বজায় রাখা যায়। কিন্তু যে-সব দেশে রূপাকে টাঁকশালে জমা দিয়া মুদ্রায় পরিণত করা যায় না, সে-সব দেশে রূপার মূল্য, যে-দেশে রূপাকে অবাধভাবে চলৎ-সিক্কা মুদ্রায় (লিগ্যাল টেণ্ডার মনি) পরিণত করা যায়, সে-দেশ অপেক্ষা অনেক সস্তা হইয়া পড়ে। তখন এই সব দেশের ব্যবসায়ীরা করে কি—

নিজের দেশে রূপাকে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া সোণায় পরিণত করে এবং যে-সব দেশে রূপার দর সস্তা তথায় পাঠাইয়া রূপা খরিদ করে এবং আবার সেই রূপা দেশে আনিয়া টাঁকশালে জমা দিয়া মুদ্রায় পরিণত করিয়া মোটা লাভ করে এবং আবার কারবার করিতে করিতে সেগুলিকে সোণায় পরিণত করে। ফলে এই হয় যে অতি সত্বর সকল সোণা সরিয়া পড়ে এবং টাকাকড়ির বাজারে একমাত্র রূপাই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মনে হইতে পারে যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি যে-সব দেশে কারেন্সী ব্যবস্থার মধ্যে রৌপ্য মুদ্রারও চলন আছে সে-সব দেশে সোণা সরিয়া পড়ে না কেন? ইহার হেতু এই যে, সে-সব দেশে লোকে রূপা টাঁকশালে জমা দিয়া ইচ্ছামত মুদ্রায় পরিণত করিতে পারে না। রূপাকে মুদ্রায় পরিণত করিবার ক্ষমতা সরকার নিজের হাতেই সম্পূর্ণ রাখিয়াছেন; অপর কেহ মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারে না বা করাইয়াও লইতে পারে না। এইভাবে সরকার রৌপ্যমুদ্রার জন্য বাণী আদায় করিয়া নিজের তহবিল বাড়ান কিন্তু সেজন্য সরকারকে অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে; সরকারকে দেখিতে হয় যে, যেন রৌপ্য-মুদ্রা অধিক পরিমাণে ছাড়া না হয়, কেননা তাহা হইলে রূপার মূল্য কমিয়া যাইবে বা হতাদর-বিশিষ্ট হইবে। যাহাতে বেশী ছাড়াও না হয়—একবারে প্রয়োজনের মত ঠিক ঠিক ছাড়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বড় সহজ কথা নয়, যেহেতু অধিক বা অল্প ছাড়া—উভয়ের ফলই ভয়ঙ্কর। রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ কম থাকিলে যাহারা সোণার বদলে রূপা চায় তাহাদিগকে মুস্কিলে পড়িতে হয়। সরকার সাধারণতঃ কখনও প্রয়োজনের অপেক্ষা কম রৌপ্যমুদ্রা ছাড়িতে চাহিবেন না, কেননা, তাহাতে তাঁহার অতখানি পরিমাণ বাণী লোকসান হইবে।

অধিক রৌপ্য-মুদ্রা ছাড়ার ফল এত ভয়ানক যে সরকারের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারিলেই রদ করিবার চেষ্টা করা উচিত। রূপাকে যদি অবাধ ভাবে টাঁকশাল হইতে মুদ্রায় পরিণত করা যায় তবে অল্প সময়েই সোণা দেশের টাকাকড়ির বাজার হইতে সরিয়া পড়িবে। সেইজন্য রূপাকে চলৎ-সিক্কা করা উচিত নয় এবং রূপার মুদ্রা চালান, সরকারের হাতেই থাকা উচিত ; পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা আছে।

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিধাতুমান

দেশ-বিদেশের কারেন্সী ব্যবস্থার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিধাতুমানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক সময়ে এই দ্বিধাতুমান প্রসঙ্গ লইয়া ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আজ যদিও একথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে তথাপি এই প্রশ্ন পুনরায় উদ্দীপিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তাই এই প্রবন্ধে দ্বিধাতুমানের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

এই তর্কের মূল সমস্যা হইতেছে এই—যে শুধু সোণাই চলৎ-সিক্কারূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, না সাথে সাথে রূপা-ও-ঋণ-পরিশোধের জন্য অপরিমিতভাবে ব্যবহার হইতে পারে? যদি দ্বিধাতুমান কাজে লাগাইতে হয়, তাহা হইলে সোণা ও রূপা এই দুইটীর ধাতু-মূল্যের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত বা "রেশিও" বাঁধিয়া দিতে হয় এবং সেই অনুপাতটাকে সর্ব্বোতভাবে স্থির রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়; এই মূল্যের অনুপাত সোণারূপার বাজার-মূল্যের অনুরূপ হওয়া চাই এবং ঐ দুইটী বিভিন্ন ধাতু-নির্ম্মিত আদর্শ-মুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু থাকে, তাহাদের আপেক্ষিক ওজনের অনুরূপ হওয়া চাই। কেননা ইহা সহজেই বোঝা যায় যে, যদি বিশটী শিলিংকে সত্যসত্যই একটা সভারিণের তুল্যমূল্যের করিতে হয় তবে ঐ দুইটী বিভিন্ন মুদ্রার সোণা ও রূপার ওজন এরূপ করিতে হইবে যে, যাহাতে বিশটী শিলিংএ যে-ওজনের রূপা থাকে, তাহার বাজার-মূল্য একটী সভারিণে যে

পরিমাণ সোণা থাকে ঠিক তাহার সমান হয়। দুইটী বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রার মূল্য স্থির রাখার মাত্র একটী উপায় আছে—একটা অনুপাত স্থির করিয়া দুইটী মুদ্রার ওজন ও মূল্য স্থির করিতে হয় এবং এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় যাহাতে ঐ দুইটী মুদ্রার বাজার মূল্যের মধ্যেও ঐ অনুপাতটা বজায় থাকে এবং ইহা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায় হইতেছে উভয়বিধ ধাতুর জন্য খোলা টাঁকশাল কায়েম করা অর্থাৎ এরূপ একটী টাঁকশাল কায়েম করা যেথা যে-কোন ব্যক্তি ঐ দুইটী ধাতুর যে-কোন ধাতু দাখিল করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে আদর্শ-মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারে। ১৮০৩ খৃঃ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ল্যাটীন ইউনিয়ন দেশসমূহে ১৫½ : ১ এই অনুপাত প্রচলিত ছিল; ইহার অর্থ এই যে, ২০টী রৌপ্য ফ্রাঁতে বা চারিটী পাঁচ ফ্রাঁতে যে-ওজনের খাঁটী রূপা থাকিত, তাহা ৩১০ ফ্রাঁ। সোণা বা বিশ ফ্রাঁওলা ১৫½টী নেপোলিয়নে যে-ওজনের খাঁটী সোণা থাকিত তাহার সমান (ফ্রান্সে স্বর্ণ-মুদ্রা ও রৌপ্য-মুদ্রায় $\frac{9}{10}$ ভাগ খাঁটী ধাতু থাকে)। ইউরোপের বাকী দেশগুলিতে ক্রমশঃ একবিধ ধাতুমান প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও ল্যাটীন দেশসমূহ প্রায় সত্তর বৎসর কাল এই অনুপাতটী বজায় রাখিয়াছিল; ১৮৭৩ খৃঃ এই দেশগুলিকে বাধ্য হইয়া রূপা টাঁকশালে পাঠাইয়া মুদ্রা করাইয়া লইবার লোকের অবাধ ক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং তখন হইতেই দ্বিধাতুমান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। খোলা টাঁকশাল ("ফ্রি মিণ্ট") বজায় রাখাই হইল দ্বিধাতুমানের প্রধান সমস্যা।

যাঁহারা ইহার প্রতিবাদী তাঁহারা বলেন যে, একমাত্র স্বর্ণমুদ্রাই চলৎ-সিক্কা বা লিগ্যাল টেণ্ডার হওয়া উচিত; রৌপ্য-মুদ্রা, তামা কি

দস্তা নির্ম্মিত মুদ্রার মত, কেবল মাত্র গৌণ-মুদ্রা বা নিদর্শক-মুদ্রা রূপেই চলা উচিত এবং রূপাকে মুদ্রায় পরিণত করিবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই থাকা উচিত। ইহাকেই একবিধ ধাতুমান কহে এবং ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থাই আছে। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, বিভিন্ন দেশের কারেন্সী ব্যবস্থার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা প্রথমে ইংলণ্ডের কথাই আলোচনা করিব এবং সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিব। এই সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকের মনে সোণা-রূপা প্রভৃতি ধাতু সম্বন্ধে কি পন্থা অবলম্বন করা যাইবে সে লইয়া নতুন ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। কলম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপের সকল দেশ সমূহেই এই ধাতুগুলির অভাব অনুভূত হইতেছিল। এ যাবৎকাল প্রাচ্যের দেশ সমূহ হইতেই সোণা-রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি আহরণ হইতেছিল; কিন্তু প্রাচ্যের খনিসমূহ শেষ হইয়া যাইতে থাকায় এই ধাতুগুলির অভাব ইউরোপে উপস্থিত হয়। এবং প্রত্যেক দেশেই তখন এই মূল্যবান ধাতুগুলিকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতে থাকে; ফলে সকল দেশেই সোণা-রূপা রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য নানারূপ আইন প্রণয়ণ হইতে থাকে, যদিও সেগুলি যে খুব ফলপ্রদ হইয়াছিল তাহা বলা চলে না। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের সাথে সাথে যেমন সোণা-রূপার যোগান অপরিমিতভাবে বাড়িয়া গেল, অমনি সোণা-রূপার যোগান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে লোকের ধারণারও পরিবর্ত্তন হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় একদল ভাবুক দেখা দেয় তাঁহাদের "মার্কেন্টিলিষ্ট" (বাণিজ্যবাদী) বলা হইত। ইঁহারা বলেন যে, যদি দেশের সোণার যোগান ঠিক রাখিতে হয় তবে এরূপভাবে বাণিজ্য

চালান দরকার যেন অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি থাকে অর্থাৎ রপ্তানির পরিমাণ আমদানি অপেক্ষা অধিক হয়। কেননা তাহা হইলে অন্যান্য দেশসমূহ বাড়্তি অংশটা সোণা বা রূপা দিয়া পূরাইয়া দিবে। বাণিজ্যবাদীদের এই যুক্তির ফলেই ১৬৬৩ খৃঃ ইংলণ্ডে এক আইন পাশ করা হয় যাহার ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত সোণারূপা অবাধভাবে রপ্তানি করিতে দেওয়া হয়। এই আইন পাশ হইবার পরই ইংলণ্ডে মুদ্রা সংস্কার হয় এবং স্বর্ণনির্ম্মিত গিনি চলিতে থাকে এবং এক আউন্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড সোণার মূল্য ৩ পাং ১৪ শিঃ ২ পেঃ করা হয়। কিন্তু অল্পদিনেই দেখা গেল যে এই নির্দ্দিষ্ট মূল্যটা রৌপ্য মুদ্রার তুলনায় কম এবং সেইজন্য নতুন মুদ্রাগুলি সহজেই বাজার হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল; তাই গিনির দর চড়াইয়া ৩০ শিলিং করা হইল। ১৬৯৬ খৃঃ দার্শনিক জন্ লকে ও আইসাক্ নিউটনের পরামর্শে পুনরায় মুদ্রা সংস্কার করা হয় ও গিনির দর ২১ শিঃ ৬ পেঃ কমিয়া যায়; ইহাও বেশী দর মনে হওয়াতে ১৭১৭ খৃঃ স্যার আইসাক্ নিউটন গিনির দর ২১ শিঃ স্থির করিয়াছেন; ইহা ১৫$\frac{1}{2}$ঃ ১ এই অনুপাতের সমান। এই সময় হইতেই ইংলণ্ডে রূপার বদলে সোণাকে প্রধান সিক্কারূপে দেখা যায়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম রূপার অপরিমিত চলৎ-সিক্কা ক্ষমতা রোধ করা হয়। এই বৎসর আইন করিয়া স্থির করা হয় যে রৌপ্যমুদ্রা লোকে মাত্র ২৫ পাউণ্ড পরিমাণ পর্য্যন্ত লইতে আইনতঃ বাধ্য। ১৭৯৮ খৃঃ নেপোলিয়নিক্ যুদ্ধের সময় 'ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড'কে সোণা দেওয়া বন্ধ করিতে হয় এবং টাঁকশালে রূপাকে অবাধে মুদ্রায় পরিণত করা-ও বন্ধ করিতে হয়। ফলে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ এত অল্প হইয়া পড়ে যে মুদ্রার চাহিদা মিটাইবার জন্য নানারূপ নিদর্শক মুদ্রা তৈরী করিতে হয় এবং বহুল পরিমাণে ফরাসী রৌপ্যমুদ্রাও

আমদানী করিতে হয় যদিও যুদ্ধটা চলিতেছিল ফরাসী দেশের সহিতই। বোধ হয় রূপার বাজার এরূপ খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ও সোণার দর চড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই লোকে সোণাটাকে মুদ্রা হিসাবে উচ্চতর স্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিকন্তু সে সময়ে ইংলণ্ডের শিল্পগুলি ব্যাপকতা লাভ করিতে থাকায় দেশে প্রচুর ধন জমিতেছিল এবং লেনদেন ব্যাপারে বহুল পরিমাণে মুদ্রা নাড়াচাড়া করিতে হইতেছিল; রূপার মূল্য কম এবং ওজনও কম নহে, তাই লোকে রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহারের অসুবিধা বেশ অনুভব করিতেছিল। সুতরাং যুদ্ধের পরে ১৮১৬ খৃঃ যখন সিক্কা ব্যবস্থা লইয়া তর্ক উঠে, তখন সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সোণাকেই রূপার অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেওয়া হয় এবং সেইমত আইন পাশ করা হয়। এই ব্যবস্থায় সভারিণই আদর্শ ইউনিট্ বলিয়া ধরা হয় এবং রূপাকে নিদর্শক মুদ্রায় পরিণত করা হয়. ও ২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চলৎ-সিক্কার আদর দেওয়া বা লিগ্যাল টেণ্ডার করা হয়; যে-কেহ আর, রূপা টাঁকশালে লইয়া গিয়া মুদ্রায় পরিণত করিতে পারিবে না। রৌপ্যমুদ্রার ধাতু-মূল্যও কিঞ্চিৎ কমাইয়া দেওয়া হয়—যেহেতু এই আইন অনুসারে এক পাউণ্ড রূপায় ৬২ শিলিংএর পরিবর্ত্তে (এখন হইতে) ৬৬ শিলিং করা হইবে বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ ধরা হয় যে ফ্রান্স প্রদেশে ১৮০৩ খৃঃ হইতে ১৫½ : ১ এই অনুপাত চলিতে থাকে। ১৮০৩ খৃঃ পর দ্বিধাতুমানের চলন ফ্রান্স ও পাশাপাশি দেশ সমূহেই দেখা যায়। ১৮২০ খৃঃ পরে সোণার কদর বাড়িয়া যায় ("এপ্রিসিয়েটেড") অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রার ধাতু-মূল্য ফরাসী টাঁকশাল অনুপাত অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে এই হয় যে রৌপ্য-মুদ্রা অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে এবং অনেক সোণা রপ্তানি

হইতে থাকে—কিন্তু তথাপি সোণার অভাব খুব বেশী অনুভূত হয় নাই। কেননা রৌপ্য নির্ম্মিত পাঁচ-ফ্রাঁ খণ্ডগুলি স্বর্ণ-মুদ্রার কাজ বেশ চালাইতেছিল। ১৮৪৮—৪৯ খৃঃ ক্যালিফোর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে স্বর্ণখনি আবিষ্কার হওয়ায় এই দেশ সমূহের টাকাকড়ি ব্যবস্থার বিষম ওলট-পালট হইয়া গেল। এই খনিগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায় সোণার যোগান অপর্য্যাপ্ত বাড়িয়া গেল এবং তার ফল যে কি হইবে তাহা বিশেষজ্ঞরাও আঁচ করিতে পারেন নাই। ফ্রান্সে স্বর্ণ-নেপোলিয়নের আবির্ভাবে লোকের মনে নতুন আশা-উদ্যম দেখা দেয়—সকলেই মনে করিল যে এবারে সুখের দিন আসিয়াছে। ইহার ফল (অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত সোণা যোগানের ফল) যে কি হইবে তাহা কেহ ভাবিতে চেষ্টা করে নাই। লোকে যখন লক্ষ্য করিল যে রূপা অল্পে অল্পে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে তখন সকলের নজর এইদিকে পড়িল। তখন ধনবিজ্ঞানসেবী ও অর্থনীতিবিশারদগণ লক্ষ্য করিলেন যে, সোণা অধঃপতিত হইয়া গ্রেশামবিধি অনুসারে অল্পে অল্পে রূপাগুলি সরাইয়া দিতেছে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ সমূহ একথা বুঝিল ফ্রান্সের বহুকাল পরে—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। ইত্যবসরে ১৮৬৫ খৃঃ ফ্রান্স, ইতালী, সুইজার্ল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া "ল্যাটীন-ইউনিয়ন" নাম পরিগ্রহণ করিয়া স্থির করিল যে এইসব দেশগুলির টাকাকড়ির ব্যবস্থা একরূপ করা হইবে, যাহাতে একদেশের মুদ্রা অবাধে অন্যদেশে ব্যবহার হইতে পারে। এই মুদ্রা ব্যবস্থায় 'ফ্রাঁ'ই হইল আদর্শ; তবে ইটালী স্বীয় দেশের মুদ্রার নাম "ফ্রাঁ" না বলিয়া "লিরা"ই রাখিল; অন্যান্য দেশসমূহ ফ্রাঁ ব্যবহার করিলেও স্বীয় দেশ অনুযায়ী ছাপ অঙ্কিত করিত। ১৮৬৮ খৃঃ গ্রীশ দেশও ল্যাটীন ইউনিয়নে যোগ দেয়। তাহা বলিয়া এই ইউনিয়নের সমস্যার কিছু

সমাধান হইল না। দ্বিধাতুমান চালান স্থির করিয়া রূপার চলৎ-সিক্কা সীমাবদ্ধ করা বা অবাধ মুদ্রা-প্রণয়ণ রোধ করা সম্ভব ছিল না অথচ দুনিয়ার সমস্ত দেশগুলিতে রূপা যোগান দেওয়াও অসম্ভব ছিল। তাই এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিতে হইল; সুইজারল্যাণ্ডই প্রথমে এ পথ দেখায়। পাঁচ-ফ্রার রৌপ্য মুদ্রাগুলি ছাড়া আর সব রৌপ্যমুদ্রাগুলিকে নিদর্শক মুদ্রায় পরিণত করা হইল এবং এই নিদর্শক মুদ্রাগুলির খোলা টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ফল এই হইল যে ক্রমে ক্রমে সকল পাঁচ-ফ্রাঁগুলি বিদেশে চলিয়া গিয়া দেশের মধ্যে কেবলমাত্র নিদর্শক রৌপ্যমুদ্রাগুলি রহিয়া গেল; এইগুলি দেশের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রার কাজ বেশ চালাইতেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মজা হইল। ১৮৬৫ খৃঃ কাছাকাছি আমেরিকায় রৌপ্যখনি আবিষ্কৃত হওয়ায়, দুনিয়ায় রূপার যোগান্ বাড়িয়া যায় এবং সোণার তুলনায় রূপার মূল্য ক্রমশঃ কমিতে থাকে; সুতরাং গ্রেশাম-বিধি ঠিক বিপরীতভাবে খাটিতে দেখা গেল অর্থাৎ ক্রমশঃ সোণা সরিয়া পড়িতে লাগিল আর ইউরোপ মহাদেশ রূপায় ছাইয়া গেল। ফলে হইল ফ্রান্সের বিপদ্—পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রাগুলি না হইলেও তাহার বড় বেশী কিছু আসিয়া যাইত না, কিন্তু সোণা না হইলে ত চলে না! কেননা মোটা টাকার পাওনা ব্যাঙ্ক-নোট বা অন্যবিধ কাগজীমুদ্রা দিয়া মেটানো খুব জোরের সাথে তখনও ফ্রান্সে চলে নাই।

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সঙ্কট আরো বাড়াইয়া দিল। জার্ম্মাণী এতদিন ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি গভীর ভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; এবং দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিল যে, ইংলণ্ড, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছে বলিয়াই তাহার এই

উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। তাই জার্ম্মাণী, ইংরাজকে অনুবর্ত্তন করিবার মতলব আঁটিতেছিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফ্রান্সকে ২৭০,০০০,০০০ পাউণ্ড জার্ম্মাণীকে দিতে হয়; জার্ম্মাণী এই মোটা টাকা সোণা দিয়া পূরাইয়া দিতে বলিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশের রৌপ্যনির্ম্মিত "থেলার" গুলি বাজারে ছাড়িতে লাগিল। এই থেলার গুলি আকারে ও ওজনে প্রায় পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রাগুলির সমান ছিল। ব্যাপার দাঁড়াইল এই—আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে রূপা আসিতে ছিল, আবার জার্ম্মাণীও রূপা দিয়া বাজার ছাইয়া দিল; অধিকন্তু, জার্ম্মাণী যে, রূপার একটা বড় খরিদ্দার ছিল তাহাও রহিল না; সুতরাং রূপার দর ভয়াবহরূপে পড়িতে লাগিল। ল্যাটীন ইউনিয়ন দেশগুলি হতাশ হইয়া পড়িল—একটা বিপদ কাটাইতে না কাটাইতে নূতন একটা বিপদের সূত্রপাত হইতেছিল। এতদিনে তাহারা বুঝিল যে, এতগুলি বিভিন্ন শক্তির প্রতিকূলে সোণা-রূপার, স্থির-অনুপাত-বিশিষ্ট দ্বিধাতুমান প্রচলিত রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানও সহজ ছিল না, কেননা দেশের লোকের মনে দ্বিধাতুমান এরূপভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল যে সম্পূর্ণভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া, জার্ম্মাণীর দেখান পথ অবলম্বন করিতে মন সরিতে ছিল না; তাঁহারা নামে দ্বিধাতুমান বজায় রাখিয়া স্বর্ণমান প্রচলনের উপায় খুঁজিতেছিলেন। একটা অভিনব উপায়ও বাহির করিলেন। পাঁচ-ফ্রাঁ খণ্ড গুলিকে চলৎ-সিক্কার ইজ্জৎ দিলেন বটে, কিন্তু সে গুলিকে অবাধ মুদ্রা (ফ্রি মিণ্টিং) হইতে দিলেন না। অতএব প্রকৃতপক্ষে আর দ্বিধাতুমান রহিল না, কেননা লোকে আর রূপা টাঁকশালে জমা দিয়া, পাঁচ-ফ্রাঁয় বা অন্য কোন মূল্যের মুদ্রায় পরিণত করিতে পারিত না। তখন হইতে ল্যাটীন ইউনিয়ন দেশ সমূহের কারেন্সী ব্যবস্থাকে লিম্পিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলা হয়—কাজে ইহা

একবিধ ধাতুমান আর নামে দ্বিধাতুমান, কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই চলৎ-সিক্কা।

ল্যাটীন ইউনিয়ন এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিবার পর, ১৮৭৩ খৃঃ পর হইতে রূপার দর খুব তাড়াতাড়ি পড়িতে থাকে। ইহার ফলে যে, রৌপ্য-উৎপাদকেরই শুধু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল তাহা নহে, কেননা সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের দরও নামিয়া যাইতেছিল। "টাকাকড়ির পরিমাণবাদ" অতি প্রাচীন হইলেও, লোকে সহজে ইহা স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না—ক্রমশঃ লোকে ইহার সত্যতা অনুভব করে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত দুনিয়ার সর্ব্ববিধ ধনদৌলৎ বাড়িয়া চলিতেছিল; সুতরাং দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর টাকাকড়ি বিনিময়ের ব্যবসা চালাইবার জন্য প্রয়োজন হইতেছিল। কিন্তু সোণার যোগান বাড়িতেছিল না, একরূপ স্থিরই ছিল; আর রূপা প্রায় ইউরোপের সকল দেশগুলিতেই টাকাকড়ির কদর হারাইয়াছিল বলিয়া, টাকাকড়ির কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিতেছিল না। অর্থাৎ ফল এই হইয়াছিল যে, দুনিয়ার বাজারে যে-পরিমাণ টাকাকড়ির দরকার ছিল তাহা পাওয়া যাইতেছিল না বলিয়া, যে-পরিমাণ টাকাকড়ি বাজারে ছিল তাহা দিয়াই কাজ সারিতে হইতেছিল; তাই সর্ব্ববিধ পণ্যের দর পড়িয়া যায়।

এদিকে ভারতবর্ষেও বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে একরূপ রূপাই একমাত্র কারেন্সী বা সিক্কা ছিল। রূপার দর ছিল আউন্স প্রতি ৬২ পেন্স বা একটা টাকার বদলে দুইটী শিলিং পাওয়া যাইত; কিন্তু দুনিয়ার বাজারে রূপার দর ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছিল বলিয়া, ভারতবর্ষের বাহিরে রূপার বিনিময় মূল্যও নামিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকবল ছিল অত্যধিক। মুদ্রা ও শিল্পাদির জন্য

রৌপ্যও প্রচুর দরকার হইতেছিল। অধিকন্তু, যে-কেহ টাঁকশালে রূপা দিয়া মুদ্রা তৈয়ার করাইয়া লইতে পারিত। তাই, ভারতবর্ষের ভিতরে রূপার দর অপেক্ষাকৃত চড়া ছিল। কিন্তু ভারতের বাহিরে রূপার বিনিময়-মূল্য ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছিল বলিয়া ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রজাদের কাছ হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহা রূপার টাকাতেই গণিয়া লওয়া হইত, কিন্তু যখন বিদেশের দেনা-শোধের সময় আসিত তখন এই রূপার টাকার পূরা দর পাওয়া যাইত না, মাত্র রূপার দরই পাওয়া যাইত। ১৮৯৩ খৃঃ নাগাদ এই বাজার দরটা নামিয়া ৩৫ পেন্সে ঠেকিয়া ছিল অর্থাৎ বৈদেশিক ব্যাপারে এক টাকার বদলে ১ শিঃ ২ পেঃ পাওয়া যাইতেছিল। ইহাতে ভারতসরকারের সমূহ বিপদ হইয়াছিল, কেননা এইরূপ বিনিময়ে যেটুকু ক্ষতি হইতেছিল, সেটুকুর জন্য প্রজাদের উপর করের মাত্রা বা বোঝাও বাড়িয়া যাইতেছিল। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বোঝা যাক্। প্রতি বৎসর সরকারকে বহু সহস্র টাকার মাল বিদেশ হইতে বিশেষতঃ বিলাত হইতে কিনিয়া আনিতে হয়; তাহা ছাড়া ভারতসরকারের যে-সব কর্ম্মচারী অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে থাকেন তাঁহাদের পেনসন্, বা বিলাতে কর্জ্জ করা টাকার সুদ, ভারত সচিবের অফিস খরচ প্রভৃতি ভারতসরকারকে পাউণ্ডে পরিশোধ করিতে হয় বা মিটাইয়া দিতে হয়। যদি এখন টাকার বিনিময় হার নামিয়া গিয়া ২ শিলিং হইতে ১ শিলিং হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে, ১ টাকার বদলে ২ শিলিং যখন পাওয়া যাইত, তখন যে-টাকাটা সরকারকে দিতে হইত, টাকার দর যখন ১ শি ৪ পেন্স হইবে তখন নিশ্চয়ই অনেক বেশী টাকা দিতে হইবে। অথচ সরকারের আয় হইতেছে প্রধানতঃ দেশবাসীর প্রদত্ত কর। সুতরাং যদি টাকার মূল্যের

অনবরত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে সরকার পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারেন না যে, কত টাকার প্রয়োজন হইবে, এবং তদনুসারে কর আদায় করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং ঘাট্‌তি ("ডেফিসিট্") টাকার জন্য বার বার নূতন কর বসাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রূপার মূল্য, তথা টাকার বিনিময়মূল্য, পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ভারতবর্ষের আমদানীকারকদিগকে অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছিল; পক্ষান্তরে রপ্তানীকারকের লাভের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। টাকা হাতদর হইয়াছিল বলিয়া, যে-সব ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিতেছিল, তাহাদিগকে টাকার দর্শনী-মূল্য বা মুদ্রা-মূল্য অপেক্ষা বেশী দিতে হইতেছিল, অথচ, যে-সব ব্যবসায়ী মাল এদেশ হইতে বিদেশে চালান দিতেছিল, তাহারা, দেশে রূপার টাকায় মাল উৎপাদন করিয়া, বিদেশে পাউণ্ড হিসাবে মাল বিক্রয় করিয়া, সেই পাউণ্ডকে দেশে টাকায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া, বেশ মোটা লাভ করিতেছিল।

কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলি। ধরা যাক্, কোন রেলওয়ে কণ্ট্র্যাক্টর বিলাত হইতে ষ্টীল রেল ক্রয় করিবার অর্ডার দিয়াছে; বিলাতী কোম্পানী দর চাহিল ৩০০ পাউণ্ড; ধরা যাক্, সে সময়ে ১৫ টাকার বদলে ১ পাউণ্ড পাওয়া যায়, তাহা হইলে এদেশের ব্যবসায়ীকে ঐ ষ্টীল রেল খরিদ করিবার জন্য মোট (১৫ × ৩০০) = ৪৫০০ টাকা দিতে হইবে। আমদানী-রপ্তানী কারবার কেহ সাধারণতঃ নগদ টাকা দিয়া করে না। মাল আসিয়া ডেলিভারি লইবার প্রায় তিন মাস পরে হয়ত এই ৩০০ পাউণ্ড শোধ দিতে হইবে। এখন ধরা যাক্ এই তিন মাসের শেষে ঐ কনট্র্যাক্টর দেখিল যে, এক পাউণ্ড লইতে গেলে ২০ টাকা দিতে হয়; সুতরাং যদি তাহাকে ৩০০ পাউণ্ড খরিদ করিতে হয়, তাহা হইলে (২০ × ৩০০) = ৬০০০ টাকা

দিয়াই খরিদ করিতে হইবে। অতএব হিসাবমত ক্রেতার ভুল-চুক না হওয়া সত্ত্বেও, শুধু টাকার বিনিময়-মূল্যের পরিবর্ত্তনের জন্য, তাহাকে (৬০০০—৪৫০০) টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসাদার যদি লোকসান স্বীকার করিতে না চায়, তবে আমদানী-করা পণ্যের দর কিঞ্চিৎ চড়াইয়া বিক্রয় করিবে। জিনিষ-পত্রের দরের মধ্যে অনিশ্চয়তা আসিলে বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা ব্যবসাদারগণ সহজে এই ঝুঁকি লইতে চাহেন না। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে, রূপার দর, অস্বাভাবিক ভাবে নামিয়া যাইতে থাকায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। ভারত সরকার তাই এই সমস্যা তদন্তের জন্য ১৮৯৩ খৃঃ এক কমিটী কায়েম করিলেন। এই কমিটীর ('হার্শেল কমিটি') রিপোর্ট ১৮৯৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে বলা হয় যে, এক্সচেঞ্জের (বিনিময়) ওঠা-নামা রোধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, চল্‌তি টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা। যে-কেহ টাঁকশালে রূপা জমা দিয়া টাকা করাইয়া আনিতে পারিলে, চল্‌তি টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যাইবে না, কেন না খোলা টাঁকশাল থাকিলে, যে-কোন ব্যক্তি যত-ইচ্ছা টাকা তৈয়ার করাইয়া লইতে পারিবে। সুতরাং জনসাধারণের নিকট টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দিতে বলা হইল। এরূপভাবে টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দিবার ফলে ভারতবর্ষেও রূপার দর নামিতে লাগিল। তখন ভারত সরকার উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। যদি এখন যেমন চলিতেছিল সেই রূপই চলিতে দেওয়া হয় তবে, ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবসাদার, তথা ভারতবাসী, ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; আর যদি টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রূপার মালিক গণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সরকার স্থির করিলেন

যে রূপার মালিকগণের যেটুকু ক্ষতি হইবে, সেটুকু ক্ষতি তাঁহাদের স্বীকার করিবার ক্ষমতা আছে। তাই ১৮৯৩ খৃঃ জনসাধারণের নিকট টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অধিকন্তু, সরকার একটাকায় ১ শিঃ ৪ পেঃ বা ১৫ টাকায় এক পাউণ্ড এই বিনিময় হার বাঁধিয়া দিলেন।

টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দিবার ফলে যে, দুনিয়ার বাজারে রূপার দর আরও নামিয়া যাইবে, ইহা বুঝাই যাইতেছে। আমেরিকা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রূপা, ব্যবহারও হয়, আবার উৎপন্নও হয়; তাই এদেশেও রূপা লইয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ১৮৭৩ খৃঃ পূর্ব্বেই যুক্তরাষ্ট্রে কাগজী-মুদ্রার চলন খুব বাড়িয়া গিয়াছিল এবং অনেক অংশে তাহা রৌপ্য-মুদ্রাকে সরাইয়া টাকাকড়ির কাজ চালাইতেছিল। কিন্তু দুনিয়ার বাজারে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য রূপার চাহিদা দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকায় আমেরিকার রৌপ্য উৎপাদকগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং রূপার চাহিদা বাড়াইয়া দিবার জন্য "ব্ল্যাণ্ড এ্যাক্ট" নামে এক আইন জারি করিলেন। এই অ্যাক্ট অনুসারে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ট্রেসরি (যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ) প্রতি মাসে ২ হইতে ৪ মিলিয়ন্ ডলার মূল্যের রূপা খরিদ করিয়া সেই রূপাকে রৌপ্য ডলারে পরিণত করিবেন; এবং সেই রৌপ্য ডলারগুলিকে চলৎ-সিক্কার ইজ্জৎ দেওয়া হইবে। কিন্তু লোকে রৌপ্য ডলার লইতে চাহে না বলিয়া সেগুলি তৈয়ার করাইয়া সরকারী তহবিলেই রাখা হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে "সিল্ভার সার্টিফিকেট্স্" বা কাগজী-ডলার ছাড়া হইবে; এই কাগজী-ডলার লইয়া যদি কেহ রূপার দাবী করেন, তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হইবে। আজকালও আমেরিকার পূর্ব্বান্তের দেশসমূহে রৌপ্য ডলার কেহ ব্যবহার করে না; পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে যা-কিছু

রূপার ডলারের চলন দেখা যায়। এরূপ করিয়াও কিছু সুবিধা হইল না। তাই ১৮৯০ খৃঃ নতুন একটা আইন জারি করিতে হয়—ইহার নাম "শেরম্যান্ অ্যাক্ট"। ইহাতে প্রতিমাসে সরকারকে ৪ মিলিয়ন আউন্স রূপা খরিদ করিতে বলা হয়। কিন্তু তথাপি কিছু সুবিধা হইল না—রূপার দর দ্রুত গতিতে নামিয়াই যাইতে লাগিল; তখন বাধ্য হইয়া সরকারকে শেরম্যান অ্যাক্ট খারিজ করিতে হইল। ১৯০২ খৃঃ রূপার দর নামিতে নামিতে আউন্স প্রতি ২১ পেন্সে আসিয়া ঠেকিল।

এই ভাবে যে-কয়টী দেশ দ্বিধাতুমান চালাইতে প্রাণপণ করিয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহারাও তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ল্যাটীন্ ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ ও আমেরিকা বাধ্য হইয়া রৌপ্যমান বন্ধ করিয়া দেয়—মনে হইতেছিল যেন সকল দেশই ধীরে ধীরে একবিধ ধাতুমান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমতঃ টাকাকড়ির পরিমাণবাদের কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে সর্ব্ববিধ পণ্যের দর নামিয়া যাইতেছিল। দ্বিতীয়তঃ রূপার দর পড়িয়া যাইতে থাকায় রৌপ্য-উৎপাদক দেশসমূহের মনে, আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল; আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আমেরিকা এ বিপদের হাত এড়াইবার জন্য কি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল; আমেরিকা পুনরায় একবার ইউরোপের দেশ সমূহের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ল্যাটীন ইউনিয়ন দেশগুলির দুর্দ্দশা তখনও দূর হয় নাই বলিয়া তাহারাও আনন্দের সহিত এই দ্বন্দ্বে আমেরিকার সহিত যোগ দিল। অধিকন্তু প্রাচ্যের দেশ সমূহ, যেমন চীন (জাপান ১৮৯৭ খৃঃ স্বর্ণমান গ্রহণ করিয়াছিল), রৌপ্যমান তখনো বজায় রাখিয়াছিল বলিয়া ইউরোপীয় স্বর্ণমান

বিশিষ্ট দেশ সমূহের সহিত লেনদেন ব্যাপারে পূর্ব্বের মতই গোলযোগ চলিতেছিল। এই সবের ফলে অনেকগুলি সভা-সমিতি হয় ও দ্বিধাতুমান সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হয়। ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা সে সময়ে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল; সুতরাং দ্বিধাতুমান প্রচলনে বাধা দিয়াও ছিল যথেষ্ট। এদিকে আবার দুনিয়ায় সোণার যোগান বাড়িতে সুরু করিয়াছিল; দক্ষিণ আফ্রিকায় সোণার খনিতে কাজ চলিতেছিল; আবার ১৮৯৬ খৃঃ আমেরিকায় ক্লন্‌ডাইক্ খনি আবিস্কৃত হইল—সুতরাং দুনিয়ায় সোণার যোগান অপর্য্যাপ্তরূপে বাড়িতে লাগিল। যাঁহারা দ্বিধাতুমান চাহিতেছিলেন তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই ছিল যে রূপার কারেন্সীও না রাখিলে টাকাকড়ির অপ্রাচুর্য্য হেতু পণ্য দ্রব্যের দর নামিয়া যাইবে এবং হইতেছিলও তাই। কিন্তু ১৮৯৬ খৃঃ পর সোণার যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় অল্পে অল্পে পণ্যের দর চড়িতে সুরু করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় লোকের মনে এ প্রশ্ন উঠিতেছিল যে, পণ্যের দর নামিয়া যাওয়ায় লোকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, এরূপ ভাবে দর চড়িতে থাকিলে লোকের আবার সেইরূপ দুর্দ্দশা হইবে কি না। দুনিয়ায়, সোণা এবং রূপার যোগান যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে যদি ঐ উভয়বিধ ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাই চলৎ-সিক্কারূপে চলিতে থাকিত তাহা হইলে পণ্যের দর যে কিরূপ চড়িয়া যাইত তাহা বলা শক্ত! সুতরাং রূপার কারেন্সী বন্ধ হইয়া একরূপ ভালই হইয়াছিল বলিতে হইবে। সোণার যোগানই এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কি করিয়া তাহার কতক অংশ সরাইয়া ফেলা যায় তাহাই একটা মস্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুনিয়ার প্রায় সকল বড় বড় দেশগুলি প্রচুর পরিমাণে সোণা মজুত করিয়া

অনেকটা সুবিধা করিয়াছিল। ভারতবর্ষও এই সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সোণা খরিদ করিয়াছিল। এই ভাবে অতিরিক্ত যোগানের ভয় কিছুকালের জন্য দূর হইল।

দ্বিধাতুমান লইয়া তর্ক-বিতর্কের ফলে, এ কথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, টাকাকড়ির পরিমাণবাদটী সম্পূর্ণ সত্য, কেননা আমরা দেখিলাম যে ১৮৭৩ খৃঃ হইতে ১৮৯৬ খৃঃ পর্য্যন্ত পণ্যাদির দর যে ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছিল তাহার কারণ কারেন্সীর সঙ্কোচ বা টাকাকড়ির অপ্রাচুর্য্য, যেহেতু, সোণার যোগান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পণ্যাদির দর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহা হইতে এই বোঝা গেল যে, পণ্যের দরকে যদি সোণার যোগানের উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অমঙ্গলকর। পড়্তি দর ব্যবসার পক্ষে যেরূপ হানিকর, উঠ্তি দরও তদ্রূপ। এখন সোণার যোগান বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত নয় যে, পরে আর সোণার যোগান অপ্রচুর বলিয়া মনে হইবে না, কেন না সোণার যোগান বাড়িলে পণ্যাদির দর বাড়ে এবং দর বাড়িলে চারিদিকে উৎপাদন বাড়াইবার সাড়া পড়িয়া যায় এবং তখন অধিকতর পরিমাণে সোণা বিনিময়ের কাজ চালানর জন্য দরকার হইয়া পড়ে এবং যদি তখন সোণা না পাওয়া যায় তাহা হইলে দর চড়া রদ্ হইয়া যায়। অধিকন্তু অন্যান্য পণ্যের দর বাড়িলে সোণা উৎপাদনের খরচাও বাড়িয়া যায়, কেন না মজুর, অধিক মজুরী দাবী করে, খনিতে কাজ করিবার জন্য যন্ত্রপাতির দর বেশী দিতে হয় ইত্যাদি। সুতরাং আবার সোণায় টান-ধরা আশ্চর্য্য নহে। এই ১৯৩০ সালেই আমরা কাগজপত্রের মারফৎ সেরূপ গুজব শুনিয়াছি। অতএব দ্বিধাতুমানের পৃষ্ঠপোষকগণ যে বলেন, দুইটী বিভিন্ন ধাতুর

মুদ্রা থাকিলে টাকাকড়িতে টান পড়ার সম্ভাবনা অল্প, সে কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি সোণা ও রূপা দুইটী ধাতুকেই কারেন্সীর ইজ্জৎ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, টাকাকড়ির মূল্য এত উঠা-নামা করিতে পারে না, যেহেতু প্রথমতঃ চল্‌তি টাকাকড়ির মোট পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, যোগান এত অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতে-কমিতে পারিবে না, কেননা যদি কোন কারণে এই দুইটী ধাতুর একটীর উৎপাদন কম-বেশী হয় তবে ঠিক সেই সময়ে ঠিক সেইরূপ ভাবে অপর ধাতুটির উৎপাদন পরিমাণও যে কম-বেশী হইবে তাহা বলা যায় না। যে-ধাতু দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হয়, সেই ধাতুর যোগান বন্ধ হইয়া গেলে যে, কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা বুয়ার যুদ্ধে অনেকটা উপলব্ধি করা গিয়াছে ; সে সময়ে পণ্যের দর বিশেষভাবে নামিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি দুইটী ধাতুমুদ্রা কারেন্সী হিসাবে চলিত, তাহা হইলে একটী ধাতুর যোগান রোধ হইয়া যাওয়ার যে অসুবিধা হইতেছিল, অপর ধাতুর যোগান বাড়াইয়া দিয়া সে সময়কার সেই অসুবিধার হাত বেশ সহজেই এড়ান যাইতে পারিত। কতকগুলি দেশ যেমন সম্পূর্ণরূপে সোণার উপরই নির্ভর করে, তেমনি আবার কতকগুলি দেশ পূরাপূরি রূপার উপরই নির্ভর করে, আবার এমন কতকগুলি দেশ আছে যেখানে সোণা বা রূপা উভয়বিধ ধাতুর যে-কোনটী দিয়াই কাজ পূরাদস্তুর চালান যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সোণা ও রূপা উভয়বিধ ধাতুকেই চলৎ-সিক্কা করা যায় তবে এক দেশের চাহিদা আর এক দেশের চাহিদার সহিত কাটাকাটি ("কাউণ্টার অ্যাক্ট দি আদার") হইয়া যাইতে পারে। যেমন, যদি ইংলণ্ড, কি আমেরিকার সোণার চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে মিশর ও ভারতবর্ষ সেই বেশী পরিমাণ সোণা যোগাইয়া তাহার বদলে

রূপাই ব্যবহার করিতে পারে ; তেমনি আবার যদি চীনদেশে রূপার চাহিদা বেশী দেখা যায় তবে অপর কোন দেশ সোণাটাই বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে। এইরূপে টান-যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া টাকাকড়ির মূল্য উঠা-নামা অনেক অংশে রদ হইয়া যাইবে।

কেবল থিওরি বা তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে এ যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না, কিন্তু, ল্যাটীন ইউনিয়নের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, যদি দুনিয়ার বাজার, সোণা ও রূপা এই দুইটী ধাতুর জন্য খোলা থাকে তবে কোন-একটী দেশের পক্ষে দ্বিধাতু-মান বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সোণার একটা টাঁকশালী দর ("মিণ্ট প্রাইস্") স্থির করিয়া সকল দেশই সেই হারে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া থাকে ; যতদিন না সকল দেশেই রৌপ্যমুদ্রারও তেমনি একটী টাঁক-শালী দর স্থির করিয়া সেইভাবে তৈয়ার করা হয়, ততদিন কোন একটী দেশ বা কয়েকটী সম্মিলিত দেশ রূপার দর স্থির রাখিতে পারিবে না, কেননা, যে-মুহূর্ত্তে রূপার টাঁকশালী দর ও বাজার দরের মধ্যে তারতম্য হইবে, সেই মুহূর্ত্তে গ্রেশাম বিধি অনুসারে কদর-সম্পন্ন (অ্যাপ্রিসিয়েটেড) রূপা সরিয়া পড়িবে। অতএব কোন-একটী দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান চালান সম্ভব নহে। দ্বিধাতুমানবিশিষ্ট দেশকে বাহিরের বাজারে সোণা বা রূপার দর লইয়াই বিশেষ বেগ পাইতে হয়। যখনি সোণা ও রূপার অনুপাতের মধ্যে তারতম্য উপস্থিত হয়, তখনি দ্বিধাতুমান বিশিষ্ট দেশ হইতে উৎকৃষ্ট মুদ্রা সরিয়া পড়িতে থাকে ও হতাদর মুদ্রা খোলা টাঁকশাল পাইয়া দেশ ছাইয়া ফেলে, কেননা, কোন একটা দেশের পক্ষে বা সম্মিলিত কয়েকটী দেশের পক্ষে দুনিয়ার বাজারের সোণা বা রূপার সমস্ত যোগানটা স্বীয় টাঁকশালী দরে খরিদ করিয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব।

তবে কি দ্বিধাতুমান চলিতে একেবারেই পারে না? পারে এবং তাহার একটী উপায় আছে। মনে করা যাউক, যে, একটা আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির ফলে দুনিয়ার সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসাদার দেশসমূহ সোণা ও রূপার একই অনুপাত মানিয়া লইয়াছে এবং উভয়-বিধ ধাতুমুদ্রার জন্যই খোলা টাকশাল রাখিয়াছে। যদি উহা সম্ভব হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট মুদ্রা সরিয়া পড়িয়া নিকৃষ্ট মুদ্রায় দেশ ছাইবার সম্ভাবনা আর থাকিবে না; সোণা এবং রূপার টাঁকশালী দর সকল দেশেই একইরূপ থাকার দরুণ, এক দেশ হইতে মুদ্রা অপর দেশে চালান হইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু এরূপ করিলেই যে সমস্ত বিপদ সম্পূর্ণ দূর হইল তাহা নহে; ঐ সব চুক্তি-বদ্ধ দেশ-গুলিকে সোণা-রূপার স্থিরীকৃত ("ফিক্সড") দর ঠিক রাখিবার জন্য ঐ দুইটী ধাতু অপরিমিত পরিমাণে খরিদ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কেননা সোণা বা রূপার দর "পার্" অপেক্ষা বেশী বা কম হইতে পারে। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য যে সোণা বা রূপা লাগে তাহার উপরই দেশগুলির সোণা-রূপার চাহিদা নির্ভর করে। সুতরাং দেখিতে হইবে যে মুদ্রা-প্রস্তুতের জন্য ঐ ধাতুগুলির যে চাহিদা, তাহা সম্পূর্ণরূপে সোণা-রূপার দর নিয়ন্ত্রিত করে কি না। এই চাহিদাই এতকাল সোণার দর নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; কিন্তু রূপার মোট-উৎপাদনের এতটা-পরিমাণ, মুদ্রা প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করা হয় না যাহাতে, রৌপ্যমুদ্রার চাহিদাই রূপার দর নিয়ন্ত্রিত করিবে (গত মহাযুদ্ধের পর লোকের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে)। বাজারের গতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কোন পণ্যের দর আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া অসম্ভব। তবে যদি কোন পণ্যের টান বা যোগান আইন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে তাহা পরোক্ষভাবে পণ্যটীর

বাজার দরও নিয়ন্ত্রিত করিবে। সোণা-রূপার যোগান, সহস্র দেশের সম্মিলিত শক্তিও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না; পক্ষান্তরে, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সে পন্থা অবলম্বন করিলে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং তাহা হইলে সোণা-রূপার দর অথবা সোণা-রূপার নির্দ্দিষ্ট-অনুপাতটা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। দ্বিধাতুমান লইয়া বাক্‌বিতণ্ডার সময় অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ল্যাটীন ইউনিয়ন ছিল বলিয়াই রূপার দর ওঠা-নামা ততটা ভয়াবহ রূপ ধরে নাই; তেমনি যদি সমস্ত প্রধান প্রধান দেশগুলি মিলিত হইয়া চেষ্টা করেন, তবে সোণা-রূপার ওঠা-নামা বন্ধ করা একরূপ অসম্ভব নহে। কিন্তু দেশগুলি কি সেরূপভাবে মিলিত হইবে? ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ত পর্য্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। মহাযুদ্ধের পর দুনিয়ার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে এরূপ আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হওয়া আশ্চর্য্য নহে।*

* অধ্যাপক সরকারের "ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্" দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়

কাগজী মুদ্রা

ধাতুমুদ্রা বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে টাকাকড়ির কাজ প্রধানতঃ বিনিময়ের বাহন হওয়া; সুতরাং ধাতু ব্যতিরেকে কাগজ দিয়াও যদি বিনিময়ের কাজ চালান যায় তাহা হইলে কাগজ ও মুদ্রার স্থান অধিকার করিতে পারে। কথাটা শুনিলে একটু গোল-মেলে ঠেকে, কেননা ধাতুমুদ্রার মুদ্রা-মূল্য ছাড়াও একটা ধাতুমূল্য আছে, অথচ কাগজের সে গুণটী নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নাই। আমরা যখন. টাকাকড়ি খুঁজি তখন তাহা ছেলের গলার পদক বা স্ত্রীর হাতের বালা করিবার জন্য খুঁজি না, আমরা টাকাকড়ি খুঁজি লোকের ঋণশোধ করিবার জন্য এবং ঐ টাকাকড়ির বিনিময়ে পণ্য খরিদ্ করিবার জন্য। মুদ্রাকে একটা আদেশ-পত্র বিশেষ বলা যাইতে পারে—যেন প্রত্যেক উৎপাদককে বলা হইতেছে যে, এই মুদ্রা-বাহককে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য দিবে; যদি মুদ্রাকে এইরূপ আদেশ-পত্ররূপে দেখা যায়, তবে সেই আদেশ, কাগজের দ্বারাও জ্ঞাপন করা যাইবে না কেন? অবশ্য এবিষয়ে সাধারণের সম্মতি থাকা আবশ্যক। সোণারূপা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। একজন সোণা বা রূপা দিলে, আর একজন তাহা লইতে চায় বলিয়াই সোণারূপা মুদ্রার আসন পাইয়াছে; অর্থাৎ সোণারূপাকে বিনিময়ের বাহন বলিয়া স্বীকার করায় সাধারণের সম্মতি আছে বলিয়াই সোণারূপা মুদ্রা হিসাবে চলিতে পারিয়াছে।

তেমনি সাধারণের সম্মতি থাকিলে কাগজও, মুদ্রা বা বিনিময়ের বাহন রূপে ব্যবহার হইতে পারে। বিনিময়ে কাগজী-মুদ্রা ব্যবহার সম্পূর্ণ বিংশশতাব্দীর আবিষ্কার নহে। নবম খৃষ্টাব্দে চীনদেশে কাগজী মুদ্রার চলন ছিল, তাহার পূর্ব্বে ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। প্রাচীন আসিরিয়া ও বেবিলনে ইহার ব্যবহার ছিল। প্রাচীন ভারতে ইহার চলন ছিল কিনা জোর করিয়া বলা যায় না।

কাজগী মুদ্রা প্রধানতঃ ত্রিবিধ :

(১) **রিপ্রেসেন্‌টেটিভ পেপার মনি (গচ্ছিত অর্থের নিদর্শন পত্র)**—বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘের নিকট মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে রসিদ লইলে, সেই রসিদখানাই হইল রিপ্রেজেন্‌টেটিভ মনি বা প্রতিভূ মুদ্রা। ব্যাঙ্ক অথবা সরকারী কোষ এই কাজ চালাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের তহবিলে কম পক্ষে ২০ ডলার জমা রাখিলে সেই তহবিলের সেক্রেটারী মহাশয় একখানা রসিদ বা সার্টিফিকেট দেন; এই "গোল্ড সার্টিফিকেট" (স্বর্ণ রসিদ) বা "সিলভার সার্টিফিকেট" (রৌপ্য রসিদ) রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বা প্রতিভূ কাগজী-মুদ্রার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজকাল প্রায় বহুদেশেই ব্যাঙ্ককে নোট ছাড়িবার পূর্ব্বে আইন অনুসারে কিছু ধাতুমুদ্রা গচ্ছিত রাখিতে হয়, সুতরাং সেই গচ্ছিত অংশটার অনুরূপ কাগজী-মুদ্রাকে রিপ্রেজেন্‌টেটিভ কাগজীমুদ্রা বলা চলে। ধাতুমুদ্রা নাড়াচাড়া করার অপেক্ষা কাগজীমুদ্রা নাড়াচাড়া করা সহজ ও সুবিধাজনক তাই লোকে ধাতুমুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াও নোট বা সার্টিফিকেট লইয়া থাকে। (২) **ফিডুসিয়ারী পেপার মনি (প্রতিজ্ঞা সম্বলিত কাগজের অর্থ)**—ইহা প্রতিজ্ঞাপত্র ছাড়া কিছুই নহে; সুতরাং লোকের আস্থা ও

খাতকের ওয়াশীল দিবার ক্ষমতার উপর ইহা নির্ভর করে। যদি খাতক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হয় তবে তাহার প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বর্ণনির্ম্মিত ধাতুমুদ্রার মত ব্যাপকভাবে চলার বাধা কি থাকিতে পারে? গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রের উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, জার্ম্মাণরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে কাগজীমুদ্রা চালাইতে পারিয়াছিলেন। আবার ব্যাঙ্কনোটকে যে পরিমাণে রিপ্রেসেন্‌টেটিভ বলা চলে না, সেই পরিমাণে তাহা ফিডুসিয়ারী। (৩) **কন্‌ভেন্‌শানাল পেপার মনি (অপরিশোধনীয় কাগজের অর্থ)**—ইহাতেও দাবী মিটাইবার প্রতিজ্ঞা থাকিলেও সরকার জানেন যে তিনি সে প্রতিজ্ঞা রাখিবেন না। সাধারণতঃ যখন সরকারের টাকাকড়ির টানাটানি উপস্থিত হয়, তখনি সরকার এইরূপ কাগজীমুদ্রা ছাড়েন। কন্‌ভেন্‌শানাল কাগজী মুদ্রাও যে ধাতুমুদ্রার বদলে চলিতে পারে ইহা সহজে ধারণায় আনা যায় না। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহুদেশেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। রুশিয়াতে ও দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রে এই রীতি বহুদিন চলিয়াছে। চলিবেই না বা কেন? দেশের আইনের হুকুমে ও দশের সম্মতিক্রমে ইহার দ্বারা যদি প্রয়োজনীয় পণ্যের বিনিময় সাধিত হয়, ঋণশোধ দেওয়া যায় এবং খাজনাও দিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা ধাতুমুদ্রার মত চলিবে না কেন?

কিন্তু ধাতুমুদ্রার সহিত কাগজী মুদ্রার কিছু তফাৎ আছে। (১) **সরকারের ইচ্ছার উপর কাগজীমুদ্রার সৃষ্টি ও ধ্বংস নির্ভর করে** বলিয়া ইহা কতকটা বিপদজনক। হঠাৎ যদি সরকার বলিয়া বসেন যে, ইহা আর চলিবে না, তাহা হইলে তাহা কাগজের সামান্য টুকরার সামিল হইবে। অবশ্য সাধারণতঃ কোন

গভর্ণমেণ্ট এরূপ প্রবঞ্চনা করিবেন না, কেননা তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর কেহ সরকারের শপথে বিশ্বাস করিবে না; সরকারের ক্রেডিট নষ্ট হইবে। তথাপি বিপ্লবাদির পর যখন নববিধি চলিয়াছে, তখন কোন কোন দেশে সরকারকে এরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা সামান্য কলমের আঁচড়ে মহামূল্যবান কাগজীমুদ্রা টুক্‌রা-কাগজের সমান হইতে পারে, কিন্তু ধাতুমুদ্রার সে ভয় নাই, কেন না ধাতুমূল্য তাহার যাইবার নহে, যদিও মুদ্রামূল্য না থাকিতে পারে। (২) **অধিকন্তু কাগজী-মুদ্রার চলনও সীমাবদ্ধ,** কেননা কাগজীমুদ্রার প্রচলন আইনের উপর নির্ভর করে; সুতরাং যে-দেশে কাগজীমুদ্রাসম্বন্ধীয় ঐ বিশেষ-আইনটী প্রচলিত আছে, সেই-দেশেই ঐপ্রকার মুদ্রা চলিবে অর্থাৎ যে-সরকার কাগজীমুদ্রা চালান সেই-সরকারের এলাকার মধ্যেই উহার প্রচলন সীমাবদ্ধ থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে 'চেম্বার অফ্ কমার্স' বা বাণিজ্য সমিতিকে কাগজী-মুদ্রা চালানর অধিকার দেওয়া হইয়াছিল; দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে লিয়ঁ সহরে যে ফ্রাঁ-নোট পাওয়া যাইত তাহা প্যারি নগরে ভাঙ্গান যাইত না।

(৩) **ধাতু মুদ্রা অপেক্ষা কাগজীমুদ্রার মূল্য অধিক পরিবর্ত্তনশীল।** কেননা মুদ্রার মূল্য, প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং কাগজীমুদ্রার পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যখন দেশে অর্থের টানাটানি উপস্থিত হয়, তখন কাগজীমুদ্রার পরিমাণ বাড়ান সহজেই চলে; কোন সরকার যদি একবার কাগজীমুদ্রা ছাড়িতে আরম্ভ করেন, তখন সে সরকারের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা দায় হইয়া উঠে; কিন্তু, উপযুক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজীমুদ্রা ছাড়া কত বিপদ্‌জনক তাহা নিম্নে বুঝাইয়া দিব। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী অত্যধিক

পরিমাণে নোট চালাইতে থাকে ; ফলে জার্ম্মাণ নোটের মূল্য ভয়াবহরূপে পড়িয়া যায়।

উপরের কথাগুলি হইতে বোঝা যায় যে, সকল দেশেই ধাতুমুদ্রার সহিত কাগজীমুদ্রাও চলিয়া থাকে ; কিন্তু কেন সেগুলি চলে তাহা ঠিক বোঝা গেল না। ইহার ব্যাখ্যা অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, বহুমূল্য ধাতুগুলির যতটা অংশ মুদ্রা তৈয়ারী করিতে ব্যবহার হয় ততটা পরিমাণ একহিসাবে অনুৎপাদক ; কেননা মুদ্রাগুলি কেবলমাত্র হাতফের করে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে লাগে না। তেমনি দেশের রাস্তাগুলি কর্ষণের কাজে লাগে না বলিয়া সেগুলিও অনুৎপাদক। যদি এখন লোকে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাস্তাগুলি ব্যবহার করা ছাড়িয়া দেয় (যেমন আকাশযানের সৃষ্টি করিয়া) তবে ঐ রাস্তাগুলিকে যেমন চাষের কাজে লাগান সম্ভব হয় এবং তাহাতে দেশের ঐশ্বর্য্যও বাড়িয়া যায়, তেমনি যদি লোকে মুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে (যথা কাগজীমুদ্রা), তবে, যতটা পরিমাণ ধাতু অনুৎপাদকভাবে আটকাইয়া আছে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য ভাবে কাজে লাগান সম্ভব হইবে। তাহা হইলে মুদ্রাগুলিকে পকেটে পুরিয়া না রাখিয়া, সেগুলি অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে, ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। অথচ দেশের মুদ্রার কাজ বেশ স্বচ্ছন্দেই কাগজীমুদ্রা দিয়া চালান যাইবে। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় কাগজীমুদ্রা কিরূপে দেশের ধন বাড়াইয়া দিতে পারে ; গতযুদ্ধের সময় এ কথার সত্যতা বিশেষভাবে বোঝা গিয়াছে। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বিশেষভাবে ছিল ; যুদ্ধের সময় সরকারকে আমেরিকায় যুদ্ধ-সামগ্রী খরিদ করার দরুণ সোণা রপ্তানী করিতে হয় ; চ্যান্‌শেলার অফ্‌ এক্সচেকর তখন এক ইস্তাহারে প্রজাদিগকে সোণার

পরিবর্ত্তে কাগজ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন—লোকেও দেশপ্রীতি বশতঃ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজীমুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ফলে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়াছিল। লোকে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজীমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া যে, কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা নহে—তখনও তাহাদের পকেটে ঠিক্ ঐ পরিমাণেরই টাকাকড়ি ছিল; একবার কাগজীমুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া তাহারা বুঝিল যে, স্বর্ণমুদ্রারই মত কাগজীমুদ্রাও কাজ চালাইতে পারে। সুতরাং কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্থ না করিয়াও দেশ সোণা রপ্তানী করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কতটা পরিমাণ কাগজীমুদ্রা কোনরূপ বিপদাশঙ্কা না করিয়া কোন দেশের সরকার চালাইতে পারেন?—ঠিক্ যতটা পরিমাণ চল্‌তি ধাতুমুদ্রা সরাইয়া দেয়। এখানে দুটী কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ স্বর্ণমুদ্রা কোন দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া ফেলা চলে না, কেননা বিদেশে যখন টাকাকড়ি চালান দিতে হইবে বা বিদেশে কার্য্যোপলক্ষে মুদ্রা পকেটে করিয়া যাইতে হইবে তখন সোণা ব্যতিরেকে কাজ চলিবে না। তাছাড়া এরূপ অনেকের স্বভাব যে সোণা হাতে পাইলে আর অন্য কিছু গ্রহণ করিতে চাহে না—লোকের এই অভ্যাসের জন্যও কিঞ্চিৎ স্বর্ণমুদ্রা থাকিয়াই যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে-সময়ে কাগজীমুদ্রা ছাড়া হইতেছে, সে-সময়ে যে-পরিমাণ ধাতুমুদ্রা চল্‌তি আছে তাহা যে, দেশের টাকাকড়ির কাজ চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট তাহা নাও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যতটা পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা বাজার হইতে সরাইয়া ফেলা হইল, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজীমুদ্রা ছাড়া, দেশের বাণিজ্যের পক্ষে মঙ্গলকরই হইবে। প্রকৃত পক্ষে পরিমাণটা দেশের টাকাকড়ির টানের উপরই নির্ভর

করিবে। আবার দেশে টাকাকড়ির বাজারে দুর্য্যোগ বা সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ক্রেডিট বা বাজার-সম্ভ্রম ব্যাহত হয় বলিয়া, কাগজীমুদ্রার সাহায্যে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়ান সুফলদায়কই হয়।

কাগজীমুদ্রার প্রচলনে জনসাধারণের কি কি সুবিধা হয় আমরা বুঝিলাম। এখন সরকারের লাভের দিকটার প্রতি একটু দৃষ্টি দেওয়া যাউক। সরকার যদি অপরিণামদর্শী হন, তবে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার সাহায্যে সেই-সরকার অতি সহজেই প্রজাবর্গের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন এবং তাহার জন্য কোন খরচাও করিতে হয় না। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়ায় যে, সরকার সুদ না দিয়াও পুঁজী আদায় করিতে পারেন এবং পুঁজী ফেরৎ দিবার ইচ্ছাও না রাখিতে পারেন। তাই বলা হয় যে, অপরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রা বা "ইন্‌কন্‌ভার্টিব্‌ল্‌ পেপার মনি" ছাড়ার অর্থ, সরকারের পক্ষে বলপূর্ব্বক ঋণ গ্রহণ করা; এ কথার সত্যতা মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণরা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল—জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্য খরিদ করিবার সময় কেবল মাত্র কাগজীমুদ্রা দিয়াই মূল্য শোধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঘাড়ের বোঝা নামানর এত সহজ উপায় আছে বলিয়াই অর্থাৎ ঋণ-পরিশোধ এত সহজেই করা যায় বলিয়া এই উপায়টীর অপব্যবহার হওয়াও সহজ। অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলেই কাগজীমুদ্রার গলদ্‌ বাহির হইয়া পড়ে। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফল 'সু' হইবে কি 'কু' হইবে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে পরিমাণের উপর। যতক্ষণ বাজারের টাকাকড়ির টানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাগজ ছাড়া হয় ততক্ষণ কোন গোল নাই, এই সীমা লঙ্ঘন করিলেই বিপদ্‌। এ কথাটী বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে। অনেকের ধারণা

এই যে, যে-সরকার নোট বাহির করেন, তাহার উপর লোকের আস্থা থাকিলেই হইল—লোকের যদি আস্থা থাকে তবে সরকার যত ইচ্ছা নোট ছাড়িতে পারেন। জার্ম্মাণদের মনেও এইরূপই একটা ভুল ধারণা ছিল বলিয়াই তাহারা নির্ব্বিবাদে সরকারকে গত মহাযুদ্ধের সময় অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে নোট ছাড়িতে উৎসাহিত করিয়াছিল—তাহারা ভাবিয়াছিল যে, যুদ্ধে জয় লাভ করিলেই, ক্ষতি পূরণস্বরূপ যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা দিয়াই সরকার প্রজাবর্গের ঋণ-পরিশোধ করিবেন। ফল যা হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ পরিমাণের উপরই কাগজীমুদ্রার মূল্য নির্ভর করে। যদি পরিমাণটা অধিক না হয়, তবে সরকারের ক্রেডিট ভাল না থাকিলেও, সেগুলি চলিবে। পক্ষান্তরে পরিমাণটা অধিক হইলে কাগজীমুদ্রা ক্রমশঃ হতাদর হইবে। ফরাসী বিপ্লবের সময় "আস্‌সিনা"র এই দশাই হইয়াছিল। জমিজমার মত প্রশস্ত সিকিউরিটী আর কিছুই নাই; ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ফরাসী দেশের জমি প্রতিভূ রাখিয়া কাগজীমুদ্রা ছাড়িয়াছিলেন—এক কথায় আস্‌সিনাগুলি জমিবন্ধকীয় স্বত্ব স্বরূপই ছিল। কিন্তু এই কাগজীমুদ্রা সরকার অত্যধিক পরিমাণে ছাড়িয়াছিলেন; তাই, সেগুলির দর অস্বাভাবিকরূপে পড়িয়া যায়—অবশেষে ১০০-ফ্রাঁ অর্থাৎ ৪ পাউণ্ড মূল্যের একটা আস্‌সিনা, তিন-পেন্স অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিকাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে যদি কাগজীমুদ্রা আবশ্যকের মাত্রা অতিক্রম করিয়া ছাড়া হয়, তবে সরকারের উপর লোকের যতই আস্থা থাকুক না কেন, বা, যে কোন সিকিউরিটী মজুত রাখিয়া কাগজ ছাড়া হউক না কেন, তাহা হতাদর হইবেই হইবে। যদি কাগজীমুদ্রাগুলিকে পরিশোধনীয় বা কন্‌ভার্টিবলের পর্য্যায়ে রাখা যায় তবেই মাত্র, মূল্য ঠিক রাখা সম্ভব, কেননা তাহা হইলে অত্যধিক ছাড়ার লোভ আপনিই সংযত হইবে,

যেহেতু, বাজারে হতাদরের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার আভাস দেখা দিলেই ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত কাগজীমুদ্রা সরকারী তহবিলে জমা রাখিয়া সোণায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবে এবং এইরূপে অতিরিক্ত অংশটা বাজার হইতে সরিয়া পড়িবে। যদি লোকের নোট ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়া যায় তবে, সাধারণতঃ তাহারা কাগজের বদলে স্বর্ণমুদ্রা দাবী করিয়া বসিবে না, যদিও সরকার সর্ব্ব সময়েই তাহা দিতে প্রস্তুত থাকেন। ব্রিটীশ ট্রেজারী নোটগুলি পরিশোধনীয় বা কন্‌ভার্টিবল বলিয়াই, সেগুলির কোন হতাদর দেখা যায় না ; এবং জার্ম্মাণ নোটগুলি ইন্‌কন্‌ভার্টিবল্ বা অপরিশোধনীয় ছিল বলিয়াই, যুদ্ধের সময়েই, সেগুলি অধঃপতিত বা হতাদর হইয়াছিল।

আশার কথা এই যে, পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া বোঝা যায় যে, নোট বা কাগজীমুদ্রা অতিরিক্ত মাত্রায় ছাড়া হইয়াছে কিনা। সুতরাং এই লক্ষণগুলি দেখিয়া সাবধান হইলে কোন ভয়ের কারণ নাই। লক্ষণগুলি এই—

(১) সোণায় ধরাট বা প্রিমিয়ম্ দেখা যাইবে— দেখা যাইবে যে, লোকে সোণা হাতছাড়া করিতে চাহিতেছে না এবং যাহাদের সোণা আবশ্যক (যেমন বিদেশে চালান দিবার জন্য ব্যাঙ্কের সোণা প্রয়োজন) তাহারা সোণা সঞ্চয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ব্যাঙ্ক, প্রিমিয়ম বা ধরাট দিয়া সোণা খরিদ্ করে। যে-সব বণিককে বিদেশে টাকাকড়ি পাঠাইতে হয়, তাহারাই ইহা প্রথম লক্ষ্য করে। যতক্ষণ সোণা ও কাগজের মূল্য এক থাকে, ততক্ষণ কোন গোলমাল নাই, কিন্তু যেমনি লোক কাগজ লইতে নারাজ হয় ও সোণাই অধিক পছন্দ করিতে থাকে, তখনি দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক সোণার জন্য একটা প্রিমিয়ম আদায় করিতে সুরু করিয়াছে।

(২) কিন্তু সাধারণ লোকে সোণার ধরাট হওয়ার ফল বুঝিতে পারে না, যেহেতু সোণার অভাব তাহারা অনুভব করে না—কাগজী মুদ্রা দিয়া তাহাদের কাজ কর্ম্ম বেশ চলিয়া যায়। কিন্তু যে-সব বণিকের বর্হিবাণিজ্যের সহিত যোগ আছে তাহারা সোণার উপর ধরাট হওয়ার ফল রেট্ অফ্ এক্সচেঞ্জ বা বিনিময়-হার বৃদ্ধির মধ্য দিয়া ভোগ করে। বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে পরে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা যাইবে। তবে এইখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, যে-সব বণিক্ বিদেশ হইতে মাল আমদানী করে, তাহারা পাওনা সাধারণতঃ সোণা পাঠাইয়া শোধ করে না—তাহারা এদেশে এরূপ সব বিনিময়-পত্রী বা ফরেন্ বিল্ খরিদ করে, যেগুলির টাকা খাতকের দেশেই দেয় এবং এইরূপ বিল্ খরিদ্ করিয়া স্বীয় মহাজনকে বা রপ্তানীকারককে পাঠাইয়া দেয়। সাধারণতঃ এই বিলগুলির টাকা সোণা দিয়াই মিটানো হয়—সুতরাং এই সব বৈদেশিক বিল্‌গুলিকে স্বর্ণমুদ্রার আদর দিলে বিশেষ অন্যায় করা হয় না। তাই বণিক্ যখন সোণার বদলে এইরূপ বিল্ মহাজনকে পাঠায় মহাজন দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্রহণ করে, যেহেতু সে জানে যে, ঐ বিল্ যখন দেয় হইয়া পাকিয়া উঠিবে, তখন সে, ঐ মূল্যের স্বর্ণমুদ্রাই পাইবে। অতএব যদি কোন দেশে কাগজী মুদ্রা হতাদর হইয়া স্বর্ণ অপেক্ষা কম মূল্যবান হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই দেশের বণিক্, যখন কাগজীমুদ্রা দিয়া বৈদেশিক বিল খরিদ করিতে চাহিবে, তখন বিলবিক্রেতা, বিলের দর্শনী-মূল্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যই চাহিয়া বসিবে, ঠিক যেরূপভাবে সে যদি, সোণা বিক্রয় করিত তবে, তাহার বদলেও কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যের কাগজীমুদ্রা দাবী করিয়া বসিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **যে-দেশে কাগজীমুদ্রা হতাদর হয়, বৈদেশিক**

বিনিময়হার বা 'ফরেন রেট অফ এক্সচেঞ্জ' ঠিক তাহার প্রতিকূল ভাবে বাড়ে। যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর কাগজীমুদ্রা অধঃপতিত হইয়াছিল বলিয়া বৈদেশিক বিনিময় হার জার্ম্মাণীর প্রতিকূলেই বাড়িয়াছিল।

(৩) **তৃতীয় লক্ষণ** এই যে কাগজীমুদ্রা হতাদর হইলে সোণা সরিয়া পড়ে ও কাগজীমুদ্রায় বাজার ছাইয়া যায়। ইহা গ্রেশাম বিধির অনুসরণ। সোণা লোকে বাক্স বন্দী করে, আর নয় বিদেশে ঋণ-পরিশোধ করিবার জন্য পাঠায়; সুতরাং বাজারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৪) **অধিকন্তু পণ্যের দর বাড়িতে থাকে।** বিক্রেতাগণকে পণ্য আমদানি করার জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়, কেননা সোণা দিয়াই তাহাদের মূল্য পরিশোধ করিতে হয়; সুতরাং নিজেদের লোকসান বাঁচানর জন্য তাহারা পণ্যের দর চড়াইয়া দেয়। কিন্তু পণ্যের মূল্য চড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি বাজারে সোণা থাকে, তাহা হইলে বাজারে দুই রকম দর দেখা দিবে। পণ্যের দর চড়িলেও দেখা যাইবে যে, যদি, পণ্য খরিদ করিয়া স্বর্ণমুদ্রায় মূল্য শোধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, বিক্রেতা পণ্যের দর কিঞ্চিৎ কম করিয়াই বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে, অথচ কাগজীমুদ্রা দিতে গেলে, পূরা দরই আদায় করিতেছে। তবে এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, পণ্যের দর চড়িলেই মনে করা উচিত নয় যে, কাগজীমুদ্রা অত্যধিক পরিমাণে ছাড়া হইয়াছে। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে পণ্যের দর চড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে-জন্য সোণার তুলনায় কাগজীমুদ্রাকে অধঃপতিত হইতে দেখা যায় নাই।

কাগজীমুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত করিবার মাত্র একটী উপায়

আছে। কাগজীমুদ্রা অত্যধিক পরিমাণে ছাড়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেই, সরকারের নতুন কাগজ ছাড়া বন্ধ করা ও বাড়তি অংশটা হস্তগত করিবার চেষ্ট করা কর্ত্তব্য। বাড়্তি অংশটা হস্তগত করিতে হইলে খাজানা, রাজস্ব প্রভৃতি বাবদ যে-টাকাটা প্রজাদিগের নিকট হইতে পাওয়া যায় তাহা, কাগজীমুদ্রায়ই লওয়া উচিত এবং সরকারকে অপরের পাওনা মিটাইবার জন্য যে-টাকা দিতে হয় তাহা, স্বর্ণমুদ্রা দিয়াই শোধ করা উচিত। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, সরকারের পক্ষে এরূপ করা সহজ হয় না, কেননা যখন স্বর্ণমুদ্রায় টানাটানি ধরে তখনই সরকারকে কাগজী মুদ্রা ছাড়িতে বাধ্য হইতে হয়; সুতরাং এরূপক্ষেত্রে সোণা দিয়া পাওনা মিটানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। তথাপি কাগজীমুদ্রার পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে, মাত্র এই উপায়েই তাহা নিয়মিত করা সম্ভব।

"লড়াইয়ের পরবর্ত্তীকালে দুনিয়ার সকল দেশেই মুদ্রা সংস্কারের সমস্যা দেখা দিয়াছে। কাগজের টাকা কমানো আর টাকার পরিমাণ কমানো এই হইয়াছে সংস্কার ব্যবস্থার প্রধান মূর্ত্তি।.....ইতালীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সম্পদ, রেল, জাহাজ, মজুর-জীবন বাজারদর ইত্যাদি সবই মুসোলিনির আমলে দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়াছে। কাগজের টাকার (নোটের) পরিমাণ কমানো—এই হইতেছে মুসোলিনির নবীনতম কীর্ত্তি।..... ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসে ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্ট নিউইয়র্কের মর্গ্যান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৯ কোটী ডলার (প্রায় ১৮ ক্রোর টাকা) কর্জ্জ লইয়াছিল। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই টাকার সমস্তটাই গভর্ণমেণ্ট "বাঙ্কা দিতালিয়া" নামক সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই

সোণার টাকা পাইবা মাত্র "বাঙ্কা দিতালিয়া" ২,৫০০,০০০,০০০ লিয়ারের কাগজী মুদ্রা বাজার হইতে তুলিয়া লইয়াছে। ..... ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের নানা খরচের জন্য বাঙ্কা দিতালিয়া ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত ৬,৭২৯,৫০০,০০০ (৬৭২ কোটি ৯৫ লাখ, কাগজের লিয়ার ছাপিয়া বাজারে চালাইয়াছিল। ইহার ভিতর হইতে ২৫০ কোটি কাগজের লিয়ার তুলিয়া লওয়া হইল।..... আমেরিকার নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্ট সরকারী নোট প্রতিষ্ঠানের কোমর খুব শক্ত করিয়া দিয়াছে। .....গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্ট নিজেই নানা সময়ে অনেক নোট ছাড়িয়াছে। ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ ছিল ২,১০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ার। বিগত অক্টোবর মাসে গভর্ণমেণ্ট এইগুলা সবই তুলিয়া লইয়াছে, ২৫ লিয়ারওয়ালা নোটগুলা নাকচ করিয়াছে। এই পরিমাণ কাগজের লিয়ারের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় নাই। গুণতিতে মুদ্রার সংখ্যা কমানো হইল। ডিফ্লেশ্যন বা মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা কর্ম্মপ্রণালী। অবশিষ্ট ১,৭০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ার ও বাজার হইতে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তে অন্যান্য মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইয়াছে।..... ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাস হইতে এই পরিমাণ কাগজের টাকার পরিবর্ত্তে ইতালিতে রূপার মুদ্রা চলিতেছে ৫ এবং ১০ লিয়রের মাপে।"*

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতেছি যে একটু সাবধানতার সহিত চলিলে প্রত্যেক দেশের পক্ষেই বিশেষতঃ আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে—কাগজী মুদ্রা মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু ইহার বিপদও সামান্য নহে। বর্ত্তমানে টাকাকড়ির সমস্যা আর একটা নতুন প্রণালীর সাহায্যে সমাধান করিবার চেষ্টা চলিয়াছে ;—ইহাকে ক্রেডিট ব্যবস্থা কহে। †

---

* বিনয় সরকারের "একালের ধনদৌলত ও অর্থ-শাস্ত্র" প্রথম ভাগ (১৯৩০) পৃঃ ১৮১-৮৫।

† নরেন্দ্রনাথ রায়ের "টাকার কথা" দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

ক্রেডিট বা পসার ও ব্যাঙ্কের কাজ

ক্রেডিট শব্দটী ব্যবসায়ী মহলে এত অধিক ব্যবহৃত হয় যে উহার কোন বাংলা প্রতিশব্দ না দিলেও সকল ব্যবসায়ীই বুঝে এবং শব্দটী এত ব্যাপক যে উহার ঠিক বাংলা পরিভাষা পাওয়া যায় না। কোন কোন লেখক ক্রেডিট্ বুঝাইতে "পসার" বা "বাজার সম্ভ্রম" ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু একটীমাত্র ক্রেডিট শব্দের মধ্যে যে বিপুল ভাবরাশি আছে তাহা কোন প্রতিশব্দেই নাই বলিয়া আমরা ক্রেডিট্ শব্দটীকে বাংলা ভাষায় আমদানী করিবার পক্ষপাতী এবং তাই ব্যবহারও করিয়াছি। সহজ ভাষায় ক্রেডিট্ শব্দের অর্থ বিশ্বাস বা আস্থা এবং "ক্রেডিট্ ব্যবস্থা" বলিতে গোড়ায় এই বুঝাইত যে বিক্রেতাগণ পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে নগদ মূল্য আদায় করিয়া না লইয়া ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য সময় দিত অর্থাৎ এই ব্যবস্থাকে "ভবিষ্যৎ পরিশোধে"র ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। খুচরা বিক্রেতাগণ ক্রেডিট্ শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজকাল ক্রেডিট্ শব্দ ইহা অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বহুক্ষেত্রে খাতক টাকা উশুল দিবার সময় আসিবার পূর্ব্বেই মহাজনের মহাজন হইয়া পড়ে; এরূপ ক্ষেত্রে খাতায় খাতায় দেনা-পাওনা মিটানো হইয়া থাকে। ধরা যাক, যতীন পল্লীগ্রাম হইতে তরিতরকারী আনিয়া কলিকাতায় শশিভূষণকে বিক্রয় করে ও শশীভূষণের নিকট হইতে তৈলাদি দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

উভয়ের কেহই নগদ টাকায় দাম মিটাইয়া দেয় না—নিজের নিজের খাতায় অপরের নামে জমা খরচ করিয়া লয়। বৎসর শেষে, হালখাতার সময়ে উভয়েই হিসাব রুজু করিয়া দেনা-পাওনা কাটাইয়া দেয়। যদি উভয়েরই দেনা-পাওনা সমান হয়, তবে নগদ টাকা কাহাকেও দিতে হয় না; আর যদি কাটাকাটি করিয়াও ফাজিল থাকে তবে, সেই ফাজিল টাকাটা, নগদ টাকায় শোধ দিতে হয়। ক্রেডিট্ ভাল থাকিলে এই ফাজিল টাকাটাও নগদ না মিটাইয়া পরবর্ত্তী বর্ষে জের টানিয়া কারবার চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নগদ টাকায় লেনদেন না করিয়াও শুদ্ধমাত্র খাতায় খাতায় দেনা পাওনা মিটাইয়া ক্রেডিটের জোরে কারবার চলিতে পারে। এই ভাবেই বাণিজ্য জগতে চেক, হুণ্ডী, ব্যাঙ্ক-নোট প্রভৃতির সাহায্যে, নগদ টাকা লেনদেন না করিয়াও কারবার চলিতেছে। আসলে বাণিজ্য জগতের মূল কথা হইল বিশ্বাস—সকলেই সকলকে বিশ্বাস করে। এবং এই ক্রেডিট্ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হইতেছে ব্যাঙ্ক। সুতরাং ব্যাঙ্ক কি ভাবে ক্রেডিট্ প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে কার্য্যকরী হইবার সহায়তা করে তাহা জানা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ একখানা চেকবহি দিয়া থাকে। এই চেকে টাকার পরিমাণ লিখিয়া সই করিয়া দিলে, ব্যাঙ্ক, দাবী করিলেই সেই পরিমাণ টাকা দিয়া থাকে। ব্যাঙ্কে যে টাকা আমানৎ রাখিয়া চেক্ কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া যায় তাহাকে **"ব্যাঙ্ক আমানত"** বা **"ঘূর্ণমান ক্রেডিট্"** কহে। চেক্‌গুলি হইল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার ক্ষমতার সার্টিফিকেট। এই ঘূর্ণমান ক্রেডিটের কথা বুঝিবার জন্য একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। ধরা যাক্, শুধু টাকা আমানৎ রাখিবার জন্য একটী ব্যাঙ্ক কায়েম করা

হইয়াছে ; এই ব্যাঙ্কে কয়েকটী লোক মিলিয়া মোট ১০,০০০৲ টাকা জমা রাখিল এবং তাহাদিগকে আমানতি টাকার বদলে ব্যাঙ্ক রসিদ দিল। এখন এই ব্যাঙ্ক যদি হিসাব দাখিল করে তাহা হইলে দেখা যাইবে ১০,০০০৲ টাকা তহবিলে আছে এবং ১০,০০০৲ টাকা আমানৎকারীদিগকে দেয় আছে। অর্থাৎ—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ টাকা	১০,০০০৲	আমানৎকারীদিগকে দেয়	১০,০০০৲

"দেয়"র দিকটা কয়েকজন ব্যক্তিকে দেয় বুঝাইতেছে। সুতরাং যদি ধরা যায় 'ক'-কে ১,০০০৲ 'খ'-কে ১,০০০৲ অন্যান্য সকলকে ৮,০০০৲ দেয় হয় তবে হিসাব দাঁড়াইবে নিম্নলিখিতরূপ—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ্	১০,০০০৲	'ক'-কে দেয়	১,০০০৲
		'খ'-কে দেয়	১,০০০৲
		অন্যান্য সকলকে দেয়	৮,০০০৲
	০৲		১০,০০০৲

এখন ধরা যাক্ "ক", "খ"-কে ১০০৲ দিতে চাহে। "ক" তাহা হইলে "খ"-কে সঙ্গে করিয়া ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া চেক্ ভাঙ্গাইয়া নগদ্ টাকা করিয়া ১০০৲ টাকা 'খ'-কে দিবে এবং "খ"-ও আবার সেই টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে তখনি জমা দিয়া দিবে ও রসিদ্ লইয়া বাড়ী ফিরিবে। 'ক' আর এক পন্থাও গ্রহণ করিতে পারে। দুজনেই ব্যাঙ্কে না গিয়া 'ক', 'খ'-কে ১০০৲ টাকার একটা চেক্ লিখিয়া দিতে পারে ; উভয়ের ফল একই—উভয় ক্ষেত্রেই 'ক'-র আমানতি টাকা

১,০০০৲ হইতে ৯০০৲ হইয়া দাঁড়াইবে ও 'খ'-র আমানতি টাকা ১,০০০৲ বদলে ১,১০০৲ হইবে। হিসাবটা এই হইবে :—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ	১০,০০০৲	'ক'-কে দেয়	৯০০৲
		'খ'-কে দেয়	১,১০০৲
		অন্যান্য দেয়	৮,০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

অতএব, এই পন্থা অবলম্বন করিলে ব্যাঙ্কের আমানৎকারীদিগের মধ্যে নগদ্ টাকার বদলে চেক্‌ই হাতফের করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে "টাকা উঠাইবার ক্ষমতা" হাতফের করে বা "ঘুরিয়া বেড়ায়" (সার্কুলেট্)। চেক্ হইল এই ক্ষমতার নিদর্শন।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্কের চেক্ ভারতে এখন সুপ্রচলিত নয়। "ইংরেজ-সমাজে সপ্তাহে গড়পড়তা ১০৫০ ক্রোর টাকার চেক্ দরকার হয়। দিনে তাহা হইলে ইংরেজ নরনারী, বেপারী-ই হউক বা সাধারণ গৃহস্থই হউক ১৫০ কোটী টাকার চেক ব্যবহার করে।"*

যাহ'ক, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কোন লাভ নাই, বরং লোকসানই ষোল-আনা, কেননা লোকের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যে ব্যয় করিতে হয় (এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচা, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি) তাহা পায় না। কিন্তু যদি এই ব্যাঙ্ক তহবিলের টাকার কিয়দংশ ঋণ দেয়

* বিনয় সরকারের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রথম ভাগ পৃঃ ১৫৭।

তবে, সুদের বাবদ্ একটা আয় করিতে পারে। ইহাতে আমানৎকারী-দের খুঁৎ খুঁৎ করিবার কিছুই নাই, কেননা তাহারা যে টাকাগুলি জমা দিয়াছে ঠিক্ সেই টাকাগুলিই চাহে না—তাহারা চাহে যে, যখন ইচ্ছা করিবে ঐ পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লইবে। সুতরাং টাকা অনুৎপাদক ভাবে ফেলিয়া না রাখিয়া কিঞ্চিৎ ঋণ দিয়া আয়ের চেষ্টা করাই ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত।

অতএব ধরা যাক্ যে ব্যাঙ্ক তহবিলের টাকার অর্দ্ধেক পরিমাণ কর্জ্জ দিবার মৎলব করিয়াছে। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে হ্যাণ্ড-নোট লিখাইয়া লইয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, ঋণ হইতেছে—হ্যাণ্ডনোটের সহিত টাকার বিনিময়। ধরা যাক্ যে ঋণ-গ্রহীতা, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ্ ৫,০০০৲ টাকা লইয়াছে; তাহা হইলে হিসাব দাঁড়াইবে :—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ	৫,০০০৲	'ক'-কে দেয়	৯০০৲
হ্যাণ্ডনোট	৫,০০০৲	'খ'-কে দেয়	১,১০০৲
		অন্যান্য দেয়	৮,০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে তহবিলে মোটে নগদ ৫,০০০৲ টাকা আছে, অথচ আমানতের পরিমাণ সেই ১০,০০০৲ টাকা; অর্থাৎ তহবিলে যত টাকা মজুত আছে তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা আমানৎ-কারীরা জমা দিয়া রাখিয়াছে।

এখন ধরা যাউক যে, ঐ ঋণ-গ্রহীতা ৫,০০০৲ নগদ্ লইয়া আবার

সেই ব্যাঙ্কেই জমা রাখিল অর্থাৎ ঋণের টাকাটা সেই ব্যাঙ্কেই আমানৎ রাখিয়া উহার বদলে চেক কাটিয়া ঐ পরিমাণ টাকা যখন উঠাইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিল অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ৫,০০০৲ ধার করিয়া ঐ ৫,০০০৲ ব্যাঙ্ককেই ধার দিল। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব দাঁড়াইবে :—

সম্পত্তি			দেয়	
নগদ	...	১০,০০০৲	'ক'-কে দেয়	৯০০৲
হ্যাণ্ডনোট	...	৫,০০০৲	'খ'-কে দেয়	১,১০০৲
			অন্যান্য দেয়	৮০০০৲
			ঋণ গ্রহীতাকে দেয়	৫,০০০৲
		১৫,০০০৲		১৫,০০০৲

এখানে তহবিলের নগদ টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই ; শুধু ব্যাঙ্ক একটা হ্যাণ্ড-নোট পাইয়াছে ও তাহার বদলে ঋণ-গ্রহীতাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দিয়াছে। সুতরাং নগদ টাকা লইয়া এত ঘোর-ফের না করিয়া, যদি ব্যাঙ্ক হ্যাণ্ড-নোট লইয়া টাকা উঠাইবার ক্ষমতা ঋণ-গ্রহীতাকে দিত, তবে একই ফল দাঁড়াইত। সুতরাং ব্যাঙ্কের হিসাব দাঁড়াইল :—

(ক) ঋণ-দানের পূর্ব্বে—

নগদ্	১০,০০০৲	আমানৎকারীকে দেয়	১০,০০০৲

(খ) ঋণ-দানের পর—

নগদ্	১০,০০০৲		
		আমানৎকারীকে দেয়	১৫,০০০৲
হ্যাণ্ড-নোট	৫,০০০৲		

সুতরাং বোঝা যাইতেছে ক্রেডিটের সাহায্যে ব্যাঙ্কের আমানৎ ও নোট, নগদ্ টাকাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে।

ব্যাঙ্ক-কারবারীকে টাকাকড়ির দালাল বা ব্যবসায়ী বলা চলে। রিক্সাওয়ালা যেমন রিক্সা ভাড়া খাটাইবার জন্য রাখে, ব্যাঙ্ক-কারবারীও তদ্রূপ টাকা ভাড়া খাটাইবার জন্য রাখে। প্রয়োজন হইলেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়া যায় বলিয়া, আর প্রত্যেককে টাকা মজুত করিয়া রাখিতে হয় না; কেননা লোকে যখন জানে যে, সুদ দিবার শপথ করিলেই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়, তখন অযথা ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট বাড়াইয়া টাকা নিজের কাছে মজুত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। লোকে তাই নগদ টাকা নিজের কাছে না রাখিয়া ব্যাঙ্কের হেপাজতে দিয়া চেক্ কাটিয়া টাকা উঠাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। এই ভাবে ব্যাঙ্কিং ক্রেডিট, চেক্ ও নোট ছাড়িয়া, ধাতবমুদ্রা ব্যবহারের পরিসর খাটো করিয়াছে।

শক্তিমান ব্যাঙ্ক-কারবারী, লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ যে, ঐ ব্যাঙ্কের স্বাক্ষরিত শপথপত্র বা ঐ ব্যাঙ্কের দস্তখত বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তির শপথপত্র, নগদ টাকার মত কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। অপর ব্যক্তির স্বাক্ষরিত শপথপত্র 'ডিস্কাউণ্ট' করিয়া বা ভাঙ্গাইয়া দিয়া, ব্যাঙ্ক যে, শুধু টাকা দাদন দেয় তাহা নহে—ব্যাঙ্ক এই সব ক্রেডিট পত্র চলিয়া যাইবারও সুবিধা করিয়া দেয়। প্রয়োজন হইলেই ভাঙ্গাইয়া টাকা পাওয়া যাইবে এ বিশ্বাস থাকিলে সহজেই লোকে হুণ্ডী বা বরাত-চিঠি বা বিল্ অফ এক্সচেঞ্জ লইতে চাহিবে। ব্যাঙ্ক, হুণ্ডী প্রভৃতি ক্রেডিটপত্র ভাঙ্গাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া ক্রেডিটের চলাচল বাড়াইয়া দেয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে হুণ্ডী এত অধিক চলিয়া থাকে যে, সে বিষয়ে

কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। হুণ্ডী বা বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ একটা আদেশ পত্র। কোন ঋণ বা ঋণ-স্বীকারকে আশ্রয় করিয়াই হুণ্ডী দেওয়া হয়। প্রত্যেক আদেশ পত্রে তিন পক্ষ বর্ত্তমান—আদিষ্ট, আদেষ্টা ও প্রাপক। পত্রের মোসাবিদায় আদেষ্টা, আদিষ্টকে এই সূত্রে আদেশ দিয়া থাকে যে আদেশপত্র দেখাইবার পর নির্দ্দিষ্ট তারিখে আদেষ্টার উল্লিখিত প্রাপককে নির্দ্দেশ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা দিয়া দেয়। আইনের চোখে ইহার অর্থ এই যে, মহাজন তাঁহার পাওনা টাকা তৃতীয় এক ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিতেছেন। এই বিল বা হুণ্ডীর পশ্চাৎদিকে খাতক দস্তখত করিয়া দিলেই তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। সাধারণতঃ প্রাপকের স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির নাম না লিখিয়া আদেষ্টা নিজের নামই লিখিয়া থাকেন। ইংরাজি বিল্ অফ এক্সচেঞ্জের বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল :—

১,০০০ পাউণ্ড লণ্ডন

[টিকিট] ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১।

অদ্য তারিখ হইতে তিন মাস কাল পরে আমাকে (বা আমার আদেশানুযায়ী অপর কাহাকেও) এক হাজার পাউণ্ড অর্পণ করিবে।

(স্বাক্ষর) জে, ব্রাউন্

এস, এম, টেলার সমীপেষু।

এখন যদি আদেষ্টা এই বিল্‌টিকে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিতে চাহেন (যেমন—ব্যাঙ্কে এই বিলটী ভাঙ্গাইতে চাহেন) তবে তাঁহাকে ঐ বিলটীর পশ্চাৎদেশে দস্তখত করিয়া দিতে হইবে। নীচে একটী বাঙ্গলা মিতি হুণ্ডীর আদর্শ দেওয়া হইল :—

শ্রীশ্রীদুর্গা [টিকিট]

শরণং।

সেবক শ্রীরামচরণ কুণ্ডু

প্রণামবহব নিবেদঞ্চ বিশেষ ঃ—

আপনাদের উপর এখান হইতে জেনী হুণ্ডী এক কেতা ১৬০০৲ ষোলশত টাকা, আটশত টাকার দ্বিগুণ ষোল শত টাকা লিখিতেছি। এখানে রাখে শ্রীঅমরচন্দ্র নন্দী বাদী মুদ্দৎ রোজ, গ্রেস ৩ রোজ, একুনে ২৪ রোজ পিছে ধনী যোগে তথায় হুণ্ডী পৌঁছিলে সাকরাইয়া দিয়া মুদ্দৎ বাদে ডিউ তারিখে টাকা দিয়া হুণ্ডীর পৃষ্ঠে রসিদ লেখাইয়া লইবেন। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম, ইতি। ২৫শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৩৪ সাল।

আমরা দেখিয়াছি যে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার পরিমাণ সাধারণতঃ দায় অপেক্ষা অধিক থাকে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে সব সময়েই ব্যাঙ্ককে এরূপ হিসাব করিয়া তহবিলে নগদ টাকা রাখিতে হইবে যে আমানৎকারী বা নোট-গ্রহীতা দাবী করিলেই তাহা দ্বিধা না করিয়া মিটাইয়া দিতে পারে—নতুবা ব্যাঙ্কের পক্ষে অমঙ্গল সুনিশ্চিত। উদাহরণ লওয়া যাউক। আমরা ব্যাঙ্কের শেষ যে হিসাব দিয়াছি তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকা মোট ১০,০০০৲ আছে অথচ দাবী করিলেই নগদ টাকা দিতে হইবে এরূপ দায় আছে ২০,০০০৲ টাকার! ধরা যাক্ ব্যাঙ্ক পরিচালক মনে করিলেন যে, নগদ টাকা ১০,০০০৲ তহবিলে জমা করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা বেশ লাভজনক ভাবে ধার দেওয়া যাইতে পারে এবং সেই হেতু ধার দিতে লাগিলেন।

দেখা গেল যে নগদ-তহবিলের পরিমাণ ১,০০০৲ হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথচ দায় ২৯,০০০৲ টাকায় ঠেকিয়াছে। এখন যদি কেহ (আমানৎকারী ও নোট-গ্রহীতাদিগের মধ্যে) ২,০০০৲ দাবী করিয়া বসে তবে, ব্যাঙ্কের পক্ষে সে-দায় মিটান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। দাবী করিবামাত্র নগদ টাকা দিবার ব্যাঙ্কের যদি চুক্তি না থাকিত তাহা হইলে হ্যাণ্ড-নোট হস্তান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্ক উদ্ধার পাইতে পারিত বা কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিত। এই দুই পন্থার কোনটী ব্যাঙ্ক অবলম্বন করিতে পারে না বলিয়া, নগদ টাকা অপ্রতুল হইবার সূচনা দেখিলেই ব্যাঙ্কের জমা দলিলাদি বিক্রয় করিয়া টাকা সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু দৈবাৎ এরূপ ভাবে অধিক টাকা জোগাড় করা ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব নহে। যদি কয়েকজন আমানৎকারী ও নোট-গ্রহীতা একসাথে এরূপ অবস্থায় নগদ টাকা দাবী করিয়া বসে তবে ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা দেওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে। লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি এই ভাবেই হয় ও তাহার ফলে অনেক ব্যাঙ্ককেই দেউলিয়া হইতে হয়।

সুতরাং ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকা যথেষ্ট পরিমাণে থাকার ফল যখন এত ব্যাপক, তখন প্রত্যেক ব্যাঙ্কে ঋণ দান ও নোট-ছাড়া এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত যাহাতে তহবিলে আবশ্যক অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা থাকে।*

* শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত "ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ" দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম দেশ হিসাবে বিভিন্ন হইয়া থাকে। ভারতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'; বিলাতে 'ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড; আর জার্ম্মাণীতে 'রাইখ্ ব্যাঙ্ক'। ব্যাঙ্কগুলির যেমন নামের বিভিন্নতা, তেমনি কর্ম্মেরও কিছু বিভিন্নতা আছে। তাই 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' কি 'সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক', কি 'ষ্টেট ব্যাঙ্ক' পরিচালনা সম্বন্ধে জানিতে হইলে, যে-বিল্ অনুসারে ব্যাঙ্কটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ধারাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। *

এ যুগে নোট ছাড়ার (ইস্থ করার) কাজ সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতেই। যাহাতে দরকার পড়িলেই নোটের বদলে ধাতুর মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনায়াসেই দিতে পারে সে জন্য আইন করিয়া কয়েকটী বাধ্যতামূলক নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই নিয়মগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়:—(১) **কোনরূপ প্রতিভূ জমা না রাখিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের নোট**

---

* কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিনয় কুমার সরকার প্রণীত "অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স্" প্রথমভাগের "ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড, বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস ও রাইখ্স্ বাঙ্ক" বিষয়ক অধ্যায় (১৯৩২) ও "ইণ্ডিয়ান কারেন্সি অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেমস্ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৪) এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" (১৯৩০) দ্রষ্টব্য।

ছাড়িবার ক্ষমতা ('ফিক্স্‌ড্‌ ম্যাক্সিমাম্‌ ফিডুসিয়ারি ইস্যু')। যেমন, ইংলণ্ডে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পিল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট পাশ হয়। এই অ্যাক্ট অনুসারে ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংল্যাণ্ডকে একটুও সোণা জমা না রাখিয়া ১৪ মিলিয়ান্‌ পাউণ্ড মূল্যের নোট ছাড়িবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংল্যাণ্ড ইহার অধিক নোট ছাড়িতে চাহিলে পূরামাত্রায় সোণা জমা রাখিতে হইবে। **(২) যে-পরিমাণ নোট ব্যাঙ্ক ছাড়িতে চায় তাহার একটা শতকরা অংশের অনুরূপ সোণা জমা রাখা চাই** ('ফিক্স্‌ড্‌ মিনিমাম্‌ পার্সেণ্টেজ্‌ সিষ্টেম্‌,)। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে চল্‌তি নোটের ৪০% সোণা মজুত রাখিতে হয়। **(৩) অধিকতম মাত্রায় কতটা পরিমাণ নোট ব্যাঙ্ক ছাড়িতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকা।** ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে ফ্রান্সে এই নিয়ম ছিল।

এই তিনটী ব্যবস্থারই সুবিধা-অসুবিধা আছে। (২)নং-এ বলা হইয়াছে যে নোটের একটা শতকরা অংশের জন্য সোণা জমা রাখিতে। এখন ধরা যাক্‌, এই শতকরা হিস্যা ৪০; তাহা হইলে ব্যাঙ্ক যদি ১০০ টাকার নোট ছাড়িয়া থাকে তাহা হইলে ৪০ টাকার সোণা মজুত রাখা আবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে যদি এক টাকার নোট ভাঙ্গাইয়াও টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে চলতি নোটের পরিমাণ হয় ৯৯৲ টাকার আর ৩৯৲ টাকার সোণা থাকে মজুত; কিন্তু ৩৯৲ টাকা, ৯৯৲ টাকার মাত্র ৩৯ $\frac{৩৯}{৯৯}$% অর্থাৎ ৪০%-এর কম; আইনতঃ তা সম্ভব নহে। সোণা মজুত রাখার অর্থ, দরকার পড়িলেই যেন নোট ভাঙ্গান যায়, কিন্তু এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে, ঠিক্‌ তাহাই সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে পার্সেণ্টেজ্‌ আইনতঃ

স্থির করিয়া দেওয়ার অর্থ কিছু টাকা অকেজো করিয়া ফেলিয়া রাখা। তাই আজকাল পার্সেণ্টেজকে কম করিয়া আনার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই হিসাবে (১)নং ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। (৩)নং ব্যবস্থার সুবিধা এই যে প্রয়োজনাতিরিক্ত নোটছাড়ার উপায় নাই; অধিকন্তু অধিকতম মাত্রা অপেক্ষা যদি বেশী পরিমাণের নোট আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আইন সংস্কার করিয়া লইলেই চলে।

আর এক কথা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদ সোণার বদলে কিছুটা ভাগ "ফরেন্ এক্স্চেঞ্জ"-এ রাখিতে দেওয়া হয়। এখানে 'ফরেন্ এক্স্চেঞ্জ' বলিতে বিদেশী টাকাকড়ি, বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা, এবং বিদেশী ব্যাঙ্কের ড্রাফ্ট বা কাগজপত্র প্রভৃতি বুঝিতেছি; তাছাড়া ঐ বিদেশে স্বর্ণমানও প্রচলিত আছে, এরূপ বুঝিতেছি। যেমন, জার্ম্মাণীর রিশ্ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের নিয়ম আছে নোটের জন্য ৪০% নগদ টাকা মজুত রাখিতে হইবে। কিন্তু এই ৪০%-এর মাত্র ৭৫% (=প্রচলিত নোটের ৩০% মাত্র) সোণা রাখিলেই চলে; বাকী ২৫% (=প্রচলিত নোটের ১০%)-এর জন্য ফরেন্ এক্স্চেঞ্জ রাখিলেই চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কতটা পরিমাণ নোট ছাড়িবে, রাষ্ট্র এই সব উপায়েই তাহা নিয়মিত করেন।

সাধারণ লোকে একটা কোন-না-কোন ব্যাঙ্কে টাকা আমানৎ রাখে। আবার এই ব্যাঙ্কগুলি টাকা গচ্ছিত রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে। আমানতের তুলনায় কত টাকা তহবিলে নগদ রাখা হইবে, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক আমানৎ-ব্যাঙ্কের একটা নির্দ্দেশ থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলের টাকা গচ্ছিত রাখাকে নগদ টাকারই সামিল করিয়া ধরা হয়। সুতরাং যদি আমানৎ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খাতায়

আমানৎ-ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণও বাড়ে। ব্যাঙ্ক যেমন টাকা আমানত রাখে, তেমনি আবার টাকা ঋণও দিয়া থাকে। **ব্যাঙ্ক, যে-ঋণদান করে তাহা প্রধানতঃ এই চার প্রকারের হইয়া থাকে—**

(১) ব্যাঙ্ক অল্পদিন মিয়াদে টাকা ধার দেয়; এই ধার করা টাকার জন্য যে সুদ দিতে হয় তাহা যৎসামান্যই হইয়া থাকে।

(২) বিল্‌স্ অফ্ এক্সচেঞ্জ বা বিনিময়-পত্রী ভাঙ্গাইয়া দিয়াও ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। ট্রেজরী বিলের মিয়াদ সাধারণতঃ তিন মাস; ব্যাঙ্ক ইহাতেও টাকা খাটায়।

(৩) ব্যাঙ্ক নিজের খরিদ্দারদের সিকিওরিটী জমা রাখিয়া টাকা দাদন দেয়; 'ওভার-ড্রাফ্‌ট' এই শ্রেণীর ঋণের অন্তঃর্গত।

(৪) ব্যাঙ্ক বিক্রয়যোগ্য বা 'মার্কেটেব্‌ল্' সিকিওরিটীতে টাকা খাটায়।

ব্যাঙ্কের এই ঋণদান-নীতির ফলে, ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়; সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, ঋণের টাকা আবার ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে। এই কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। দেশের মধ্যে যতগুলি ব্যাঙ্ক আছে সকলে যদি এক সঙ্গে শতকরা একটাকা ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, ব্যাঙ্কগুলির মোট-আমানতের পরিমাণ শত করা ১৲ টাকা বাড়িবে। কিন্তু যদি কোন একটা ব্যাঙ্ক হঠৎ ১০০০৲ টাকা ঋণ দিয়া বসে, তাহা হইলে যে, সেই-ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ১০০০৲ টাকা বাড়িয়া যাইবে এমন কথা বলা যায় না; অন্যান্য ব্যাঁঙ্কের তহবিলেও ইহার কিঞ্চিৎ অংশ যাওয়াই অধিক সম্ভব। সুতরাং ব্যাঙ্ক যদি ঋণের বহর বাড়াইতে চায়, তাহা

হইলে সকলের (ব্যাঙ্কগুলির) একজোট্ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; নতুবা যে-সব ব্যাঙ্ক সাহস করিয়া ঋণ দেওয়া বাড়াইয়া দিবে তাহাদেরই তহবিল শুকাইয়া আসিবে।

কিন্তু কথা আছে। প্রত্যেক আনামত-ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ থাকে আমানতের তুলনায় কত টাকা নগদ রাখিতে হইবে ('রেশিও অফ্ ক্যাশ্ টু ডিপজিট্')। যদি এখন ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকার পরিমাণ, এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী অনেক বেশী থাকে, তাহা হইলে, ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। ধরা যাক্, শুধু মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের নগদ টাকার পরিমাণ ১০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে আমানৎ ব্যাঙ্ক আমানতের তুলনায় ১০% নগদ রাখিতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্ক দেখিতেছে যে, সে অনায়াসেই ৯০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ দিতে পারে ; ইহার মধ্যে (ধরা যাক্) ১০০,০০০ পাউণ্ড আবার ব্যাঙ্কের তহবিলেই ফিরিয়া আসিবে ও বাকী ৮০০,০০০ পাউণ্ড অন্যান্য ব্যাঙ্কের তহবিলে ঢুকিবে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির হাতে এই ৮০০,০০০ পাউণ্ড গেলে, ব্যাঙ্কগুলির নগদ্-আমানতের রেশিও-ও (অনুপাত) ঋণদানের উপযোগী ঠেকিবে। এইভাবে মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯০লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া যাইবে। ১৯৩৩ সালে লণ্ডন ব্যাঙ্কের হিসাব দেখিলে ইহা স্পষ্টতর হইবে। ১৯৩২শের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৩শের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লণ্ডন ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলির নগদ টাকার পরিমাণ ৩১·২ মিলিয়ন পাউণ্ড বাড়িয়া যায়। আর সেই সময়ের মধ্যে আমানৎ প্রায় ২৯৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ঋণ ২৬৭ মিলিয়ন পাউণ্ড বাড়ে। আমানৎ-নগদ রেশিও ১০·৪% হইতে ১০·৬% পর্য্যন্ত উঠে (অর্থাৎ প্রায় একই ছিল)। ব্যাঙ্কগুলি যদি ঋণের পরিমাণ না বাড়াইত তাহা হইলে আমানৎও ৩১·২ মিলিয়ন পাউণ্ডের বেশী বাড়িত না।

১০% নগদ রাখিলেই চলে বলিয়া ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০ গুণ বাড়িয়াছে।

সুতরাং প্রশ্ন উঠে, ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকা জমে কেন এবং ঐ টাকা বাড়া-কমা কিসের উপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হইতেছে "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক"। **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই দেশের মধ্যে চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে।** উপরে আমরা ব্যাঙ্কের চার প্রকার ঋণ দিবার কথা বলিয়াছি; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম তিন দফায় হাত দেয় না, চতুর্থ শ্রেণীর ঋণ দেওয়ায়ই টাকা খাটায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি (ধরা যাক্) ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের সিকিওরিটী ক্রয় করে, অর্থাৎ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেয়, তাহা হইলে সিকিওরিটী বিক্রেতাগণের হাতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আসে। তাহারা ঐ টাকা নিজ নিজ ব্যাঙ্কে জমা দেয়। এই ভাবে আমানৎ-ব্যাঙ্কগুলির (ডিপজিট্ ব্যাঙ্ক, আমানতের খাতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া যায়। আর যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিওরিটী বিক্রয় করে, তাহা হইলে ঠিক্ উল্টা ফলই ফলিবে অর্থাৎ আমানৎ-ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ কম হইয়া আসিবে। ব্যাঙ্কের খরিদ্দার যেমন নিজ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে, তেমনি ব্যাঙ্ক আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে টাকা আমানৎ রাখে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণদানের ফলে (লোন্ পলিসি) শুধু যে ব্যাঙ্কগুলির আমানৎ বৃদ্ধি পায় তাহাই নহে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিজের খাতায়ও আমানৎ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খাতায় যে-টাকাটা আমানৎ থাকে, সেই টাকা নগদ টাকার সমান বলিয়া গ্রাহ্য হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের লোন্-পলিসি অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানৎ ও নগদ দুইই বাড়াইয়া দেয়। আবার ব্যাঙ্কের আমানৎ-নগদের একটা রেশিও স্থির থাকে। ধরা যাক্, আমানতের ১০% নগদ রাখিলেই চলে; তাহা হইলে এক্ষেত্রে

ব্যাঙ্কগুলি ৫০ লক্ষের নয় গুণ প্রায় ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিতে পারিবে।

দেশের মধ্যে টাকাকড়ির পরিমাণ শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ-দান প্রণালীর (লোন্ পলিসি) উপর নির্ভর করে না। আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার ব্যালেন্সেরও একটা প্রভাব আছে। সোণা যদি দেশে ফিরিয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কে তাহা জমা হইয়া আমানতের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। ধরা যাক্ রপ্তানীকার ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের সোণা আমদানী করিয়াছে; ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডে এই সোণা বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সোণা-আমদানীকারী নিজ ব্যাঙ্কেই জমা রাখিবে। ইহার ফল কি হয়? ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের তহ্বিলে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সোণা জমা হয়। আর ব্যাঙ্কের খাতায় দায় লেখা থাকে (ডিপজিট্-লায়েবিলিটী) ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের। আর আমানৎ ব্যাঙ্কের খাতায় আমানতি-দায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের থাকে এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের খাতায় ক্রেডিট্ অ্যাকাউণ্টে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড জমা থাকে। যদি ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড এই টাকা লইয়া আর মাথা না ঘামায় তাহা হইলে, আমানৎ ব্যাঙ্কগুলি ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত (৯×৫০) ঋণ দিতে পারে; অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) বাজারে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সিকিওরিটী খরিদ করিলে যে-ফল হইয়াছিল, স্বর্ণ আমদানী করার ফলও তাহাই দেখা যাইতেছে।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডে যখন সোণা আসে, তখন তাহা 'ইস্থ্ ডিপার্টমেণ্টে' পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার বদলে নোট ইস্থ্ করা হয়। সুতরাং ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সোণা জমা হইলে ইস্থ্ ডিপার্টমেণ্টের—সম্পত্তি (অ্যাসেট্) বাড়িবে ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের সোণা আর নোট ছাড়ার জন্য দায় থাকিবে ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের। ইতিমধ্যে নতুন নোটগুলি ব্যাঙ্কিং

ডিপার্টমেণ্টে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসেট বাড়িয়া যাইবে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড; কিন্তু আমানৎ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঐ পরিমাণ টাকা আমানৎ রাখিবে বলিয়া (পূর্ব্বেই ইহা বুঝাইয়াছি) ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেণ্টের আমানতি-দায় বাড়িবে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এখানে মূল কথা এই দাঁড়াইল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মোট-দায় বাড়িল ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের, আর মোট-অ্যাসেট বাড়িল ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের। অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও রিজার্ভের একটা অংশ নগদ টাকায় রাখে এবং বাকীটা থাকে সিকিওরিটীতে। দায়-সম্পত্তি (লায়াবিলিটি-অ্যাসেট) উভয় দিকেই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মোট দায়ের তুলনায় নগদের পরিমাণ একটু ওলটপালট হইয়াছে অর্থাৎ সোণা ও মোট দায়ের রেশিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ধরা যাক্, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের এই রেশিও $\frac{১}{৩}$; সুতরাং ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দায়-সম্পত্তি বাড়িবার পরও যদি ব্যাঙ্ক ঐ রেশিও-ই বজায় রাখিতে চায় তাহা হইলে ১০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণদান করা ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য এবং তাহা করিলে অ্যাসেট ও আমানৎ দুই দিকেই ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িবে এবং তাহা হইলে সোণা ও আমানতের রেশিও দাঁড়াইবে ১ : ৩। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড এই পন্থা অবলম্বন করিলে, আমানৎ ব্যাঙ্কগুলির আমানৎ, ৫০ লক্ষ পাউণ্ড না বাড়িয়া ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়িবে এবং এই আমানৎ ব্যাঙ্কগুলি আবার যদি নিজ নিজ রেশিওর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া টাকা ঋণ দেয় তাহা হইলে এই সব ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড না হইয়া ১৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড (৯ × ১৫০) হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব দেশের চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া যাইবে।

যখন দেশের মধ্যে সোণা আমদানী হইতে থাকে, তখন রেশিওর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই করিতে পারে ঃ—

(১) রেশিও অবিকৃত রাখিবার জন্য ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া দেশের চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

(২) একবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে; তাহা হইলে চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প বাড়িবে। পূর্ব্ব উদাহরণে ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

(৩) উল্টা পথ ধরিয়া ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সিকিওরিটী বিক্রয় করিতে পারে। এই নীতি অবলম্বন করিলে আমানৎ-ব্যাঙ্কের আমানৎ অব্যাহত থাকিবে, বাড়িবে না, কেননা ৫০ লক্ষ টাকার সোণা বিক্রয়ের জন্য যেমন খরিদ্দার ব্যাঙ্কে ঐ টাকা জমা রাখিবে, তেমনি সিকিউরিটী ক্রয়ের টাকা মিটানোর জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ঐ পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকাকড়ি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় যে শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদা অনুযায়ী তাহা বাড়ে-কমে। বিদেশের পাওনা মিটানো সম্বন্ধেও দায়িত্ব কম নহে। দেশের মধ্যে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, এবং ব্যালেন্স অফ্‌ ট্রেড প্রতিকূলে থাকে (অর্থাৎ রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী থাকে) তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সোণা বিক্রয় করা প্রয়োজন হয়; সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে 'ব্যালেন্স অফ্‌ পেমেণ্ট' বা বিদেশের পাওনা অন্যায়ভাবে না বাড়ে এবং সেই দিকে নজর রাখিয়াই টাকা-কড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়।

বিদেশের পাওনাকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগ করিতে পারি ঃ—

(১) চল্‌তি হিসাব বাবতে পাওনা, আর (২) ক্যাপিট্যাল অ্যাকাউণ্টের পাওনা। পণ্য আমদানী-রপ্তানী, জাহাজ চালান (শিপিং), বীমা, দালালী প্রভৃতির জন্য যে পাওনা দিতে হয় তাহা ১ম শ্রেণীর অন্তর্গত। আর ঋণ ও সুদের জন্য যে পাওনা মিটাইতে হয় তাহা ২য় শ্রেণীর অন্তর্গত। ধরা যাক্ যে, যে-দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত আছে তথায় 'ব্যালেন্স অফ পেমেণ্ট আন্‌ফেভারেব্‌ল্' হইয়াছে অর্থাৎ বিদেশের পাওনা মিটানোর জন্য স্বর্ণ রপ্তানী আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এরূপ অবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেষ্টা হইবে এই গতি ফিরাইবার। এবং সেজন্য যে অস্ত্র ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে তাহা হইল সুদের হার নিয়ন্ত্রণ। আমরা যে দৃষ্টান্ত লইয়াছি, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইয়া দিবে এবং তাহার ফলে ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ (ব্যাঙ্ক লোন্‌স্) কমিয়া আসিবে। এ বিষয়ে 'বিল ভাঙ্গান' অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।*

* 'কারেন্সি ষ্টেবিলাইজেশন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা

দেশের ভিতরের দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য ধাতুমুদ্রা, ব্যাঙ্ক-নোট সরকারী নোট প্রভৃতি আবশ্যক হয়। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে হুণ্ডী, চেক্ ও হ্যাণ্ড-নোটের সাহায্যেও দেশের মধ্যে কারবার বেশ সহজেই চালান সম্ভব। কিন্তু দুইটী বিভিন্ন দেশের কথা উঠিলে দেনা-পাওনা এত সহজে মিটানো চলে না। শুধু ক্রেডিটের সাহায্যে কারবার চলে না—দাম দিতেই হইবে। অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে প্রত্যেক দফায়ই টাকাকড়ি পাঠাইতে হইবে। কিন্তু তাহা সুবিধাজনক নহে, কেন না তাহাতে বিপুল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেখিতে হইবে নগদ টাকাকড়ি একদেশ হইতে আর এক দেশে না পাঠাইয়াও কিরূপে দেনা-পাওনা মিটানো যায়। "বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ" বা বিদেশী হুণ্ডী একাজ বেশ সুচারুরূপে চালাইতে পারে। বৈদেশিক হুণ্ডীর সাহায্যে আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা মিটানোকে "ফরেন-এক্সচেঞ্জ" বা "বৈদেশিক বিনিময় বলে"। এই প্রণালী অনুসারে একজনের দেনা বা পাওনা এরূপ ভাবে দেশ হইতে দেশান্তরে হস্তান্তরিত করা হয় যে নগদ টাকাকড়ি প্রেরণ করা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। ১৯২৮-২৯ খৃঃ ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ২৫৩ কোটী টাকার মাল খরিদ করে এবং ৩৩৮ কোটী টাকার মাল বিদেশে পাঠায়; এখন যদি নগদ টাকায় এই দেনা-পাওনা মিটাইতে হয় তাহা হইলে ৩৩৮ কোটী টাকা জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশে আসিবে আবার ২৫৩ কোটী টাকা সেই ভাবেই

পাঠাইতে হইবে ; ইহাতে ঝুঁকি ও লোকসান বড় কম নয়। সুতরাং এই ক্ষতি এড়াইতে পারিলেই ভাল। "বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ" বা বিদেশী-হুণ্ডী, এই ক্ষতি এড়াইবার সহায়তা করে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হয়, এবারে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ধরা যাক্, একজন বার্লিনবাসী, একজন লণ্ডনবাসীর কাছে ১০০০ পাউণ্ড ধারে ; এখন এই দেনা মিটাইবার সবচেয়ে সোজা উপায় কি ? যদি সোণা পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বহুনী-খরচাও (ফ্রেট) দিতে হইবে এবং সেই জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যদি সে এমন একজন লোককে পায় যে, লণ্ডনবাসী কোন ব্যক্তির নিকট ১০০০ পাউণ্ড পাইবে, তবে তাহার সহিত দেনা-পাওনা হাত-ফের করিয়া সে সহজেই স্বীয় দেনা মিটাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আর্জ্জেণ্টিনা ও লণ্ডনের কথা ধরা যাউক। আর্জ্জেণ্টিনায় "ক" লোহা আমদানী করে ও "খ" পশম রপ্তানী করে আর লণ্ডনে "গ" পশম আমদানী করে ও "ঘ" লোহা রপ্তানী করে। যদি একই মূল্যের দুটোই আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে (ধরা যাক্ ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের) তবে :—

আর্জ্জেণ্টিনা		লণ্ডন	
"ক" লোহা আমদানীকারী	£৫০০	"গ" পশম আমদানীকারী	£৫০০
"খ" পশম রপ্তানীকারী	£৫০০	"ঘ" লোহা রপ্তানীকারী	£৫০০

এখন বিলের ব্যবহারে কি সুবিধা হয় দেখা যাউক। রপ্তানী কারকই সাধারণতঃ আদেশ-পত্র বা হুণ্ডী লিখিয়া থাকেন। সুতরাং আর্জ্জেণ্টিনার "খ", লণ্ডনের "গ"র উপর হুণ্ডী লিখিবেন, আর লণ্ডনের "ঘ" আর্জ্জেণ্টিনার "ক"র উপর হুণ্ডী লিখিবেন। এই হুণ্ডী বা বিল দুটী, যে-দেশে লেখা হইয়াছে সেই-দেশেই বিক্রয় করা যদি সম্ভব হয়, তবে অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু কথা

হইল কিনিবে কে ? কেন, "ক"কে ত' দাম মিটাইতে হইবে লণ্ডনে আর "গ"কে দাম মিটাইতে হইবে আর্জেন্টিনায় ; তাই "ক", "খ"র কাছে বিল কিনিয়া "ঘ"কে পাঠাইবে আর "গ", "ঘ"র কাছে কিনিয়া "খ"কে পাঠাইবে ; এই ভাবে একটী কড়িও দেশ হইতে দেশান্তরে আনাগোনা না করিয়া সমস্ত দেনা-পাওনা শোধবোধ হইয়া যাইবে। অবশ্য এখানে দুইটী দেশের আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ সমান বলিয়া ধরা হইয়াছে ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না, আমদানী বা রপ্তানী একটা না একটার পরিমাণ বেশী হইয়াই থাকে এবং সেক্ষেত্রে মিটমাট একটু বিভিন্ন ধরণে হইয়া থাকে।

মিণ্ট্ পার্ অফ্ এক্সচেঞ্জ

চল্‌তি মুদ্রার খাঁটি ধাতুর পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইয়া থাকে। আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে মুদ্রার দর্শনীমূল্যের প্রতি নজর দিলে চলে না, দেখিতে হয় মুদ্রাটীতে কতটা পরিমাণ খাঁটী ধাতু আছে ; অর্থাৎ বিদেশের সহিত কারবার চালাইতে হইলে ঐ দেশের আদর্শমুদ্রা ও এদেশের আদর্শমুদ্রার খাঁটী ধাতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়। **ইহাকেই "মিণ্ট পার্ অফ এক্সচেঞ্জ" কহে।** যদি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বর্ণ-নির্ম্মিত আদর্শমুদ্রাকে চলৎ-সিক্কা ধরিয়া লওয়া যায় এবং ইংলিশ পাউণ্ডকেই আদর্শমুদ্রা ধরা যায়, তাহা হইলে কতগুলি স্বর্ণ-নেপোলিয়নে (ফ্রান্সের আদর্শ স্বর্ণ-মুদ্রা) ইংলিশ পাউণ্ডে যে-পরিমাণ বিশুদ্ধ সোণা থাকে তাহা আছে তাহাই হইল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের 'পার্ অফ্ এক্সচেঞ্জ'। লণ্ডন প্যারিসের 'পার অফ্ এক্সচেঞ্জ' হইল ২৫'২২১৫ ফ্রাঁ ; ইহার অর্থ এই যে, একটা পাউণ্ডে (ইংলিশ) যে-পরিমাণ সোণা আছে, ২৫'২২১৫ ফ্রাঁতেও সেই

পরিমাণ সোণা আছে। লণ্ডন ও প্যারিসের পার অফ্ এক্সচেঞ্জ যেরূপে হিসাব করা হয় বলা হইল অন্যান্য দেশের 'মিণ্ট্ পার্'ও সেইরূপভাবেই হিসাব করা হয়।—*

লণ্ডন-বার্লিন —২০·৪৩ মার্ক = ১ পাউণ্ড

লণ্ডন-নিউ-ইয়র্ক— ৪·৮৬ ডলার = ১ পাউণ্ড

লণ্ডন-ভিয়েনা —২৪·০২ ক্রোনেন = ১ পাউণ্ড

অতএব যদি কোন দেশের মুদ্রা নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মিণ্ট্ পার অফ্ এক্সচেঞ্জও পরিবর্ত্তিত হইবে। মিণ্ট্ পার অফ্ এক্সচেঞ্জ স্থির করিবার সময় ধাতুর মূল্যের প্রতিই কেবল দৃষ্টি রাখা হয়। দুইটী দেশের আদর্শ মুদ্রা যদি বিভিন্ন ধাতু নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে মিণ্ট্ পার অফ্ এক্সচেঞ্জ স্থির করা যায় না—যেমন ইংলণ্ড ও চীন। ইংলণ্ডের আদর্শমুদ্রা স্বর্ণ-নির্ম্মিত আর চীন দেশের আদর্শমুদ্রা রৌপ্য-নির্ম্মিত। সোণার তুলনায় রূপার দর বড় বেশী ওঠানামা করে; তাই এই দুইটী ধাতুর মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধ স্থির করা দুরূহ। বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ কেনা-বেচার সময় কত দর দিতে হইবে সেটা জানার জন্যই মিণ্ট্ পার্ অফ্ এক্সচেঞ্জ জানা দরকার। ধরা যাক্ জন্ লকে লণ্ডনে বসিয়া প্যারিসের পিয়ারে রশারের কাছ হইতে ১০০ পাউণ্ড মূল্যের সিল্ক খরিদ্ করিয়াছে; রশার তার পাওনা ফ্রাঁ ও সঁ্যতিম্-এ মিটাইয়া লইতে চাহিবে, পাউণ্ড-শিঃ-পেঃ-এ নয়। জন্ লকে জানে যে, ফ্রান্সে আইনতঃ লণ্ডনের ১ পাউণ্ড = ২৫·২২১৫ ফ্রাঁ। সুতরাং সে যদি ২৫২২·১৫ ফ্রাঁ (২৫·২২১৫ × ১০০) দর দিয়া একটা বিল্ কিনিয়া রশারকে পাঠাইয়া দেয় তাহা হইলেই তাহার দেনা মিটিয়া যায়।

* আর্থিক সঙ্কটের ফলে টাকাকড়ির সাম্যের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার পূর্ব্বের হিসাব।

উপরের দৃষ্টান্তে দেখানো হইয়াছে যে, আমদানীকারক সোজাসুজি রপ্তানিকারকের কাছ হইতে বিল কিনিয়া টাকা পাঠাইতেছে; কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হয় না। গোটা দেশে কে কোথায় মাল রপ্তানী করিতেছে, আমদানীকারকের পক্ষে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নয়। রপ্তানীকারকও জানে না যে, দেশে কোথায় কোন আমদানীকারক অন্যত্র টাকা পাঠাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। এই অসুবিধা মিটাইতেছে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের খবর ও ঠিকানা উভয়েই জানে। ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারের কাছ হইতে বিল কিনিয়া আমদানীকারকে বিক্রয় করে।

"আন্তর্জ্জাতিক মাল-চলাচলের কারবারে ব্যাঙ্কগুলা বেপারীদিগকে টাকা-পয়সার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করে। মালের রসিদ দেখিয়া টাকা আগাম দেওয়া অথবা পাওনাদারের নিকট দেনদারের জন্য জিম্বাদারি লওয়া ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য।.....

এক ইয়োরোপের কথাই ধরা যাউক। যুদ্ধের পর হইতে এই ভূখণ্ডের প্রত্যেক দেশেই বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে।..... আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ফুলিয়া উঠার অর্থ আর কিছুই নয়, ব্যাঙ্কগুলার উপর চাপ খুব বেশী পড়িতেছে। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বেপারীদিগের "বাণিজ্য-কাগজ" লইয়া মালের বন্ধকীতে টাকা আগাম ছাড়িতেছে।" †

বিনিময়ের বাজার চল্‌তি হার (রেট্-অফ্-এক্সচেঞ্জ) বলিলে বিলের দর বুঝায় এবং বিলের দর অন্যান্য পণ্যের মত

---

† বিনয় সরকারের একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র প্রথম ভাগ (১৯৩০) পৃঃ ১৬৪-৬৫।

টান-যোগানের উপর নির্ভর করে। চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হইলে বিলের দর পড়িয়া যায় আর বিল যদি অপ্রতুল হয় তবে দর চড়িয়া যায়। বিলের দর চড়া বা সস্তা হইলেও, একটা সীমা আছে যাহার অধিক চড়া বা সস্তা হইতে পারে না। বিলের দর যদি এই সীমা লঙ্ঘন করে তবে মুদ্রা প্রেরণ করাই সুবিধা ও লাভজনক হইয়া পড়ে। এই সীমাকে **"স্বর্ণবিন্দু"** বা "গোল্ড পয়েণ্ট" কহে। মনে করা যাক্ যে ফ্রান্সের এক বণিককে লণ্ডনে ১০০০ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে; সেই বণিককে নগদ্-টাকাকড়ি জাহাজ বোঝাই করিয়া পাঠাইতে হইলে একটা প্রেরণ-খরচা (মাশুল, বীমা ইত্যাদি) দিতে হইবে; এখন যদি সে, লণ্ডনে উশুলি-দেয় একটা ১০০০ পাউণ্ডের বিল পায়, এবং ঐ বিলটী কিনিতে ১০০০ পাউণ্ডের অধিক যে সামান্য টাকা বেশী দিতে হইতেছে তাহা সহস্র পাউণ্ডের প্রেরণ-খরচা অপেক্ষা অল্প হয়, তবে সেই বণিক, বিল কিনিয়াই দেনা উশুল দিবে। মিণ্ট্ পার্ অফ্ এক্সচেঞ্জের সহিত প্রেরণ-খরচা যোগ বা বাদ দিয়া "স্বর্ণ-বিন্দু" নির্ণয় করিতে হয়। লণ্ডন-প্যারিস প্রেরণ-খরচা হইতেছে ১০ স্যাঁতিম্; অতএব ঃ—

মিণ্ট্ পার্ প্রেরণ খরচা

ফ্রাঁ—২৫·২২ – ১০ স্যাঁতিম্ = ২৫·১২ ফ্রাঁ—স্বর্ণবিন্দু—লণ্ডন হইতে প্যারিসে

ফ্রাঁ—২৫·২২ + ১০ স্যাঁতিম্ = ২৫·৩২ ফ্রাঁ—স্বর্ণবিন্দু—প্যারিস হইতে লণ্ডনে

অর্থাৎ লণ্ডন প্যারিসের বিনিময়ের বাজার-চল্‌তি হার সাধারণতঃ ২৫·১২ ফ্রাঁ অপেক্ষা নামিতে পারে না বা ২৫·৩২ ফ্রাঁ অপেক্ষা বাড়িতে পারে না। কেননা যদি বিলের দর ২৫·১২ ফ্রাঁ অপেক্ষা

নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে বিল না পাঠাইয়া ২৫·২২ ফ্রাঁ মুদ্রা রপ্তানি করাই লাভজনক হইবে। বার্লিনের স্বর্ণবিন্দু নীচে দেওয়া হইল :—

মিণ্ট-পার	প্রেরণ খরচা
মার্ক—২০·৪৩—১০ ফেনিগ্ (পাঃ প্রতি) = ২০·৩৩ মার্ক—স্বর্ণবিন্দু	
মার্ক—২০·৪৩+১০ ফেনিগ্ (পাঃ প্রতি) = ২০·৫৩ মার্ক—স্বর্ণবিন্দু	

"কোটেশন্" বা উদ্ধৃতি

বিনিময়ের বাজার চল্‌তি হারের ওঠা-নামার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যহ সংবাদপত্রে যে সব "এক্সচেঞ্জ কোটেশন" প্রকাশ হয় তাহা দেখিয়া বিলের দর চড়িতেছে না পড়িতেছে টপ করিয়া বলা শক্ত। ইহার হেতু, এই উদ্ধৃতির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। নীচে একটী নমুনা দেওয়া হইল :—

ফরেন্ এক্সচেঞ্জেস্ অন্ লণ্ডন

প্যারিস্-চেক্	২৫ ফ্রাঁ ১৬$\frac{3}{8}$—১৭$\frac{3}{8}$ সে	পাউণ্ডের	তুলনায়	ফ্রাঁ
ব্রাসেলস্-চেক্	২৫ ফ্রাঁ ২৯$\frac{1}{2}$—৩০$\frac{1}{2}$ সে	,,	,,	,,
বার্লিন-দর্শনী	২০ মার্ক ৪৯—৫০ ফে	,,	,,	মার্ক
ভিয়েনা-দর্শনী	২৪ ক্রোনেন ১৬—১৮ হেঃ	,,	,,	ক্রোনেন
ইটালী-দর্শনী	২৫ লিরা ২৬—৮ সে	,,	,,	লিরা
কলিকাতা-টেলিঃ ট্রাঃ	১ শিঃ ৩$\frac{15}{16}$ পেঃ	টাকার	,,	শিলিং
নিউইয়র্ক-কেঃ ট্রাঃ	৪ ডলার ৮৭$\frac{7}{16}$—$\frac{1}{2}$সে	পাউণ্ডের	,,	ডলার

বিনিময়-হার দুই ভাবে ব্যক্ত করা যায়। (১) স্বদেশের সিক্কা বা কারেন্সীতে ব্যক্ত করা যায় অর্থাৎ বিদেশের চলৎ-সিক্কা মুদ্রার বিনিময়ে স্বদেশের আদর্শ-মুদ্রা কত দিতে হইবে তাহা

দেখান যায় ; (২) বিদেশের সিক্কা বা কারেন্সিতে ব্যক্ত করা যায় অর্থাৎ স্বদেশের আদর্শ মুদ্রার বিনিময়ে কতগুলি বিদেশী আদর্শমুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহা দেখান যায়। লণ্ডন ও প্যারিসের বিনিময়-হার, ফরাসী সিক্কাতেই সাধারণতঃ ব্যক্ত করা হইয়া থাকে অর্থাৎ এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে কতগুলি ফ্রাঁ-খণ্ড পাওয়া যাইবে তাহাই দেখান হইয়া থাকে ; পক্ষান্তরে এক-ফ্রাঁ, কতগুলি শিলিং-পেন্সের তূল্য মূল্য তাহাও বলা যায়। লণ্ডন—কলিকাতার বিনিময়-হার, সাধারণতঃ বিলাতী সিক্কাতেই ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ এক টাকার বিনিময়ে, কতগুলি শিলিং-পেন্স পাওয়া যাইবে, তাহা দেখান হইয়া থাকে। উপরে যে "ফরেন্ এক্সচেঞ্জ" বা বৈদেশিক বিনিময়ের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে, এক পাউণ্ডের বিনিময়ে কতগুলি বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইবে ; কেবল কলিকাতার বেলায়ই দেখান হইয়াছে এক টাকার বিনিময়ে কতগুলি শিলিং-পেন্স পাওয়া যাইবে। যদি বিনিময়-হার, বিদেশী টাকাকড়িতে ব্যক্ত করা হয় (অর্থাৎ এক পাউণ্ডের বিনিময়ে কত বিদেশী সিক্কা পাওয়া যাইবে দেখান হয়) এবং বিনিময়-হার যদি চড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঐ হার স্বদেশের পক্ষে অনুকূল আর পড়িয়া গেলে তাহা স্বদেশের পক্ষে প্রতিকূল। ধরা যাক্ এক ব্যক্তিকে লণ্ডন হইতে ১০০ পাউণ্ড ফ্রান্সে পাঠাইতে হইবে ; এখন এক পাউণ্ডের মিণ্ট্ পার ভ্যালু ২৫·২২ ; সুতরাং ১০০ পাউণ্ড ফ্রান্সে পাঠানর অর্থ ২৫২২ ফ্রাঁ (২৫·২২ × ১০০) পাঠান। কিন্তু মনে কর বিনিময় হার দাঁড়াইয়াছে ২৫·১৫ অর্থাৎ এক পাউণ্ডের বদলে ২৫·১৫ ফ্রাঁ পাওয়া যাইতেছে ; অতএব ১০০ পাউণ্ডের বদলে ২৫১৫ ফ্রাঁ (২৫·১৫ × ১০০) পাওয়া যাইবে ; কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ত' ২৫২২ ফ্রাঁ মোট পাঠাইতে হইবে ! সুতরাং ঐ ২৫২২ ফ্রাঁ (১০০

পাউণ্ড) পাঠাইতে হইলে, চল্‌তি হার হিসাবে তাহাকে ১০০ পাউণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হইবে। সুতরাং এই পড়্‌তি হারটা দেনাদার হিসাবে তাহার প্রতিকূল।

বিনিময়ের বাজার চল্‌তি হার কোন্ সিক্কায় ব্যক্ত করা হইতেছে —স্বদেশী না বিদেশী সিক্কায়—তাহা লক্ষ্য করিলেই ঐ হার অনুকূল না প্রতিকূল সহজেই বোঝা যাইবে। সহজ কথায় বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় ঃ—

যদি সিক্কা হয়	এবং হার	তবে বিনিময়ের বাজার চল্‌তি হার
বিদেশী	পড়িতে থাকে	প্রতিকূল
বিদেশী	চড়িতে থাকে	অনুকূল
স্বদেশী	পড়িতে থাকে	অনুকূল
স্বদেশী	চড়িতে থাকে	প্রতিকূল

এইরূপে একটা দেশের প্রতিকূলে যখন বিনিময়ের বাজার-চল্‌তি হার চড়িয়া যায়, তখন আমদানীকারদিগকে বিলের জন্য কিছু বেশী দর দিতে হয়; অর্থাৎ আমদানীকরা পণ্যের জন্য তাহাদিগকে যেন কিঞ্চিৎ অধিক দর দিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে রপ্তানীকারকগণ স্বীয় বিলের জন্য কিছু বেশী পাইতেছে অর্থাৎ যেন পণ্যগুলি কিঞ্চিৎ চড়া দরে বিক্রয় করিতেছে। এক কথায়, এরূপভাবে বিনিময়ের বাজার চল্‌তি হার চড়ার অর্থ আমদানীর পক্ষে দণ্ডস্বরূপ ও রপ্তানীর পক্ষে ধরাট স্বরূপ। সুতরাং **হার চড়ার ফলে আমদানীর পরিমাণ প্রতিহত হয় ও রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যায়;** এই ভাবে বাণিজ্য-নিক্তি (ব্যালান্স অফ্

ট্রেড) সমতায় ফিরিয়া আসে। অতএব দেখা গেল যে বিনিময়ের বাজার চল্‌তি হারের ওঠা-নামার ফলে বাণিজ্য-নিক্তি স্থির থাকে।*

বিনিময়-হারের ওঠা-নামা

আমরা দেখিলাম যে বিনিময়-হার (অর্থাৎ রেট্ অফ্ এক্সচেঞ্জ) বলিতে 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বা বিদেশী-হুণ্ডীর দর বুঝায় এবং বিলের যোগান নির্ভর করে রপ্তানীকারকদের সংখ্যার উপর, আর চাহিদা নির্ভর করে আমদানী-কারকদের সংখ্যার উপর অর্থাৎ বিলের টান-যোগান নির্ভর করে আমদানী-রপ্তানীর উদ্বৃত্তির (ব্যালেন্স) উপর। **যদি রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী করা হইয়া থাকে তবে বিনিময়-হার ঐ দেশের প্রতিকূলে বাড়িবে; আর যদি রপ্তানিই বেশী করা হইয়া থাকে তবে বিনিময়-হার নামিয়া যাইবে অর্থাৎ ঐ দেশের অনুকূলে হইবে।** যথা, ফ্রান্স যদি ইংল্যণ্ডে যে-পরিমাণ মাল রপ্তানী করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক ঐ দেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফরাসী বণিকগণ ইংলণ্ডের টাকা উশুলী দিবার সময় ১০০ পাউণ্ড মূল্যের বিলের জন্য ২৫২২ ফ্রাঁ অপেক্ষা অধিক দিবে, কেননা আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ কম বলিয়া রপ্তানীকারকগণ, যে বিলগুলি বিক্রয় করিতে চাহিবে, সেইগুলি খরিদ করিবার জন্য আমদানীকারকগণের মধ্যে টক্কর লাগিয়া যাইবে। তেমনি যদি ফ্রান্স রপ্তানী অপেক্ষা অল্প আমদানী করিয়া থাকে, তবে

* এ বিষয়ের আধুনিক দৃষ্টান্ত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "ইণ্ডিয়ান কারেন্সি অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্" গ্রন্থ (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৪—৭)।

লণ্ডনে উশুলী-দেয় ১০০ পাউণ্ডের বিলের জন্য আমদানীকারক ২৫২২ ফ্রাঁ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পই দিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বহরের উপর বিলের যোগান নির্ভর করে; ব্যবসার যদি মরশুম হয় তবে বিল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আর ব্যবসা যদি মন্দা হয় বিলের যোগানও কমিয়া যায়। তবে যে, শুধু পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীরই উপর বিলের যোগান নির্ভর করে এরূপ নহে; ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপের জন্যও—যথা, দালালী (ব্রোকারেজ), কমিশন, বহনী-খরচা প্রভৃতি—বিল বাজারে আসিয়া থাকে। মাল-বহনের কাজ ইংলণ্ড অনেক করিয়া থাকে। সেইজন্য এই দফায়ও অনেক বিল লণ্ডনে চলিয়া থাকে। আবার টাকাকড়ির বাজারে লণ্ডনের ইজ্জৎ খুব বেশী বলিয়া লণ্ডন-বিলের দরও অধিক। তাই আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাল আমদানী করিয়া, লণ্ডনে উশুলী-দেয় বিল কিনিয়া অষ্ট্রেলিয়ার পাওনা মিটায়।

বিনিময়-হার ওঠা-নামায় ব্যাঙ্কের হাতও যথেষ্ট আছে। বিল কেনা-বেচা, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের একটা মস্ত ধান্ধা; তাহার কারণ বিল যে সময় লেখা হয়, বিলের টাকাটা তাহার কয়েক মাস পরে প্রাপ্য হয় বলিয়া ঐ কয়েক মাসের সুদ ব্যাঙ্কের লাভ হয়। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। ধরা যাক্, প্যারিসের কোন ব্যাঙ্ক তিনমাস মেয়াদী, লণ্ডনে উশুলী-দেয় বিল কিনিয়াছে; এই বিলের জন্য ঐ ব্যাঙ্ক মূল্য দিবে—

পাউণ্ড ১০০০—০—০ পেঃ

বাদ ১২—১০—০ = সুদ ৫%

পাঃ ৯৮৭—১০—০ = ২৫·৩৫ ফ্রাঁ হারে

এক মাস পরে যখন সুদের হার কমিয়া ৪% হইয়াছে, তখন যদি কেহ ঐ বিল ব্যাঙ্কের কাছ হইতে খরিদ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক চাহিবে—

পাউণ্ড ১০০০—০—০ পেঃ

বাদ ৬—১৩—৪

পাঃ ৯৯৩— ৬—৮ = ২৫·৩৫ ফ্রাঁ হারে

সুতরাং ব্যাঙ্কের মুনাফা হইতেছে পাঃ ৫—১৬—৮ পেঃ। ব্যাঙ্ককে যদি এমনিভাবে অনেকগুলি বিল বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে বিল প্রতি মুনাফার হার, কিঞ্চিৎ কম রাখিয়াও, বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ মুনাফা মারিবে।

"ট্র্যাভ্‌লিং লেটার্স অফ্‌ ক্রেডিট্‌" ও "সার্কুলার নোট্‌স্‌" প্রভৃতির প্রভাবও বড় কম নয়। বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইলে ব্যাঙ্কের দারস্থ হইতে হয় —ব্যাঙ্ক "লেটার অফ ক্রেডিট" (ক্রেডিট্‌ পত্র) বা "সার্কুলার নোট" দেয়—এইগুলি ভাঙ্গাইয়া বিদেশে, চল্‌তি-টাকাকড়ি পাওয়া যায়। যে-সব দেশে যাত্রী চলাচল বেশী, সেই-সব দেশে এই সব লেটার অফ ক্রেডিট বেশী দেখা দেয়। বিদেশযাত্রীর ক্রেডিট্‌-পত্র ভাঙ্গাইবার পর, সেই ক্রেডিট-পত্র ঘুরিয়া আবার স্বদেশী ব্যাঙ্কে আসিয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, "লেটার অফ্‌ ক্রেডিট্‌", "সার্কুলার নোট" প্রভৃতির সহিত "বিল অফ এক্সচেঞ্জের" বিশেষ কোন পার্থক্য নাই ; অতএব বিদেশের পাওনা এই সব "ক্রেডিট্‌ ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট" খরিদ করিয়াও মিটানো চলে এবং সেই অনুপাতে বিনিময়-হারেরও ব্যতিক্রম হয়।

"আর্বিট্রেজ অপারেশনের" জন্যও বিনিময়-হার ওঠা-নামা করে। "আর্বিট্রেজ" বড় জটীল ব্যাপার। সহজ কথায় "আর্বিট্রেজ বলিতে এই বুঝায় যে, যে-সময় একটী ষ্টক-এক্সচেঞ্জে কেনা বা বেচা হইতেছে, ঠিক্ সেই-সময়ে বা অনতিকাল পরে সেই-পরিমাণের ষ্টক বা শেয়ার অপর কোন ষ্টক-এক্সেচেঞ্জে পুনঃ-বিক্রয় বা পুনঃ-ক্রয় হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট ষ্টক লইয়াই বেশী ভাগ 'আর্বিট্রেজ' কাজ চালান হয়.....তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, সোণা-রূপা, মুদ্রা বা বিল লইয়াও আর্বিট্রেজ করিয়া থাকে এবং সেজন্য বাজারের সামান্য ওঠা-নামার উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া বলি। ধরা যাক্, একজন ষ্টকের দালাল সুযোগ দেখিয়া লণ্ডন হইতে প্যারিসে তার করিল বন্ধুর কাছেঃ "কি হারে তুমি ১০,০০০ পাউণ্ডের চেক্ লিখিতে পার? টাকা লণ্ডনে পাওয়া চাই।" বন্ধু তাহার জবাব দিল যে "২৫·২০"। সে সময়ে কিন্তু লণ্ডনে ২৫·১৬ ফ্রাঁ বদলে এক পাউণ্ড পাওয়া যায়; অতএব ২৫·২০ ফ্রা=১ পাউণ্ড হারটা লণ্ডনের দালালটীর পক্ষে অনুকূল। সুতরাং সে লিখিল "চেক্ কাট" এবং ঐ ফরাসী বন্ধুটীও তখন ১০,০০০ পাউণ্ডের একখানি চেক্ লিখিয়া প্যারিসবুর্সে (এক্সচেঞ্জে) ২,৫২,০০০ ফ্রাঁতে (১ পাঃ=২৫·২০ ফ্রাঁ হারে ১০,০০০ পাঃ) বিক্রয় করিবে। আবার ঠিক্ সেই একই সময়ে, লণ্ডনের দালালটীও প্যারিসের উপর ২,৫২,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের একটী হুণ্ডী লিখিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লণ্ডনে ২৫·১৬ ফ্রাঁ=১ পাঃ; সুতরাং লণ্ডনের ক্রেতাটীকে ২,৫২,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের হুণ্ডীটীর জন্য ১০,০১৫ পাঃ ১৮ শিঃ দিতে হইবে। অতএব যখন প্যারিস হইতে ১০,০০০ পাউণ্ডের চেক্‌খানা, লণ্ডনে দালালটীর কাছে পাওনা মিটাইবার

জন্য আসিবে, তখন ঐ ১০,০০০ পাউণ্ড উণ্ডল দিয়াও তাহার হাতে ১৫ পাউণ্ড ১৮ শিঃ থাকিবে। দুইটী দেশের বিনিময়-হার অসমান থাকায় অনেকেই এইরূপে কিছু মুনাফা করিতে চেষ্টা করিবে এবং ফলে দুই দেশেই বিনিময়-হার সমান হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেক ক্ষেত্রে পাওনা মিটানোর সময় সোজাসুজিভাবে, মহাজন দেশের উপর লেখা হুণ্ডী না কিনিয়া, তৃতীয় একটী দেশের উপর লেখা হুণ্ডী কিনিয়া পাওনা-মিটানো, সস্তা হইয়া দাঁড়ায়—এইরূপ বক্রভাবে আর্বিট্রেজ চালানোকে "সার্কুইটাস্ আর্বিট্রেজ" বলে। যেমন, লণ্ডন হইতে প্যারিসে টাকা পাঠাইতে হইবে। সোজাসুজি প্যারিসের বিল্ কিনিয়া পাঠানো চলে; অথবা বেলজিয়াম বা ইটালীর বিল কিনিয়াও টাকা প্যারিসে শোধ দেওয়া যায়। ব্যাপারটা একটু জটীল। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। লণ্ডনের কোন বণিককে প্যারিসে টাকা শোধ দিতে হইবে। তাহার পক্ষে কোন্ পথটী লাভজনক? সোজাসুজি প্যারিসের বিল কিনিয়া পাঠান, না, লণ্ডন হইতে ভেনিস্, ভেনিস্ হইতে হ্যামবুর্গ, এবং হ্যামবুর্গ হইতে প্যারিসে পাঠান? বিনিময় হার এইরূপ: ১ পাঃ=২৪·৬ ফ্রাঁ; ১৯ ফ্রাঁ=১০ হাম্‌বুর্গ মার্ক; ১ মার্ক=৪ লিরা ভেনিসের; এবং ৫৫$\frac{১}{৪}$ লিরা=১ পাউণ্ড। প্রথমে সমস্যাটী জটীল মনে হইতে পারে কিন্তু "চেন্-রুলের" সাহায্যে সহজেই দেখা যাইবে যে—

ফ্রাঁ = ১ পাঃ

১ পাঃ = ৫৫$\frac{১}{৪}$ লিরা

৪ লিরা = ১ মার্ক

১০ মার্ক = ১৯ ফ্রাঁ

$$\therefore \quad ১ \text{ পাঃ} = \frac{২২১ \times ১৯}{৪ \times ৪ \times ১০} = ২৬·২৪ \text{ ফ্রাঁ}$$

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সাকিটাস্ এক্সচেঞ্জের ফলে ১ পাউণ্ডের বদলে ২৬·২৪ ফ্রাঁ পাওয়া যাইতেছে; অথচ সোজাসুজি বিনিময় হার হইতেছে ১ পাউণ্ডের বদলে ২৪·৬ ফ্রাঁ; অতএব বক্রভাবেই টাকা পাঠান লাভজনক।

বিনিময়-হারের উপর ষ্টক্-এক্সচেঞ্জের প্রভাব বর্ত্তমান। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে যখন টাকা প্রচুর পরিমাণে জমিয়া উঠে, তখন বিদেশে টাকা খাটানোর চেষ্টা চলিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক ও ষ্টক-এক্সচেঞ্জ এবিষয়ে অগ্রণী। অনেক ষ্টক ও শেয়ারকে আন্তর্জ্জাতিক ইজ্জৎ দেওয়া হয়। সুতরাং এইসব ষ্টক বা শেয়ারের দর, স্বল্প-মাত্রও ওঠা-নামা করিলে, কেনা-বেচার হিড়িক পড়িয়া যায় এবং এইসব সিকিওরিটির মূল্য শোধ দেওয়ার জন্য চেক্, বিল্, হুণ্ডী প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়া যায়, ফলে বিনিময় হারের অদল-বদল হয়।

বৈদেশিক ঋণের ফলেও বিনিময়-হার ওঠা-নামা করে। লণ্ডন বিদেশীকে ঋণ দিতে ওস্তাদ্—আজকাল যুক্তরাষ্ট্র সে স্থান অধিকার করিতেছে। ধরা যাক্, লণ্ডনের নিকট ভারতবর্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়াছে; এই ঋণের টাকা লণ্ডনকে যেমন করিয়াই হৌক ভারতে পাঠাইতে হইবে; সুতরাং বিনিময় হার লণ্ডনের প্রতিকূলে হইবে।

দেশ-বিদেশের চলৎ-সিক্কার উপরও বিনিময় হার নির্ভর করে। তবে যদি একটী দেশের চলৎ-সিক্কা স্বর্ণনির্ম্মিত ও অপর একটী দেশের সিক্কা রৌপ্যনির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে হিসাব করিয়া বিনিময়-হার বলা চলে না; এরূপ ক্ষেত্রে বিনিময়-হার নির্ভর করে সোণার তুলনায় রৌপ্যের বাজারদরের ওঠা-নামার উপর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিল ভাঙ্গান

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে বিনিময়-হার বা রেট্ অফ্ এক্সচেঞ্জ, যদি 'স্বর্ণ-বিন্দু' বা গোল্ড-পয়েণ্ট পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকে, তাহা হইলে আমদানীকারক বিল ক্রয়-করার পরিবর্ত্তে সোণা পাঠাইয়াই দেনা পরিশোধ করিয়া থাকে অথাৎ বিনিময়-হার স্বর্ণ-বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিলে ব্যাঙ্কের তহবিলে টান পড়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। লোকে তখন ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে সোণা উঠাইয়া বিদেশে রপ্তানীকারককে আমদানী-করা পণ্যের মূল্য বাবদ্ পাঠাইয়া দেয়। ব্যাঙ্কের তহবিলের মজুত সোণা এইরূপে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইতে থাকিলে, অচিরেই দেশের টাকাকড়ির বাজারে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সোণার বহির্নিষ্কাষণ রোধ করিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখা দরকার। **তহবিলের সোণার পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার দুইটী উপায় আছে**—(১) তহবিল হইতে যাহাতে সোণা বাহির করিয়া দিতে না হয় তাহার উপায় করা আর (২) বিদেশ হইতে স্বদেশের ব্যাঙ্কে সোণা আসিয়া জমিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া। এই দুইটী সাধিত করিবার সহজ উপায় হইতেছে "ডিস্কাউণ্ট রেট্" বা "বিল ভাঙ্গানর বাট্টা" নিয়ন্ত্রিত করা; সুতরাং বিল ডিস্কাউন্টীং বা ভাঁঙ্গান বলিতে কি বোঝায় তাহা জানা আবশ্যক।

বহির্ব্বাণিজ্যের নানা কাজ চালাইবার জন্য বিশেষ একপ্রকার

কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক আবশ্যক। বিদেশে মাল-রপ্তানী করিবার ব্যবসার সমস্যা নিম্নরূপ। প্রথমতঃ দরকার মাল পাঠাইবার জন্য নগদ টাকা। বিদেশী খরিদ্দারেরা কয়েক মাস পরে টাকা সমঝাইয়া দিবে। কিন্তু রপ্তানীকারকেরা ততদিন বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ফ্যাক্টরী বা আড়ৎ বা বন্দর হইতে মাল ছাড়িবা মাত্রই কাঁচা টাকা হাতে-হাতে চায়। তাহাদিগকে এই টাকা দিবার জন্য দেশী ব্যাঙ্কের সাহস থাকা দরকার। রপ্তানীকারকেরা যদি হাতে-হাতে টাকা না পায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ফ্যাক্টরী চালান সুকঠিন। ব্যাঙ্ক, রপ্তানীকারককে এই নগদ্ টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করে। ব্যাঙ্ককে এই টাকা সমঝাইয়া দেয় বিদেশী খরিদ্দার। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বেপারীদিগের নিকট "বাণিজ্য-কাগজ" লইয়া মালের বন্ধকীতে টাকা আগাম দেয়। ব্যাঙ্কের এই সকল "বাণিজ্য কাগজ" কেনাকেই 'ডিস্কাউণ্ট্ করা' বা বিল ভাঙ্গান বলে।* মালের রসিদ্ পত্র দেখাইয়া টাকা আগাম লইবার সময় ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারকের নিকট হইতে বাট্টা আদায় করিয়া লয়। বিল বেচিতে গেলে ব্যাঙ্ককে যে বাট্টা দিতে হয়, তাহাকে পারিভাষিকে বলে 'ডিস্কাউণ্ট রেট্।' বিলের দর্শনী-মূল্যের উপর শতকরা একটা বার্ষিক-হারে এই বাট্টা আদায় করা হয়। 'বাণিজ্য কাগজ' বা বিল সাধারণতঃ তিন মাসের মধ্যেই দেয় হইয়া উঠে; তাই বাট্টা হিসাবে খুব অল্প টাকাই বিক্রেতাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তিন মাসের মেয়াদী ১০০০ টাকা বিলের জন্য ব্যাঙ্ক যদি শতকরা ৫ টাকা বাট্টা আদায় করে তাহা

* বিনয় সরকারের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রথম ভাগ (১৯৩০) ১৬৫ পৃঃ।

হইলে, ব্যাঙ্ক মোট ১২৷৹ টাকা কাটিয়া লইয়া ৯৮৭৷৹ টাকা বিল বিক্রেতাকে দিবে। বিল-বিক্রেতা সাধারণতঃ এই টাকাটা নগদ্ না লইয়া, নিজের নামেই ব্যাঙ্কের হিসাব-খাতায় জমা করাইয়া লয়; পরে দরকার মত চেক্ কাটীয়া টাকা উঠায়। সুতরাং বিল ভাঙ্গাইয়া দিয়া ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট ছাড়িলেও (বা কর্জ্জ দিলেও) ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে টাকাটা বাহির হইয়া যায় না, তহবিলেই জমা থাকে।

বাট্টার হার বাড়াইলে ব্যাঙ্কের মুনাফা বাড়ে; কিন্তু লাভ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্ক বাট্টার হার বাড়ায় না——কর্জ্জের পরিমাণ কম করিয়া আনিবার জন্যই বাট্টার হার বাড়ান হয়। সাধারণতঃ বড় বড় বেপারী বা কারখানার মালিকগণই ব্যাঙ্কের কাছ হইতে বিল ভাঙ্গাইয়া টাকা কর্জ্জ লয়। বড় বড় কারবারের দস্তুরই হইতেছে সামান্য মুনাফায় প্রচুর মাল বিক্রয় করা; সুতরাং বাট্টার হার যদি সামান্য বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, এইসব কর্জ্জগ্রহীতা বড় বড় বেপারীদের মুনাফার মাথায় ঘা পড়ে—ঐ বাড়ান (ইন্‌ক্রিস্‌ড্) বাট্টা দিতে গেলে আর মুনাফা করা যায় না; সুতরাং তাঁহারা বিল ভাঙ্গাইতে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে চান না। অতএব **বাট্টার হার বাড়িলে, ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়া কমিয়া যায়।**

যে-সব দালাল, ষ্টক্ ও বণ্ড কেনা-বেচায় মোতায়েন আছেন, তাঁহারা সিকিউরিটীর দরের হের-ফেরের উপর নির্ভর করিয়াই কেনা-বেচা করেন। ইঁহারাও সিকিউরিটী জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের কাছ হইতে টাকা কর্জ্জ লয়েন। বাট্টার হারের সামান্য-মাত্র উঠ্‌তিতে ইঁহাদের মুনাফার পরিমাণ লোপ পাইবার জোগাড় হয়—তাই কর্জ্জ লইবার পরিমাণও কমিয়া আসে। অধিকন্তু, চাপে পড়িয়া ব্যাঙ্ক যখন বাট্টার হার বাড়াইয়া দিয়াছে, তখন সিকিউরিটীর উপর যে টাকা

ব্যাঙ্ক ইতঃপূর্ব্বেই দালালদিগকে কর্জ্জ দিয়াছে, তাহাও দাবী করিয়া বসে। এইভাবে ব্যাঙ্কের তহবিলে আগের টাকা জমিতে থাকে।

বাট্টার হারের ওঠা-নামার উপর, একদেশ হইতে আর একদেশে সোণা-রূপার যাতায়াত নির্ভর করে। বাট্টার হার বাড়িলেই বুঝিতে হইবে যে, সোণা-রূপার ইজ্জৎ বাড়িয়া গিয়াছে—ক্রেডিট্ পত্র দিয়া কাজ চালান আর সুবিধাজনক হইতেছে না, সোণা-রূপা রপ্তানী করাই সুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। বার্লিনে বসিয়া যদি দেখা যায় যে, লণ্ডন কি নিউইয়র্কে বাট্টার হার ৬% পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, অথচ বার্লিনে বাট্টার হার ৪% রহিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হাতে সোণা থাকিলে, লণ্ডন বা নিউইয়র্কে খাটাইয়া তাহা হইতে বেশী মুনাফা করা যাইবে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, চাহিদার তুলনায় বার্লিনে, অপর দুইটী সহর অপেক্ষা, অধিক সোণা আছে। যোগানের অপ্রতুলতার জন্যই লণ্ডন বা নিউইয়র্কে সোণার দর বাড়িয়াছে; তাই বার্লিন হইতে সোণা রপ্তানী হইয়া আসিয়া যোগানের এই অপ্রতুলতা দূর করিবে। টান-যোগানের এই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া ব্যাঙ্ক, বাট্টার হার বাড়াইয়া তহবিলের সোণার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখে। অধিকন্তু, অনেক সময়ে সোণা রপ্তানীও বন্ধ হইয়া যায়। ধরা যাক্, কোন প্যারিস ব্যাঙ্কের নিউইয়র্কে ১,০০০,০০০ ডলার জমা আছে; নিউইয়র্ক শাখা অফিস তাহা প্যারিসে চালান দিবার ব্যবস্থা করিতেছে; এই সময়ে প্যারিসের হেড্ অফিসে খবর আসিল যে নিউইয়র্ক সহরে বাট্টার হার চড়িয়াছে। তখন এই সুযোগে কিছু মুনাফা মারিবার আশায় প্যারিস্ ব্যাঙ্ক, শাখা ব্যাঙ্ককে সেই টাকা চড়া বাট্টার হারে কর্জ্জ দিতে আদেশ দিবে। অতএব বাট্টার হার চড়া

হইলে শুধু বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে সোণা আমদানীই হয় না, রপ্তানীও বন্ধ হয়। কোন এক স্থান বায়ুশূন্য (ভ্যাকুয়াম) হইলে যেমন চতুর্দ্দিকের বাতাস ছুটিয়া আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে তেমনি, যেদেশে বাট্টার হার চড়া হয়, অন্যান্য দেশ হইতে সেই দেশে সোণা আসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সোণারূপার টান-যোগানের মধ্যে সমতা দেখা দেয়।

ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা "বাণিজ্য কাগজ" লইয়া মালের বন্ধকীতে টাকা আগাম ছাড়ে। এই সকল কাগজ কিনিয়া বা ডিস্‌কাউণ্ট করিয়া ব্যাঙ্ক-গুলি ত' আর বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য বাণিজ্য-কাগজগুলি আবার বেচিবার বা রি-ডিস্‌কাউণ্ট করিবার ব্যবস্থা করে। এইরূপে আবার-বেচিবার শেষ আড্ডা হইতেছে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক। স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলির বাঁচন সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট-নীতির উপর নির্ভর করে। বিগত তিন চার বৎসর ধরিয়া (১৯২৩-২৫) দুনিয়ার মুদ্রা-দক্ষেরা ডেনমার্কের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মকৌশলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন। এই কর্ম্মকৌশলটা অন্যান্য সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের পক্ষে আদর্শ-স্বরূপ এবং অনুকরনীয়—এই মত ব্যাঙ্কার মহলে আজকাল সুপ্রচলিত। বিনিময়ের হারকে ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং শিল্প-কারখানার ওঠানামার সঙ্গে সমান রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া ভেনিস্ সেণ্ট্র্যাল্ ব্যাঙ্কের এত তারিফ। দুই-তিন বৎসর যাবৎ ভেনিস্-মুদ্রা অনবরত ওঠা-নামা করিতেছিল। কিন্তু সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-কৌশলে এই ওঠা-নামার থাম-খেয়ালি বন্ধ হইয়াছে। অথচ আর্থিক জীবনের গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে মুদ্রা-বিনিময় হারের সমতা রক্ষিত হইয়াছে। ভারতে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন এই সব কৌশলের চর্চ্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়। *

*বিনয় সরকারের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রথমভাগ (১৯৩০) দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৬১

সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্কের বাট্টার হার, সমস্ত টাকাকড়ির বাজার শাসন করে। বাট্টার হার চড়া হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। টাকা কর্জ্জ লওয়া যাহাদের নিতান্ত আবশ্যক, তাহাদের চড়া সুদ দিতে হয়; শুধু তাই নয়, কর্জ্জ পাওয়াও দুষ্কর হইয়া পড়ে। বাট্টার হার চড়া হইতে দেখিলে, অন্যান্য ব্যাঙ্ক দুঃসময়ের আভাষ পাইয়া তহবিলের কোমর শক্ত করিবার জন্য বাট্টার হার চড়াইয়া দেয় ও আমানত টাকার জন্য চড়া সুদ কবুল করিয়া টাকা টানিতে চেষ্টা করে। যে সব বেপারীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, ইহার ফলে তাহাদিগকেই প্রথম আঘাত সহ্য করিতে হয় ও দেউলিয়া লইতে হয়। একজন দেউলিয়া হইলে আর পাঁচজনকে পথে বসাইয়া যায়; প্রত্যেক ব্যবসাদারই তখন একটু শঙ্কিত হইয়া পড়ে ও সকলকেই একটু সন্দেহের চোখে দেখে, কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। বিশ্বাস—যাহার উপর সমস্ত বাণিজ্য জগৎটা চলিতেছে—ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতে থাকে। ব্যবসাদার, বণিকরা তখন কারবার করিতে গেলেই আগে টাকা চাহিয়া বসে...ক্রেডিটে মাল ছাড়িতে চাহে না···যাহাকে মাল বেচিতেছে তাহাকে যেন ঠিক্ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ক্রমশঃ এই দুর্য্যোগ বাড়িতে বাড়িতে দেখা যায় কোন একটী ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া বসিল। একটা ব্যাঙ্ক ফেল করিলে লোকে অন্যান্য ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া উঠে। অনেক সময়ে কাণাঘুসা শুনিয়া লোকে আতঙ্কে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আরম্ভ করে ও ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়। এই-ভাবেই বাণিজ্য-জগতে দুর্য্যোগ দেখা দেয়। এই দুর্য্যোগের ফলে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের উপর খুব বেশী চাপ পড়ে। কর্জ্জ দেওয়ার কাজটা

পুরাপুরীই সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ককে করিতে হয়, অথচ যে-সব ব্যাঙ্ক বা প্রতিষ্ঠানের কাছ হইতে সাধারণতঃ টাকা আমানত পায়, তাহা পাইবারও উপায় থাকে না। এই সময় সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক যদি অবাধে টাকা দিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে অচিরে আবার টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে ফিরিয়া আসিতে থাকে। এইজন্যই সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মকৌশল নির্ভুল হওয়া আবশ্যক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রূপার বাজার

টাকাকড়ির জগতে রূপার স্থান আজও খুব উঁচু। অতএব রূপার বাজার সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। অধিকন্তু রৌপ্যসমস্যা ভারতে লাগিয়াই আছে।

সম্প্রতি রূপার দর আকস্মিকভাবে চড়িতে দেখিয়া সাধারণের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, এরূপ হইবার হেতু কি এবং তাহা এদেশের পক্ষে অমঙ্গলকর কিনা। প্রশ্নটা একটু বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাক্। এক কথায় বলা যায় যে, রূপার দর চড়া হওয়ার জন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের (কারেন্সী) সিক্কানীতি। রুশভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার হইবার পর হইতে সিক্কা সম্বন্ধে যে অভিনব নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে দুনিয়ার সকল দেশের সিক্কার মধ্যে একটা গোলমাল সৃষ্টি হয়। সোণার দর চড়িয়া যাওয়ার ফলে যে কি পরিমাণ সোণা ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে বা হইতেছে তাহা আমরা সংবাদ পত্রের মারফৎ দেখিয়াছি। এখন আবার রৌপ্যনীতির (পলিসির) জন্য রৌপ্যের বাজারে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে।* পয়লা মার্চ্চ (১৯৩৫) নাগাদ বিলাতে ১ আউন্স রূপার দর ছিল ২ শিলিংএর কাছাকাছি, আর এপ্রিলের শেষে তাহা হইয়া দাঁড়ায় ৩ শিলিং অর্থাৎ মাত্র ৭।৮ সপ্তাহের ভিতর ১ শিলিং দর বাড়িয়া যায়। আর এই বোম্বাইএর বাজারে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০০ তোলা রূপার দর ছিল ৬৭৸০; মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৮৭ টাকা পর্য্যন্ত দর ওঠে অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে ২০ টাকা

* ১৯৩৫ সালে রূপার বাজারে গণ্ডগোল লক্ষ্য করিয়া সেই সময়ে লেখা।

দর চড়িয়া যায়। ১১ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঘোষণা করেন যে তাঁহারা রূপার দর (খাদ কেটে নতুন বার করা বা 'নিউলি মাইণ্ড শিল্‌ভার') আউন্স প্রতি ৭১ সেণ্ট দিবেন; রূপার দর কিন্তু তখন আমেরিকার বাজারে ছিল ৬২½ সেণ্ট, কি তারই কাছাকাছি—অর্থাৎ বাজার দর অপেক্ষা চড়া দর দিয়া রূপা ক্রয় করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রে রূপার খনি আছে; এই খনির মালিকদের প্রতাপও কম নয়। তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যে খুব লাভজনক তা বলাই বাহুল্য। যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; একথাও বলিলেন যে, দুনিয়ার বাজারে যদি রূপার দর ইহা অপেক্ষা চড়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও অধিকতর চড়া দর দিবেন। এরূপ একটা আশা দিলে যাহারা ফট্‌কা খেলে তাহাদের প্রলোভিত করা হয়। সেই হেতু যুক্তরাষ্ট্র যখন দুনিয়ার বাজারের দরের সহিত তাল রাখিয়া যাইবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন রূপার দর কতদূর পর্য্যন্ত উঠিবে বলা শক্ত। বোম্বের বাজারে যখন রুশভেল্ট-গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পৌঁছিল, তখন ১০০ তোলা রূপার দর ৬৯ টাকা হইতে একেবারে ৭১ টাকায় লাফাইয়া উঠিল এবং রূপা কেনা-বেচাও জোর্‌সে হইল। শুধু যে ভারতের বাজারেই দর চড়িয়া ছিল তাহা নহে; লণ্ডনের বাজারেও দর যথেষ্ট উঠিয়াছিল। দর এইভাবে ফটকা খেলোয়াড়দের হাতে পড়িয়া ৭৮ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। ২৪শে এপ্রিল অর্থাৎ প্রথম ঘোষণার মাত্র ১৫ দিন পরে আমেরিক্যান ট্রেসারী জানাইলেন যে, তাঁহারা রূপার দর আউন্স-প্রতি ৭৭'৫৭ সেণ্টস্ দিবেন। ১৫ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৬½ সেণ্ট অধিক দর দিতে স্বীকৃত হইলেন। ফলে লণ্ডনের দর ৩৬½ পেন্স (আউন্স প্রতি) পর্য্যন্ত এবং বোম্বেতে ৮৭ টাকা (১০০ তোলা প্রতি) পর্য্যন্ত ওঠে। কিন্তু তাহার পর দর

পড়িতে থাকে। আমেরিকা যদিও রূপার জন্য চড়া দর দিতে চাহিয়াছে, তবু দুনিয়ার বাজারে রূপা কিনিতে দেখা যাইতেছে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের আসল মতলবটা কি তাহা ধরা যাইতেছে না। যুক্তরাষ্ট্র আরও চড়া দর দিতে রাজি হইবে কিনা বোঝা যাইতেছে না। যুক্তরাষ্ট্র চড়া দর দিয়া রূপা ক্রয় করার জন্য ইংলণ্ডের পরোক্ষে লাভ হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ব্রিটীশ পণ্য সে দেশে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, অথচ আমদানীর জন্য দাম দিতে হইতেছে। রূপা যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতেছে এবং তাহার জন্য প্রায় ৫০% মূল্য বেশী দিতেছে। এই এ বৎসরই ৭৭,৫০০,০০০ আউন্স পরিমাণ রূপা ইংলণ্ড হইতে ৮,৬১৯,০০০ পাউণ্ড দর দিয়া লইয়াছে; গত বৎসরের মূল্য ধরিলে ঐ পরিমাণ রূপার দর ৬,৭২০,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। সুতরাং এই দিক দিয়া সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সিক্কানীতি চীনদেশকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। সেখানকার লিগ্যাল টেণ্ডার কারেন্সী হইতেছে রূপা। রুশভেল্ট নীতির ফলে চীন হইতে প্রচুর পরিমাণে রূপা বাহির হইয়া গিয়াছে।

চাইনিস্ মেরিট্যাইম্স্ হিসাব অনুসারে—

অগাষ্টে	...	...	৭৯,০৯৫,০০০ ইউয়ান্
সেপ্টেম্বরে	...	...	৪৮,১৪০,০০০ ,,
অক্টোবরে	...	...	৫৩,৩৩২,০০০ ,,
নভেম্বরে	...	...	১১,৩২৭,০০০ ,,
ডিসেম্বরে	...	...	১১,৯৭৫,০০০ ,,

রূপা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে এবং শাংহাই-এর রূপার ষ্টকও কমিয়া গিয়াছে। হ্যাণ্ডি ও হারম্যান হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ১৯৩৪ সালে ২০০,০০০,০০০ আউন্স পরিমাণ রূপা চীন হইতে বিদেশে গিয়াছে। সুতরাং পণ্যের দর পড়িয়া গিয়া চীনা-অধিবাসীদের যে কিরূপ দুঃখের

মধ্যে ফেলিয়াছে তাহা আঁচ করা যায়। রূপার বহির্গমন রোধ করিবার জন্য চীন ১৫ই অক্টোবর এক আইন জারি করেন। কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। তথাপি লোকে রূপার অলঙ্কারাদি গলাইয়া অবৈধ উপায়ে রূপা বিদেশে চালান দিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার এই নীতি বর্জ্জন করিবার আবেদন-নিবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। কিন্তু চীনের এই অবস্থায় জাপানের হইতেছে কিছু সুবিধা। ইংল্যণ্ডের নিকট টাকা ঋণ চাহিয়া চীন পায় নাই, জাপান দিয়াছে সেই টাকা; এই ভাবে জাপান তাহার আধিপত্য চীনে বিস্তার করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় রুশভেল্টের রূপা ক্রয়ের এই নতুন ফতোয়া চীনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। চীনের সকল আবেদন বধির যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। চাইনিস্ এক্স্‌চেঞ্জ যে ভাবে উঠিতেছে যদি আরো ওঠে, তাহা হইলে পণ্যের দর আরো পড়িয়া গিয়া জনসাধারণের ক্রয়শক্তি আরো কমাইয়া দিবে এবং ফলে চীনাদের দুরবস্থা যে কি হইবে তাহা কল্পনা করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির ফল মেক্সিকোকেও ভুগিতে হইতেছে। মেক্সিক্যান্ গভর্ণমেণ্ট বাজার হইতে সকল রৌপ্য-মুদ্রা সরাইয়া লইয়াছেন এবং তাহার বদলে ছাড়িয়াছেন কাগজী-মুদ্রা; আর এই কাগজীমুদ্রার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছেন তামা। রূপার দর যেরূপ চড়িতেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইতেছিল, তাহাতে পেসস্ (মেক্সিকোর রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ) গলাইয়া বিক্রয় করা লাভজনক দাঁড়াইতেছিল, তাই রৌপ্য-রপ্তানী রোধের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তনের জন্য ইঁহারাও আবেদন জানাইতেছেন।

ভারতে রূপার টাকা চলিলেও চীনের সিক্কা হইতে একটু তফাৎ

আছে। চীনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইল রূপা অর্থাৎ বিদেশে যখন পাওনা মিটাইতে হয় তখন এই রূপাকে আদর্শ ধরিয়াই করিতে হয়, কিন্তু ভারতের হইল গোল্ড এক্সচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড। তাই রূপার বিপর্য্যয়ে চীনের অসীম ক্ষতি। ভারত, রূপার একজন বড় খরিদ্দার; সুতরাং প্রচুর রূপা মজুত আছে। রূপার দর চড়িলে যথেচ্ছা পরিমাণ রূপা বিক্রয় করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নহে, কেননা ১৯৩৩ খৃঃ যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক বৈঠক (ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্ কন্‌ফারেন্স) বসিয়াছিল তাহাতে স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কতটা পরিমাণ রূপা ভারত বেচিতে পারে; সুতরাং রূপা-বেচার বাজারে নামিয়া ভারতের দিশাহারা হইবার সম্ভাবনা নাই॥ পক্ষান্তরে চড়া-দরের সুবিধা ভোগ সে বেশ সহজেই করিতে পারিবে। বহু গরীব লোকে রূপা বেচিয়া (অবশ্যই অলঙ্কারাদি) কিছু টাকা করিবে, অথচ রপ্তানীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া দেশে রূপার খাঁকৃতি হইবে না। বিনিময়-হার উচ্চমাত্রা (আপার লিমিট্) ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেছেন কিন্তু তাহার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না, যেহেতু 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪১ প্যারায় আছে "লণ্ডনে পাওনা মিটানোর জন্য যে-কেহ বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ বা রেঙ্গুনের আপিসে দাবী করিবে, ব্যাঙ্ক তাঁহাকে টাকা-প্রতি অনধিক পক্ষে ১ শিঃ ৬$\frac{৩২}{৩২}$ পেঃ দিবেন।" তবে একটা কথা। রুশভেল্ট নীতির ফলে যদি রূপার দর আউন্স প্রতি ৪ টাকা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে, লোকে রূপা গলাইতে সুরু করিবে, যেহেতু তখন রূপার দর্শনী-মূল্য (ফেস্‌ভ্যালু) অপেক্ষা আভ্যন্তরিক মূল্য (ইন্‌ট্রিন্‌সিক ভ্যালু) অধিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং টাকা গলাইয়া রূপা হিসাবে বিক্রয় করা অধিক লাভজনক হইবে। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কারেন্সী ষ্টেবিলাইজেশন বা সিক্কা স্থিতিকরণ

একমাত্র রূপার বাজারই নয়,—টাকাকড়ি মাত্রই আন্তর্জ্জাতিক সূত্রে পরস্পর গাঁথা।

গত মহাযুদ্ধের পর টাকাকড়ির বাজারে একটা তুমুল গণ্ডগোল হয় এবং তার ফলে যে-সব-দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তারা তা' ত্যাগ করে; দেশের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হলে তারা আবার স্বর্ণমান গ্রহণ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগ দেখা দেবার পূর্ব্বে অর্থতত্ত্ব-বিশারদ্‌দের (ফাইন্যান্‌সিয়াল এক্‌স্‌পার্টস্) মনে এই ধারণা বলবতী হয়ে উঠছিল যে, কারেন্সী বা সিক্কার গণ্ডগোল এতদিনে চুকে গেল। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তা' প্রমাণ হয়ে গেল যখন ১৯৩১শের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডকে আবার স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয় এবং ইংলণ্ডের দেখাদেখি আরও অনেক দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে। যে-দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণের সময় সোণার তৈরী মুদ্রাগুলিকে মান ধরা হয়, সে-দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত আছে বুঝতে হবে। স্বর্ণমান দেশের মধ্যে প্রচলিত রাখতে হলে দুটী সর্ত্ত পূরণ করা চাই (১) যে-কেহ সোণার তাল টাকশালে জমা দিয়ে মুদ্রা তৈরী করিয়ে নিতে পারবেন আর (২) যে-কেহ দেশের চল্‌তি-মুদ্রা জমা দিয়ে নির্দ্দিষ্ট হারে সোণার তাল পেতে পারেন। স্বর্ণমান ত্যাগ করার অর্থ, দেশের রাষ্ট্র আর চল্‌তি মুদ্রার বিনিময়ে সোণার তাল দিতে বাধ্য রইলেন না। বিদেশে পাওনা

যখন মিটাতে হয়, তখন তা সোণা রপ্তানী করেই শোধ করতে হয়; সুতরাং স্বর্ণমান ত্যাগ করার ফলে এদিক থেকে অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ইউরোপ-আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল; তাই একদেশের মুদ্রা, অন্য দেশের কতটা পরিমাণ মুদ্রার সমান তা জানা ছিল; কিন্তু দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করাতে এক দেশের মুদ্রার বিনিময়ে আর এক দেশের মুদ্রা কতটা পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যাচ্ছে না; মুদ্রার বিনিময়হারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা এসেছে। তার ফলে হ'চ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি। কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। ধরা যাক্, কোন রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার বিলাতে ষ্টীল রেল কেন্‌বার অর্ডার দিয়েছে; বিলাতী কোম্পানী দর চাইল ৩০০ পাউণ্ড; ধরা যাক্ সে সময়ে ১৫৲ টাকার বদলে ১ পাউণ্ড পাওয়া যায়; তা'হলে এদেশের আমদানীকারকে ষ্টীল রেল কেনার জন্য দিতে হবে মোট (১৫×৩০০)=৪৫০০ টাকা। আমদানী-রপ্তানী কারবার সাধারণতঃ নগদ টাকায় হয় না; মাল ডেলিভারী নেবার হয়ত তিন মাস পরে এই ৩০০ পাউণ্ড চুকিয়ে দিতে হবে। এখন মনে করুন, এই তিন মাসের শেষে কণ্ট্রাক্টার দেখ্‌লে যে ২০৲ টাকা দিয়ে ১ পাউণ্ড কিন্‌তে হচ্ছে; সুতরাং ৩০০ পাউণ্ড পাওনা মিটানোর জন্য তাকে (২০×৩০০)=৬০০০ টাকা দিতে হবে। অতএব তার কোন ত্রুটী না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বিনিময় মূল্যের পরিবর্ত্তনের জন্য তাকে (৬০০০—৪৫০০)=১৫০০ টাকা ক্ষতি সহ্য কর্‌তে হবে। বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তা বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কেন একটার পর একটা দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে এই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে একটু আলোচনা করে দেখা যাক্। পূর্ব্বেই বলেছি যে

১৯২৯শে অর্থনীতিজ্ঞদের মনে এই দুর্য্যোগের আশঙ্কা দেখা যায় নি। তাঁরা ক্রমশঃ দেশের আর্থিক উন্নতিই হবে আশা করেছিলেন। দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেরূপ প্রসার সুরু হয়েছিল, তাতে গলদ্ যে কোথায় তা তাঁদের দৃষ্টির পথে পড়েনি। সমস্ত দুনিয়ার কথা ধর্‌লে, দেখা যায় যে, ১৯২৯শের পূর্ব্ব হ'তেই পণ্যের দরের মাত্রা বা 'প্রাইস্ লেভেল্' ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতে যে শঙ্কার কারণ আছে তা তখন মনে হয়নি, কেননা সে সময়ে উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল এবং তার ফলে উৎপাদনের যথার্থ্য (রিয়েল) খরচা কমে গেছ্‌ল; সুতরাং পণ্যের দর যে কম্‌বে তা আশাই করা যায়। কিন্তু, সব পণ্যের দর যে পড়েছিল তা নয়; কৃষিজ পণ্যের দরের তুলনায় কারখানা-জাত পণ্যের দর বিশেষ চড়া ছিল। কৃষিজ পণ্যের দর পড়ে যাওয়াতে কৃষকদের এবং যেসব দেশ প্রধানতঃ কৃষিজ পণ্য রপ্তানী করে, সেই সব দেশের ক্রয়-শক্তি কমে যায়। ফলে চড়া দরের কারখানাজাত পণ্য কেনবার লোক সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় কারখানাজাত পণ্য, বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে কারখানার কিছু পরিমাণ শ্রমিকের কাজে ইস্তাফা হ'ল। বেকারদের সাহায্য করবার ভার নিলেন গভর্ণমেণ্ট। যত বেকার বাড়্‌ল, তত সরকারী তহবিলে টান পড়্‌ল। কিন্তু সরকার আবার এ টাকা তুল্‌লেন ট্যাক্স ইত্যাদি নানা উপায়ে অর্থাৎ যারা কাজে রইল তাদের আয়ে ভাগ বসিয়ে; সুতরাং যারা কাজে নিযুক্ত রইল তাদেরও ক্রয়শক্তি কম্‌ল বই বাড়্‌ল না। এ দেখেও তখনও লোকের চোখ ফোটেনি; এই আশাই ছিল যে, এই দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, অচিরেই সুদিন আস্‌বে। আমেরিকায় যখন এইভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছিল, নেতারা তখন এটাকে "টেক্‌নলজিক্যাল্ আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" বলে উড়িয়ে

দিচ্ছিলেন অর্থাৎ যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ সাধনের ফলে কিছু লোক বেকার হয়েছে বটে, কিন্তু আবার তারা অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোন শিল্পে ঢুকে যেতে পারবে। এছাড়া মার্কিনদের মধ্যে ষ্টক্ কেনাবেচার নেশা ঢুকেছিল। ষ্টকের বাজারে শেয়ারের দর খুব চড়্তে দেখে সাধারণ লোকেও ষ্টক্ কিনে রাতারাতি বড়লোক হবার লোভ সামলাতে পারে নি। পণ্যের দর বাড়াতে পার্লে দেশের সবদুঃখ ঘুচবে, এই ছিল মার্কিণদের মত; ব্যাঙ্ক তাই উদারভাবে ক্রেডিট্ দিয়ে পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সব পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ করা সোজা নয়। যে-সব পণ্য বিদেশে রপ্তানী করতে হবে তার দর চড়া কর্তে চেষ্টা কর্লে আর বিদেশে বেচা চলে না। তূলা, গম প্রভৃতির দর তাই দুনিয়ার বাজারের দরের অনুবর্ত্তন করে। পণ্যের দরের জেনারেল্ লেভেল্ স্থির রাখ্তে হলে, কতকগুলো পণ্যের দর (যেমন তূলা, গম) যেমন পড়ে যায়, অন্য পণ্যের দর ঠিক্ সেই অনুপাতে চড়া করা প্রয়োজন। সুতরাং পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ চেষ্টার ফলে কাঁচামাল ও তৈরী মালের দরের বৈষম্য অধিকতর প্রস্ফুট হয়ে উঠ্ল। ফলে কাঁচামাল উৎপাদকের আয় কমে গেল বটে কিন্তু 'কষ্ট-অফ্ লিভিং' বা জীবন-যাত্রার খরচা কিছু কম্ল না বরং বেড়েই গেল। দর নিয়ন্ত্রণের ফলে যেটুকু লাভ হ'ল, তা' পুঁজিপতিদের, কলের মালিকদের। লাভের টাকাটা তাঁরা পণ্য খরিদ্ কর্তে ব্যয় না করে ষ্টক স্পেকুলেশনে লাগালেন; এইভাবে দর নিয়ন্ত্রণের টাকা শেষ পর্য্যন্ত লাগ্ল স্পেকুলেশনে। কোম্পানী লাভ কর্বে এই আশা করেই শেয়ারের দর বাড়ে; যখন স্পেকুল্েটাররা বুঝ্লে যে লাভ কর্বার আশা কমে আস্ছে, তখন হাতের শেয়ার বিক্রয় কর্বার জন্য কাতর হ'য়ে উঠল। ফলে ষ্টকের দর পড়্তে পড়্তে

আমেরিকার যে দুর্গতি হয়েছিল তা আমরা সবাই খবরের কাগজ মারফৎ জানি।

আমেরিকার এই দুর্গতির ফল ভুগ্‌তে হ'ল ইউরোপের দেশগুলিকে। আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলিকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিল; ইউরোপ সেই টাকায় নিজের দেশকে গড়ে তুল্‌ছিল। ঋণের যে সুদ তা প্রত্যেক বৎসর দিতে হচ্ছিল; কিন্তু সুদও দেওয়া চল্‌ছিল ধার করে। খাতকদেশ টাকা শোধ দেয় পণ্য বিক্রয় করে। কিন্তু আমেরিকার যে শুল্কপ্রাচীর তা ভেদ্‌ করা ইউরোপীয় খাতক দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতদিন যুক্তরাষ্ট্র টাকা ধার দিয়ে গেছে, ততদিন কোন গণ্ডগোল হয়নি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টক-মার্কেট-বুম্‌ কর্‌লে বিপদ। মার্কিণেরা যখন দেখলে যে, দেশের মধ্যে ষ্টকে টাকা লগ্নী করা অধিক লাভজনক, তখন তারা আর ইউরোপে টাকা খাটাতে চাইলে না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে টাকা আসা বন্ধ হওয়াতে সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হ'ল জার্ম্মাণীর। এই টাকা দিয়েই জার্ম্মাণী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের কিস্তি দিতে সক্ষম হচ্ছিল। তাছাড়া জার্ম্মাণীও মধ্যইউরোপের দেশগুলিকে টাকা ধার দিয়েছিল। ষ্টক-বাজারে দুর্য্যোগের পর যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপ থেকে টাকা তোলার হুজুক পড়ে গেল। মধ্য ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলির হ'ল বিপদ। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র টাকা তুলে নিচ্ছে, অন্যদিকে পণ্যের দর ক্রমশঃ পড়ে যাচ্ছে; স্বল্প মিয়াদে যে-সব টাকা ব্যাঙ্ক দিয়েছিল ধার, তাও আদায় হয় না; আর ব্যাঙ্ক যেখানে সিকিওরিটী রেখে টাকা ধার দিয়েছে, সেখানে সিকিওরিটীর দর নাম-মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রাপ্য টাকা আদায় কর্‌তে না পেরে তাদের হ'তে হ'ল সেণ্ট্র্যাল বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ। কিন্তু ইউরোপীয় সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কগুলি নির্ভর কর্‌ত

বিদেশের ঋণের উপর ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের টাকা আদায় কর্‌তে না পারায় বিদেশের পাওনা দিতে পার্‌ল না। বিদেশ থেকে টাকা না পাওয়ায়, অন্যান্য ব্যাঙ্ককে সাহায্য করাও সম্ভব হ'ল না।

এদিকে আবার পণ্যের দর পড়ে যাওয়াতে এবং বিদেশের চাহিদা কমে যাওয়াতে ইউরোপীয় দেশগুলির মোট-রপ্তানীর পরিমাণ কমে আস্‌ছিল। কিন্তু তা বলে সেই অনুপাতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে আনা সহজ হয়নি। আমদানীর টাকা, রপ্তানী করে যদি মিটানো সম্ভব না হয় তাহ'লে নগদ টাকা পাঠাতে হয় ; অধিকন্তু ক্ষতিপূরণের কিস্তি ও ঋণের সুদ দেবার কথাও আছে। এ অবস্থায় সব দেশেরই চেষ্টা হ'ল কি করে আমদানী কমান যায় এবং তার জন্যই তুল্‌লে শুল্ক-প্রাচীর ; তার পরই এল 'কোটা সিষ্টেম্' (অর্থাৎ কোন্ পণ্য কোন্ দেশ থেকে কতটা পরিমাণ আমদানী করা যাবে) আর 'ফরেন্ এক্‌স্‌চেঞ্জ' কণ্ট্রোল। কিন্তু সব দেশই যদি চায় যে আমদানীর পরিমাণ কম হোক্, তাহ'লে রপ্তানীর পরিমাণও নিশ্চয়ই কম্‌বে, কেন না, এক দেশের পক্ষে যা আমদানী, অন্য দেশের পক্ষে তাই রপ্তানী। হোলোও তাই, সব দেশেরই বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ গেল কমে আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের দর গেল আরো নেমে। ফলে বিদেশের ঋণের বোঝা অধিকতর অসহনীয় মনে হ'তে লাগ ল, যেহেতু পূর্ব্বে যে-পরিমাণ মাল বেচে ঋণটা পরিশোধ করা চল্‌ত, এই পড়্‌তি দরের বাজারে সেই পরিমাণ টাকাটা শোধ দিতে গেলে অধিকতর পরিমাণের মাল বেচা আবশ্যক হয়। ১৯৩১ নাগাদ জার্ম্মাণীর দুর্দ্দশা এমন তীব্র হয়েছিল যে জার্ম্মাণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের মার্কের কথা স্মরণ করে অনেকে ভয়ে দেশ থেকে টাকা উঠিয়ে বিদেশে জমা রাখ্‌ল। এই সময়ে আবার অষ্ট্রীয়ার অন্যতম প্রধান

ব্যাঙ্ক "ক্রেডিট্ অ্যান্ষ্ট্যাল্ট্" ফেল হওয়ায় কয়েক দিনের মধ্যে জার্ম্মান স্বর্ণহীন হইয়া পড়ে। ব্যাপার দেখিয়া হুভার, মোরেটরিয়মের ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ কিছুকালের জন্য যুদ্ধ-ঋণ ও ক্ষতি-পূরণের টাকা, পরিশোধ করা হইতে জার্ম্মানকে রেহাই দেওয়া হইল।

ইউরোপের আর্থিক সঙ্কটের ধাক্কা গিয়া লাগিল গ্রেটবৃটেনে। অধিকন্তু ১৯৩১শে, 'মে কমিটি' ইংলণ্ডের খরচা-সংক্রান্ত যে শঙ্কাকুল রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে সাধারণের মনে শঙ্কা বাড়িয়াই গেল। বিদেশীরা টাকা লোক্সান যাইবার ভয়ে টাকা তুলিতে লাগিল; ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১ নাগাদ্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের সোণা দিবার ক্ষমতা শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকে; সোণা রপ্তানী প্রতিরোধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হয়। স্বর্ণমান ত্যাগ করার ফলে অন্য দেশের সিক্কার তুলনায় পাউণ্ড হতাদর হয় (বা ডিপ্রিসিয়েটেড্)। এই ভাবে ইংলণ্ড বিদেশে পণ্য রপ্তানী করার সুবিধা পাইল; অন্য দিকে বিদেশী মালের দর পাউণ্ড-সিক্কায় চড়া মনে হওয়ায় আমদানী গেল কমিয়া। কিন্তু ইংলণ্ডকে আমদানী করিতে হয় কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য। যতক্ষণ না মজুরী বাড়াতে হয়, ততক্ষণ একটু চড়া দরে কাঁচা-মাল আমদানী করে, বিদেশের বাজারে তৈরী-মাল রপ্তানী করা চলিতে পারে। সিক্কা বেশী হতাদর হইলে বিদেশ থেকে মাল আমদানী করিতে হয়, অধিকতর চড়া দরে; এবং খাদ্যদ্রব্যাদির দর যদি চড়া দিতে হয়, তাহা হইলে, সেই অনুপাতে মজুরীও বাড়ান প্রয়োজন হইয়া পড়ে; কিন্তু মজুরী বাড়াইলে পণ্যের উৎপাদন-খরচা যায় বাড়িয়া; ফলে রপ্তানী সঙ্কুচিত হয়। তাই সিক্কা যাতে বেশী হতাদর না হয় বা মর্য্যাদা বেশী না পায়, সে জন্য ব্যবস্থা হইল বিনিময় শাসনের বা এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোলের। লোকে যদি ফ্রাঁ বা ডলারের বিনিময়ে পাউণ্ড কিনিতে

চায় অথচ ফ্রাঁ-ডলার কিনিবার লোকের অভাব হয়, তাহা হইলে পাউণ্ডের দর বাড়ার সম্ভাবনা। যাহাতে পাউণ্ডের দর এম্‌নি ভাবে বাড়িতে-কমিতে না পারে, তার জন্য 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড' বাট্টার হার (ব্যাঙ্ক রেট্) বাড়াতে-কমাতে লাগিলেন। অবশেষে এই বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত হইল "বিনিময় সমীকরণ ভাণ্ডার" (এক্সচেঞ্জ ইকোয়ালাই-জেশন্ অ্যাকাউণ্ট) ১৯৩২শের জুলাই মাসে। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের হাতে যে বৈদেশিক টাকা (ফরেন্ কারেন্সী) জমে উঠেছিল, তাহা আসিল এই অ্যাকাউণ্টের হাতে এবং তার বদলে ঐ পরিমাণের ট্রেজরী বিল দিলে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে; সুতরাং কার্য্যতঃ ব্যাঙ্কের মজুতের পরিমাণ ঠিকই রহিল। এখন ধরা যাক্, বাজারে পাউণ্ডের চাহিদা বেশী হইয়াছে। এই অ্যাকাউণ্ট তখন লণ্ডনের কয়েকটী ব্যাঙ্ককে আদেশ দেয় যে, তোমরা পাউণ্ডের বদলে ঐ সব ডলার-ফ্রাঁ বিদেশী সিক্কা ক্রয় কর। ব্যাঙ্ক এই আদেশ অনুযায়ী ধরা যাক্, ১,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী সিক্কা কিনিল এবং ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় বিদেশী কারবারীদের নামে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড জমা লিখিলেন। অ্যাকাউণ্ট তারপর ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে জমা দিবে ১,০০০,০০০ পাউণ্ডের ট্রেজরী বিল আর বিদেশী সিক্কার মূল্য স্বরূপ লণ্ডন ব্যাঙ্কগুলিকে দিল, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের নামে এক ১,০০০,০০০ পাউণ্ডের চেক্। এইভাবে এই অ্যাকাউণ্টের কাজ চলে। আর যখন অ্যাকাউণ্ট ফরেন্ কারেন্সী বিক্রয় করে, ঠিক এর উল্টাই করা হয়। এই ভাবে এক্সচেঞ্জ ইকোয়ালাইজেশন্ অ্যাকাউণ্ট, কিনিবার হার প্রবলভাবে বাড়া-কমা রোধ করে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে যে-সব দেশের ব্যবসাগত যোগ ছিল, তারাও তারই অনুসরণে স্বর্ণমান ত্যাগ করে। যে-সব দেশে সোণা মজুত ছিল যথেষ্ট

পরিমাণে, যেমন ফ্রান্স, বেলজিয়াম্, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালী ও পোল্যাণ্ড, তারা স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই। স্কাণ্ডিনেভিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ভারতবর্ষ ও ফিন্‌ল্যাণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে, কিন্তু ইংলণ্ডের কাগজীমুদ্রা, ষ্টার্লিং-এর সহিত যোগ রাখে। এদের ষ্টার্লিং গ্রুপ বলা হয়। জার্ম্মাণী ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই বটে, কিন্তু তারা 'এক্সচেঞ্জ কন্‌ট্রোল' প্রচলিত করে। এই সব দেশগুলি প্রধানতঃ খাতক দেশ; সুতরাং এরা স্বর্ণমান ত্যাগ না করার জন্য, যে-সব দেশেব সিক্কা হতাদর হইয়াছিল, সেই-সব দেশের ঋণ-শোধ করার, এই-সব দেশের কিছু সুবিধা হইয়াছিল। এক্সচেঞ্জ কন্‌ট্রোল প্রধানতঃ এই ধবণের—রপ্তানীকারদের বাধ্য করা হইয়াছিল, সমস্ত বিল্ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে জমা দিতে; ব্যাঙ্ক তাদের নির্দ্দিষ্ট হারে স্বদেশী টাকা দিতেন। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সমস্ত বৈদেশিক বিল থাকায় তাঁরা যেমন উচিত বুঝিতেন, সেই ভাবে আমদানীকারদের বেচিতে পারিতেন। পরোক্ষভাবে বিনিময় শাসন (এক্সচেঞ্জ কন্‌ট্রোল) করা হইত আমদানী নিয়ন্ত্রিত করে; যেমন, সরকার হুকুম করিলেন, অমুক সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ পণ্য, এত পরিমাণের অধিক আমদানী হইতে পারিবে না।

যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৩৩ পর্য্যন্ত স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই। ১৯৩৩শের গোড়ায় ব্যাঙ্ক জগতে যে সঙ্কট দেখা দেয়, তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ডলারের বৈদেশিক মূল্য (এক্সটার্ন্যাল ভ্যালু) অসম্ভব কমিয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র ছিল একজন বড় মহাজন—ইউরোপের প্রায় সব দেশই তার খাতক। যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক প্রাচীরও সু-উচ্চ, এরূপ ক্ষেত্রে যদি ডলার হতাদর হয় (ডিপ্রিসিয়েট করা যায়), তাহ'লে স্বতঃই মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র বিদেশের বাজারে

পণ্য ডাম্প করিতে চাহিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু তা উদ্দেশ্য ছিল না; দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচা ও দরের মাত্রা বাড়ানর (কষ্ট অ্যাণ্ড প্রাইস্ লেভেল) ইচ্ছা ছিল রুস্‌ভেল্টের। যে অনুপাতে সিক্কা হতাদর হইয়াছিল, দরের মাত্রাও প্রায় সেই অনুপাতেই বাড়িয়াছিল, পণ্য 'ডাম্প' করিবার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না; ১৯৩৩ সালের জুন মাসে লণ্ডনে এক বিশ্ব অর্থনৈতিক বৈঠক (ওয়ার্লড ইকনমিক কনফারেন্স) বসে; রুস্‌ভেল্ট এই সম্মিলনে বেশ স্পষ্ট ভাবেই বলেন যে, মুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়-মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেয়ে, স্বদেশের মুদ্রার ক্রয়শক্তি বাড়ান বেশী দরকার বলিয়া মনে করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি ডলারের মূল্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে চান, যাহাতে দীর্ঘকাল ধরে ডলারের ক্রয়শক্তি দেশের মধ্যে স্থির থাকিতে পারে। তাঁর এই উক্তির ফলে ইকনমিক কন্‌ফারেন্স ভেঙ্গে যায়। দেশের মধ্যে পণ্যের দর বাড়াইয়া তুলিবার জন্য রুস্‌ভেল্ট, ডলার ৫০% পর্য্যন্ত হতাদর করা (ডিপ্রিসিয়েট) স্থির করেন এবং সেই মতলবে চড়া দর দিয়া, বাজারে সোণা কিনিতে থাকেন; এই ভাবে বহু সোণা অন্য দেশ থেকে চালান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মজুত হইতে থাকে। ডলার ডিপ্রিসিয়েটেড হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বিনিময়-সাম্য স্থির রাখা কষ্ট-সাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৩৪এর গোড়ায় চেকোশ্লোভাকিয়া রুস্‌ভেল্ট নীতির ফলে বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান ত্যাগ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই; এই দেশগুলোকে সংক্ষেপে বলা হয় 'গোল্ড ব্লক' দেশ সমূহ। পাউণ্ড ও ডলার হতাদর হওয়ায় গোল্ড ব্লক দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু তবু তারা স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে পারে নাই বা সিক্কাকে হতাদর করে নাই। হতাদর সিক্কা

বিশিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য, তাদের পণ্যের দর সস্তা করা আবশ্যক হয়; তাই তারা টাকা-কড়ির পরিমাণ হ্রাস করে বা 'ডিফ্লেশানিষ্ট পলিসি' অনুবর্ত্তন করে। ফলে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়; বহু লোকের কাজে ইস্তফা দিতে হয়; করের বোঝাও বাড়াইতে হয়। কিন্তু তাহাতেও প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইল না; কেননা এক দিকে যেমন এই সব দেশ, নিজের দেশে বেকার সংখ্যা বাড়াইয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং নীচু করিয়া সস্তায় পণ্য রপ্তানীর চেষ্টা করিয়াছিল, তেমনি আবার আমদানীকারী দেশগুলি শুল্কের মাত্রা বাড়াইয়া, নতুন বাধার সৃষ্টি করিতেছিল। গোল্ডব্লক দেশগুলি নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়া পরস্পরের মধ্যে পণ্যের আদান প্রদান করে, দেশের ব্যবসা জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াও বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। ব্যাপার দেখিয়া বেলজিয়াম নিজের সিক্কা হতাদর করে। ফ্রান্স এখনো স্বর্ণমানের মোহ কাটাইতে পারে নাই। পাউণ্ড-ডলারের তুলনায় ফ্রাঁকে মূল্যবান করিয়া রাখার ফলে, দিন দিন তার মোট-বাণিজ্যের পরিমাণ যাইতেছে কমিয়া, বাজেট্ ঘাট্‌তি পূরণ করাও হইয়া উঠিতেছে দুষ্কর। তা ছাড়া সোণা রপ্তানীও রোধ করা যাইতেছে না। ফ্রান্সে যে পরিমাণ সোণা মজুত আছে, তাতে অবাধে সোণা রপ্তানী হইতে দিলে হয় ত' তাহার বেশী কিছু ক্ষতি হইবে না; তবু যখন এই বৎসর মে মাসে, এক সপ্তাহের ভিতর, ১৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোণা ফ্রান্সের কূল ছাড়িয়া গেল এবং বাট্টার হার ৬% পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়াও কিছু লাভ হইল না, তখন ফরাসীরা উদ্বিগ্ন না হইয়াই পারে নাই। এদিকে আবার রুস্‌ভেল্ট রৌপ্য-ক্রয় আইনের (সিল্‌ভার পারচেসিং অ্যাক্ট) জোরে, যে তুফান তুলিয়াছেন, তার ফল চীন হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতেছে; উপায় না দেখিয়া চীন রৌপ্যমান ত্যাগ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্যনীতির কথা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে (রূপার বাজার) আলোচনা করিয়াছি।

সিক্কার (কারেন্সী) অনিশ্চয়তার জন্য, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দুর্গতি দেখিয়া, আবার সিক্কা-স্থিতিকরণের (কারেন্সী ষ্টেবিলাইজেশন) সম্মিলিত চেষ্টার কথা উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, এই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটী আন্তর্জ্জাতিক মহাসম্মেলন আহ্বান করিবেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহা রুস্‌ভেল্টের জন্যই কার্য্যকরী হয় নাই, তাই এ সংবাদ সহজে কেউ বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, আবার স্বর্ণমান ফিরাইয়া আনা যায় কিনা এবং সেটা খুব যুক্তিযুক্ত হইবে কি না। স্বর্ণমানের মূল কথা এই ছিল যে, প্রত্যেক দেশ, সোণার তুলনায় তার সিক্কা স্থির করিবে এবং তাহা সব সময়ে বজায় রাখিয়া যাইবে; আর চাহিলেই নির্দ্দিষ্ট হারে, দেশের সিক্কার বদলে সোণা পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সোণা, কেনা ও বেচার দাম পৃথক হইতে পারে, কিন্তু তা এত সামান্য যে, তাহাতে বিনিময় হারে অনিশ্চয়তা আসে না। বিদেশের পাওনা মিটানোর দরকার হইলেই লোকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সোণা দাবী করে; কিন্তু যখনি সোণা বিদেশে পাঠান বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে, তখনি দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে; ফলে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টী হয়। তাই অধ্যাপক কাসেল বলেন যে, "এ কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, স্বর্ণমান চিরকালের মত তুলে দিলে, এ-দিক থেকে বিশ্ব-অর্থনীতির ক্ষেত্রে, যে-সব গণ্ডগোল হয়, তা আর হবার সম্ভাবনা থাকবে না।" গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, ইংলণ্ড ছিল দুনিয়ার প্রধান টাকাকড়ির বাজার; স্বর্ণমান যে আসলে ষ্টার্লিং-মান তাহা তাহারা বুঝিতে দেয় নাই। যুদ্ধের পর ইংলণ্ড

হারাইল এই আধিপত্য, যুক্তরাষ্ট্র তখন টাকাকড়ির বাজারে একটা বড় আসন জুড়িয়া বসিয়াছে ; তাই ইংলণ্ডকে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিতে হইল (পেগ্‌ড্) পাউণ্ডের সঙ্গে ডলারের। ফলে স্বর্ণমান হইয়া দাঁড়াইল কার্য্যতঃ ডলার-মান। কিন্তু তাহা বলিয়া টাকাকড়ির নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আসিল না, গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে ভাগাভাগি হইল। তাই স্বর্ণমান টিকিল না ; পূর্ব্বের মত স্বর্ণমান আবার চলিবে তাই মনে করা ঠিক্ হইবে না।

বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তার যে ত্রুটী, তাহা এড়াইবার একটা নতুন উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন পল আইনৎসিগ ও ই, এচ, ডেভেনপোর্ট ; সেটা হইল 'এক্সচেঞ্জ ক্লিয়ারিং সিষ্টেম'। জিনিষটা কি তাহা সুইজারল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ব্যবস্থা দেখিলেই বোঝা যাইবে। ১৯৩১শের নভেম্বর মাসে সুইস্ ও হাঙ্গেরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট এক্সচেঞ্জ ক্লিয়ারিং এর ব্যবস্থা করেন। দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি হয় যে, যে-সব সুইজারল্যাণ্ড অধিবাসী, হাঙ্গেরী থেকে মাল আমদানী করিবে, তারা সেই মালের দাম বাবৎ যে টাকা দিবে, তাহা সুইস ফ্রাঁতেই দিবে এবং সেই দামের টাকা সুইস ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কের বিশেষ হিসাবে জমা রাখিবে ; তেমনি আবার হাঙ্গারীর আমদানীকারেরা, সুইস মালের দাম, হাঙ্গেরীর টাকা পেন্-গোতে, হাঙ্গেরিয়ান্ ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কের বিশেষ হিসাবে জমা দিবে। পণ্যের রপ্তানীকারদের দাম হিসাবে ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক আমদানীকারদের জমার টাকা থেকে টাকা দেয়। কোন বাণিজ্যিক পত্র বা বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ কেনা-বেচা করা দুটী দেশের কোনটাতেই দরকার হয় না। সুইজারলাণ্ড ও হাঙ্গেরী আরো অনেক দেশের সঙ্গে এম্‌নি এক্সচেঞ্জ ক্লিয়ারিং এর ব্যবস্থা করিয়াছে ; চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ফলে সব দেশেরই বাণিজ্যের

পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এর অসুবিধা এই যে, মাত্র ২টী দেশের মধ্যেই এ ব্যবস্থা সম্ভব। তবে যদি একটা আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন করিয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউস করা যায়, তাহা হইলে আর এ অসুবিধা থাকিবে না।*

* বিনয় সরকারের "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রবলেম্" (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৪) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাজার-দর, স্বর্ণমান ও অটাওয়া-চুক্তি

যখনই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়াছে, তখনই পণ্যের দরের পতনও লক্ষ্য করা গিয়াছে; এই গত কয়েক বৎসরেও ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। গত তিন-চার বৎসর পণ্যের দর ক্রমশঃই নামিয়া চলিয়াছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পর, দর-পতন একবারে চরমে আসিয়া ঠেকে; খাদ্য-দ্রব্য ও কাঁচামালের দর ভয়াবহরূপে নামিয়া যায়। এই দর-পতন ও বাজার মন্দার হেতু, বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বাজার মন্দা হওয়ায় পণ্যের দর পড়িয়া যায়, আবার কেহবা বলেন যে, দর পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই বাজার নষ্ট হইয়া যায়। পণ্য যতটা পরিমাণ উৎপাদন করা উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপন্ন হওয়ায় অর্থাৎ 'ওভার-প্রডাক্‌শান্' বা উৎপাদন-বাহুল্য হওয়ায়, চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হেতু পণ্যের দর পড়িয়া যায় এবং বাজারে মন্দা দেখা দেয়, এমন মতও শোনা যায়। আবার কেহ কেহ সিক্কানীতিকেই ইহার জন্য দায়ী করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, দরের ওঠা-নামা-বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা এখানে না করিয়া, গত কয়েক বৎসরে দর কিরূপভাবে ওঠা-নামা কবিয়াছে তাহাই একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব। বিভিন্ন দেশের পাইকারী দর বা 'হোল্‌সেল প্রাইসেস্' কিরূপ ওঠা-নামা করিয়াছে, তাহাই প্রথমে দেখা যাক্।

হোলসেল্ প্রাইসেস্

খৃঃ ১৯১৩=১০০

খৃঃ	যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ	জাপান	জার্ম্মানী	ফ্রান্স	ইতালী	যুক্তরাজ্য
১৯২৫	১৪৮	১৫০	২০২	১৪২	...	৬৪৬	১৫৯
১৯২৬	১৪৩	১৪৮	১৭৯	১৩৪	১৪১	৬৫৪	১৪৮
১৯২৭	১৩৭	১৪৮	১৭০	১৩৮	১৩০	৫২৭	১৪২
১৯২৮	১৩৯	১৪৫	১৭১	১৪০	১৩১	৪৯১	১৪০
১৯২৯	১৩৭	১৪১	১৬৬	১৩৭	১২৭	৪৮১	১৩৭
১৯৩০	১২৪	১১৬	১৩৭	১২৫	১১২	৪১১	১২০
১৯৩১	১০৫	৯৬	১১৬	১১১	১০২	৩৪২	১০৪
১৯৩২	৯৩	৯১	১২২	৯৭	৮৭	৩১৫	১০২
১৯৩৩	৯৫	৮৭	১৩৬	৯৩	৮১	২৮৩	১০১

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় (অর্থাৎ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে) ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, সব দেশের পাইকারী দর (হোলসেল্ প্রাইসেস্) বড়িয়াছে ; দেড়গুণ, দ্বিগুণ হইতে সাড়ে ছয় গুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। সব দেশেই ১৯২৫ হইতেই, হোলসেল্ দর একটানা নামিয়া চলিয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর দরের মাত্রা, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় পৌণে তিন গুণের বেশী থাকিলেও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী নামিয়া গিয়াছে। যুক্তরাজ্যে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৯১৩র ধাপে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মাত্রা ছাড়াইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ মধ্যে প্রায় সব দেশেই দর নামিয়াছে ধীরে ধীরে এবং তাহার পর দুই বৎসর দর পড়িয়াছে দ্রুতগতিতে ; তাহার পর আবার একটু 'ষ্টেডিনেস্' দেখা যায়।

১নং চিত্র দেখিলে বোঝা যাইবে যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৪

পাইকারী দরের ওঠানামা

খৃঃ ১৯১৩=১০০

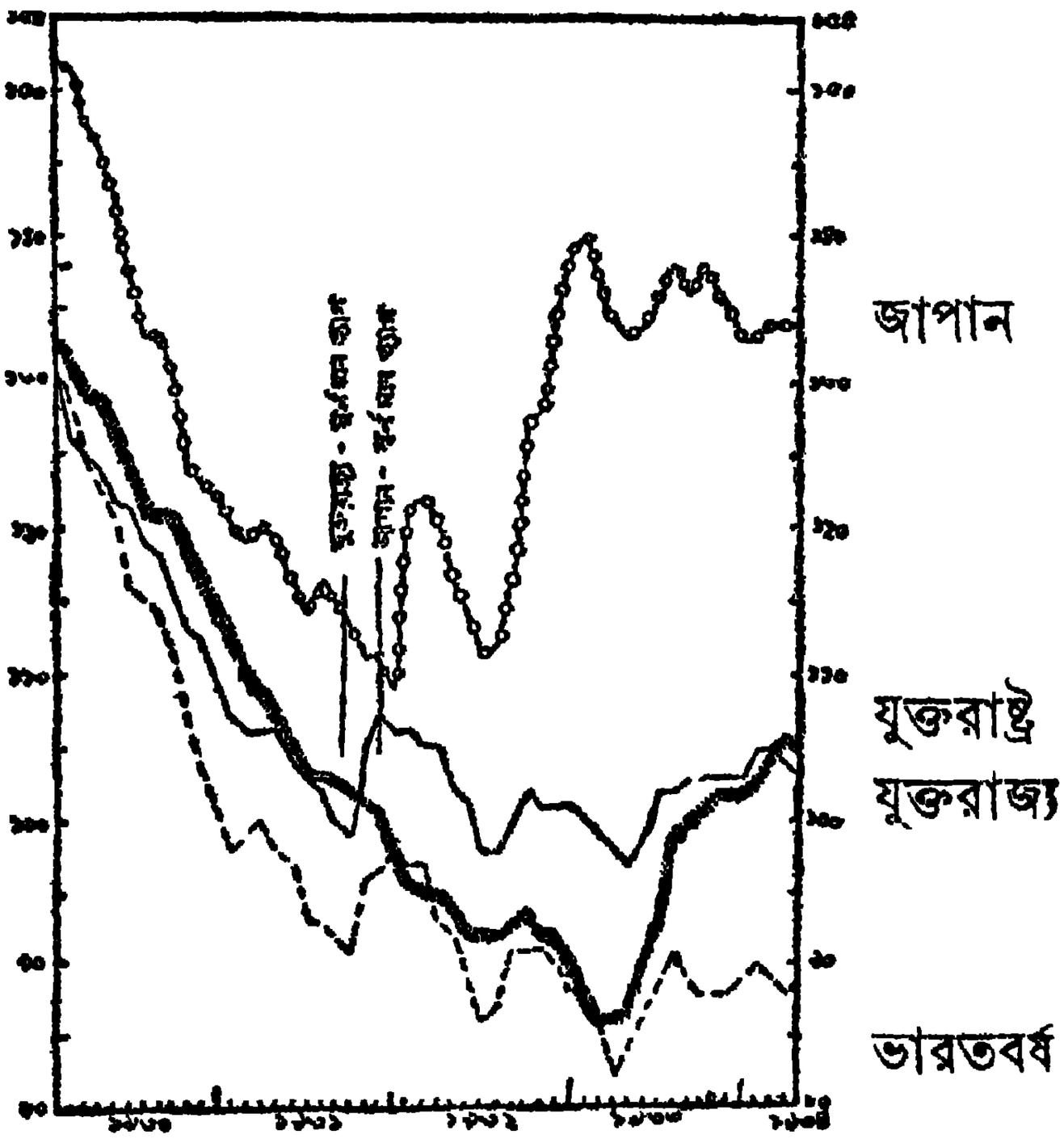

১নং চিত্র

খৃষ্টাব্দে দর, ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে নামিয়াছে; এই চারিটী দেশই স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ১৯৩৪ সনে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দর, ১৯২৯-এর তুলনায় ২০-২৫ পার্সেণ্ট মাত্র পড়িয়াছে, অথচ ভারতবর্ষ স্বর্ণমান ত্যাগ করা সত্ত্বেও ১৯৩৪ সনে (ফেব্রুয়ারী) দর ১৯২৯এর তুলনায় ৩৮% নামিয়াছে। প্রায় সব দেশগুলিতেই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে দর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নামে; যুক্তরাষ্ট্রে ফেব্রুয়ারী মাসে, ভারতবর্ষে মার্চ্চ মাসে ও যুক্ত-

রাজ্যে এপ্রিল মাসে, দর সব চেয়ে কম ছিল ; কিন্তু জাপানের নিম্নতম মাত্রা পাওয়া যায় ১৯৩২-এর জুন। দেখা যায় যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের দর নিম্নতম মাত্রা অপেক্ষা ২১% অধিক হইয়াছে, অথচ যুক্তরাজ্য ও ভারতবর্ষে মাত্র ৮% বাড়িয়াছে। ১৯৩৩ সালের দরের গতি দেখিয়া মনে হয় যে, মন্দার অবসান হইতে চলিয়াছে। ১৯৩৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রে দর উঠিয়াছে ২৩% আর যুক্তরাজ্য ও ভারতে যথাক্রমে ৬% ও ৩%; জাপানে কিন্তু ১% নামিয়াছে দেখা যায়। যুক্তরাজ্য ও জাপান স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর, দর-পড়া রোধ হয় নাই, কেবল গতি একটু মন্থর হইয়াছিল ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর দরের উন্নতিই লক্ষ্য করা যাইতেছে।

হোলসেল্ দরের উঠানামা

শতকরা পরিবর্ত্তন

দেশ	১৯২৯ ফেব্রুঃ হইতে ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী	সর্ব্বনিম্নমাত্রা হইতে ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪
যুক্তরাষ্ট্র	−২৩	+২৩ (ফেব্রুঃ ১৯৩৩)	+২৩
ভারতবর্ষ	−৩৮	+৯ (মার্চ্চঃ ১৯৩৩)	+৩
জাপান	−২২	+২১ (জুন ১৯৩২)	−১
জার্ম্মানী	−৩১	+৫ (জানুঃ ১৯৩৩)	+৫
ফ্রান্স	−৩৯	+৪ (মে ১৯৩৩)	−১
ইতালী	−৪৫	± (ফেব্রুঃ ১৯৩৪)	−৬
যুক্তরাজ্য	−২৪	+৮ (এপ্রিঃ ১৯৩৩)	+৬

এক্সচেঞ্জ রেট্ বা বিনিময়-হার ও দরের ওঠা-নামা যে একইভাবে, হইয়া থাকে একথা বলা যায় না অর্থাৎ যে-অনুপাতে বিনিময়-হার

বাড়ে-কমে, হোল্‌সেল দর ঠিক সেই অনুপাতে ওঠানামা করিতে নাও পারে। ২নং চিত্রে আমরা ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ২য় চিত্রে, পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময়-হার পরিবর্ত্তনের সহিত ভারতীয় পাইকারী দরের সহিত বিলাতের দরের 'রেশিও' বা অনুপাতের তুলনা করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় দর বিলাতের দরের তুলনায় যত পড়িয়াছে, টাকার তুলনায় পাউণ্ড তত পড়ে নাই; চিত্রের গতি দেখিয়াও বোঝা যায় যে, এক্সচেঞ্জ রেট্

দর ও বিনিময়-হারের ওঠানামা

.....পাউণ্ড-টাকা এক্সচেঞ্জ

—ভারতীয় পাইকারী দরের সহিত যুক্তরাজ্যের পাইকারী দরের রেশিও

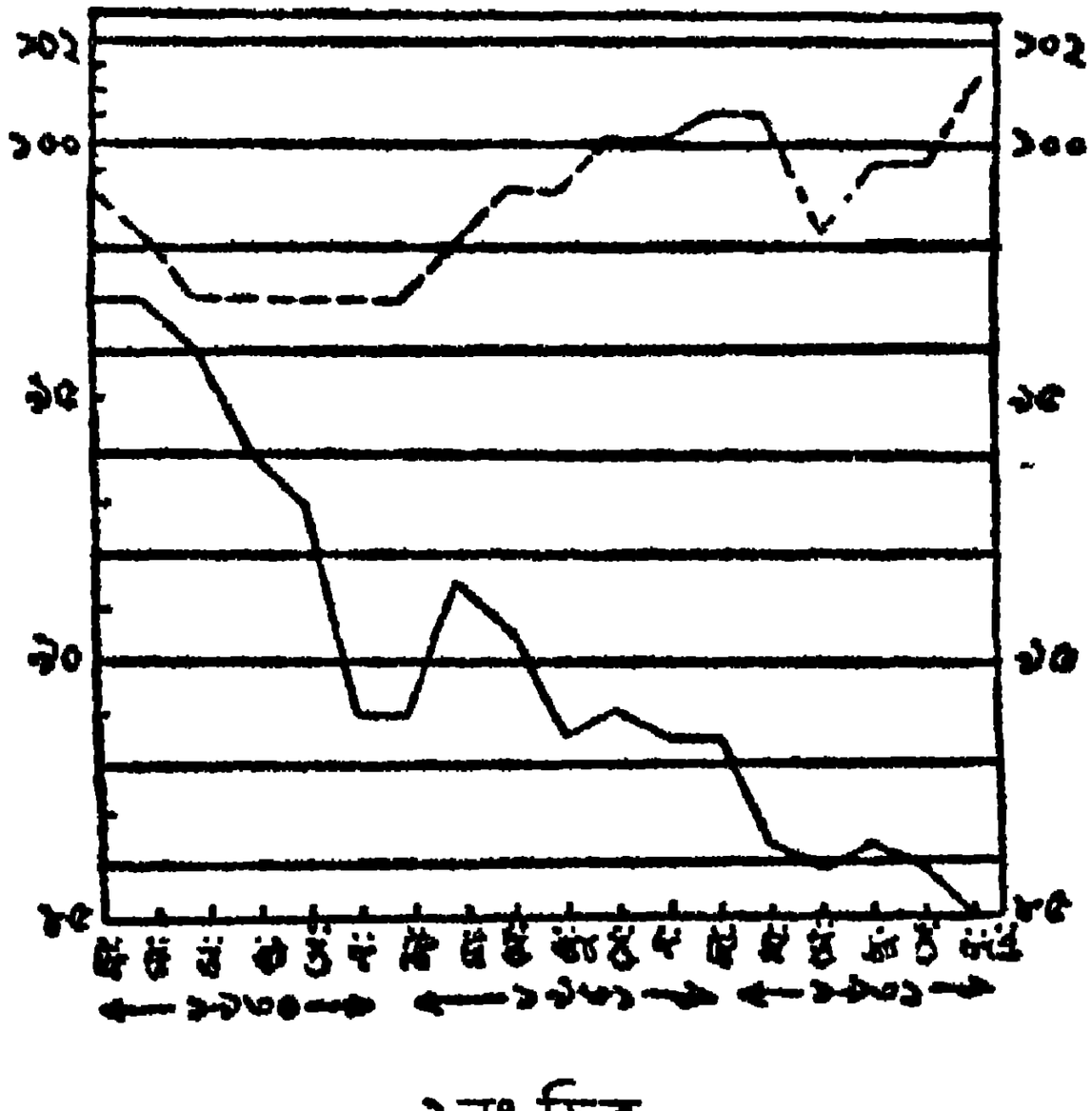

২নং চিত্র

উঠিলেই যে-দরও উঠিয়াছে, ইহাও নহে; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে এক্সচেঞ্জ রেট্ পড়িয়াছে ২% আর ঐ সময়ে ভারতীয় দর ইংলণ্ডের দরের তুলনায় পড়িয়াছে ৭%; ১৯২৯এর পর বিনিময় হারের সমধিক

পতনের মাত্রা ৩% অথচ দর পড়িয়াছে ১৯৩২ ডিসেম্বরে ১৭%; পক্ষান্তরে ১৯৩১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩২ এপ্রিল পর্য্যন্ত বিনিময় হার উঠিয়াছে, অথচ ভারতীয় দর ইংলণ্ডের দরের তুলনায় ঐ সময়ে পড়িয়াছে ১১% হইতে ১৪% পর্য্যন্ত; আবার ১৯৩২এর নভেম্বর ১% বিনিময়-হার পড়িলেও তুলনায় ভারতীয় দর পড়িয়াছে ১৭%; অর্থাৎ বিনিময়-হার অধিক ওঠা-নামা না করিলেও, দর প্রবলভাবে নামা-ওঠা করিতে করিতে নামিয়াই চলিয়াছে।

সিক্কা হতাদর বা 'ডিপ্রিসিয়েটেড্' হইলেও, যদি সিক্কার পরিমাণ সঙ্কুচিত করা যায় অর্থাৎ 'কারেন্সী কন্ট্র্যাক্ট' করিলে, পণ্যের দর বাড়িতে পারে না; বাজারে বেশী টাকা থাকিলে তবেই পণ্যের দর বাড়ে। ব্যাঙ্কে যদি আমানতের পরিমাণ বেশী হয়, তাহা হইলে, বোঝা যায় যে কেনা-বেচা অধিক হইবার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং দর বাড়িবার সম্ভাবনা কতখানি তাহা বুঝিতে হইলে ব্যাঙ্ক-আমানতের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নোটের প্রচলন ছিল ১৯১,৮০,০০০,০০ টাকার; আর ১৯৩০শে ছিল মাত্র ১৬১,৩০,০০,০০০ টাকার। সরকার কি ভাবে নোট ছাড়িয়াছেন তাহার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হইল। দেখা যাইবে যে ভারত স্বর্ণমান ত্যাগ করিলেও নোটের প্রসার হয় নাই।

নোটের পরিমাণ

(০০০,০০০ টাকায়)

খৃঃ	১৯২৫	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
টাকা	১,৯১৮	১,৭৯৪	১,৬১৩	১,৭৯৩	১,৭৪৮	১,৭৮১

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, বাট্টার হার বাড়াইয়া কমাইয়া টাকার বাজার

নিয়ন্ত্রিত করে। যদি স্বর্ণমান ত্যাগের সহিত ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক বাট্টার হার কমাইয়া দিত, তাহা হইলেও দর ওঠার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু তাহা না করিয়া ব্যাঙ্ক, বাট্টার হার ১৯৩০ সালের ৫·৮৯ হইতে, ৭·০৯এ ঠেলিয়া তুলিল; ফলে এদিক্ দিয়াও দর ওঠার সুবিধা হইল না।

ভারতে বাট্টার হার

(ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ডিস্কাউণ্ট রেট্)

	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
এঃ ১লা	৮	৬	৭	৬	৩½
মে ,,	৭	৬	৭	৫	৩½
জুন ,,	৬	৬	৬	৫	৩½
জুলাঃ,,	৫	৬	৬	৫	৩½
আঃ ,,	৫	৫	৬	৪	৩½
সেপ্টঃ,,	৫	৫	৭	৪	৩½
অঃ ,,	৫	৫	৮	৪	৩½
নভেঃ ,,	৭	৫	৮	৪	৩½
ডিঃ ,,	৭	৬	৮	৪	৩½
জানুঃ ,,	৭	৬	৮	৪	৩½
ফেঃ ,,	৭	৭	৭	৪	৩½
মার্চ্চ ,,	৭	৭	৬	৩½	৩½

আবার এদিকে ব্যাঙ্কের আমানৎ যে বাড়িয়াছে তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না; তাই স্বর্ণমান ত্যাগ করা সত্ত্বেও ভারতে দরের মাত্রা উঠিতে বিশেষ দেখা যাইতেছে না।

ব্যাঙ্ক আমানত

(০০০,০০০ টাকায়)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (প্রাইভেট)	৭১৬	৭৬৬	৩৩৮	৬৮৪	৭৩১
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক		৬৬৬	৬৮১	৬৭৫	
জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক		৬৬৩	৬৭৫	৬৬১	
		২,০৪৬	২,১২২	১,৯৭৪	

ভারত ও যুক্তরাজ্য ছাড়াও অন্যান্য দেশও স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে; এই সকল দেশে স্বর্ণমান ত্যাগ ও ক্রেডিট বাড়ানর ফলে দেশের আর্থিক উন্নতি দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন দেশের রপ্তানীর পরিমাণ দেখিলেই ইহা বোঝা যায়। সোণার তুলনায় টাকা ৩২% হতাদর হইলেও, হোলসেল্ দর বা রপ্তানী বাড়িতে দেখা যাইতেছে না। ভারতের কারবার যে-সব দেশের সহিত, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে নাই; তাহারাও স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু ভারতীয় সিক্কা যে-অনুপাতে হতাদর হইয়াছে, এই-সব দেশের মুদ্রা তাহা অপেক্ষা অধিকতর হতাদর হইয়াছে; জাপানে হইয়াছে ৬০% ও চীনে ৫০%; সুতরাং সিক্কা হতাদর হওয়ায় যে লাভ আমরা তাহা পাইতেছি না। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যের সহিত কারবার আমাদের যথেষ্ট, কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে হতাদর ষ্টার্লিঙের তুলনায় টাকা মূল্যবান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইলেও, টাকাকে ষ্টার্লিঙের সহিত গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে; ফলে যে-সকল দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই, সেই সকল বাজার দখল করিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ ভারত পাইলেও, যাহাদের সহিত মোটা-টাকার কারবার, তাহাদের বাজারে মাল বেচার সুযোগ মিলিল না। ১৯৩২-৩৩ সালে ভারত মাল বেচিয়াছে—

স্বর্ণমান-বিশিষ্ট দেশসমূহে	...	২৭,১৩,৯২,৫৮৮৲
ষ্টার্লিংগেরিয়ায়	...	৬৭,২৭,২৬,৩০৬৲
অন্যান্য (যে-সব দেশে স্বর্ণমান নাই)	...	৩৮,৫২,৩৭,০৪৩৲

সুতরাং ষ্টার্লিঙের তুলনায় টাকা হতাদর না হইলে ষ্টার্লিঙগেরিয়ায় মাল বেচা সুবিধাজনক হইবে না।

রপ্তানীর পরিমাণ ও দরের উঠা-নামা

১৯২৯=১০০

১৯৩৩এ সিক্কা	জাপান	ভারত	যুক্তরাজ্য	চীন	যুক্তরাষ্ট্র
ডিপ্রিসিয়েসন	৬০	৩২	৩২	৫০১	১৯
রপ্তানীর মূল্য					
১৯৩০	৬৮	৭৮	৭৮	৮৮	৭৩
১৯৩১	৫৩	৫১	৫৩	৯০	৪৬
১৯৩২	৬৫	৪২	৫০	৪৯	৩১
১৯৩৩	৮৭	৪৫	৫০	৩৯	৩৩
হোল্‌সেল্‌ দর					
১৯৩০	৮২	৮২	৮৮	১১০	৯১
১৯৩১	৭০	৬৮	৭৬	১২১	৭৭
১৯৩২	৭৩	৬৫	৭৪	১০৮*	৬৮
১৯৩৩	৮২	৬২	৭৪	৯৯	৬৯

স্বর্ণমান ত্যাগ করার ফলে ভারতীয় পণ্য-উৎপাদকগণের কতখানি লাভ হইয়াছে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে, বিভিন্ন পণ্যের দর কিরূপভাবে ওঠানামা করিয়াছে তাহা দেখা দরকার। স্বর্ণমান ত্যাগের অব্যবহিত পরেই দর কিঞ্চিৎ বাড়ে এবং তাহার পর আবার কমিয়া যায়; ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন হইতে আবার বাড়িতে দেখা গিয়াছে। পণ্য উৎপাদনের

যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোঝা যাইবে, যে ১৯৩১এর তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ যে, সব ক্ষেত্রেই অধিক হইয়াছে তাহা নহে, তবু পণ্যের দর, স্বর্ণমান ত্যাগ করা সত্ত্বেও, আশানুরূপ বাড়ে নাই, বরং কমিয়া গিয়াছে।

উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা বাড়িলেও দর উঠিতে পারে না, যদি নাকি পূর্ব্ব হইতেই পণ্য মজুত থাকে। যে সকল পণ্য সহজে নষ্ট হয় না, যেমন গম, তূলা, রবার, চিনি, চা প্রভৃতি, সেই সকল পণ্য ভবিষ্যতে ভাল দর পাইবার আশায় ধরিয়া রাখা যায়; তাই ঐ প্রকার পণ্যের যোগানের দিকটা দেখিতে হইলে, চল্‌তি বৎসরের উৎপাদনের সহিত, গত বৎসর হইতে যে-পরিমাণ মজুত আছে, তাহাও দেখিয়া লইতে হয়। পণ্যের দর এই যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে।

উৎপাদনের পরিমাণ

(০০০ কুইন্‌ট্যালে : কুইন্‌ট্যাল—প্রায় ২০০ পাউণ্ড—প্রায় ২॥০ মণ)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
গম	৮৭,২৯৯	১০৬,৩৭০	৯৪,৫৫৩	৯১,৬৮৮	৯৬,০৩৭
চাউল	৪৭৪,৯৪৯	৪৯১,২১১	৫০৩,২৬৪	৪৭১,৪৬২	৪৬০,৩০১
চিনি	২৭,৯৬২	৩২,৭৯৮	৪০,৩৩৭	৪৭,৫৯২	৫১,৪৮৩
তামাক	৬,১২০	৬,৩৯১	৫,৮১২	৬,২৯৯	...
চা	১,৯৬৩	১,৭৭৪	১,৭৮৮	১,৯৬৭	...
কার্পাস বীজ	২২,১৬৫	২২,০৯৩	১৭,০১৬	১৯,৭০০	২১,০০০
তিসি	৩,২৭১	৩,৮৬১	৩,৮৩১	৪,২২৭	৪,০৯৫
চিনা বাদাম	২৭,১০৮	৩২,০৪৬	২৩,১২৫	২৮,৮১৫	...
তূলা	৯,৫১৩	৯,৪৮২	৭,৩০৩	৮,৪৪৮	৯,০১৭

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
† লবণ	১,৭৩৬	১,৭৩৯	১,৮৬৯	১,৬৩৭	...
* সিমেণ্ট	৫৭০	৫৭৩	৫৮৮	৫৯২	...
* কয়লা	২২,৭২১	২৩,১২৮	২১,০২৬	১৯,৪০১	১৮,৩০৬

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর দেখা গিয়াছিল যে, ষ্টক বা মজুত বাড়িলে দর পড়িয়া থাকে, আর ষ্টক কমিলে দর চড়িতে থাকে। আমাদের দেশে, পাটের উৎপাদন কম করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিতেছে এবং ১৯৩০ খৃঃ (২০,৩৩,০০০০ কুইন্‌ট্যাল্‌) তুলনায় ১৯৩১ সনে (১০,০৫৫,০০০ কুইন্‌ট্যাল্‌) অনেক অল্প উৎপাদন হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি পাটের দর নামিয়াই গিয়াছিল :—

পাটের দরের ওঠা-নামে

(১৯১৪ = ১০০)

	১৯৩০	১৯৩১
জানুঃ	৮৪	৪৩
মাঃ	৭২	৪৫
মেঃ	৭৫	৪৭
জুঃ	৫৮	৪৪
সেঃ	৫৩	৫১
নঃ	৪৬	৬০

মেট্রিক টনে

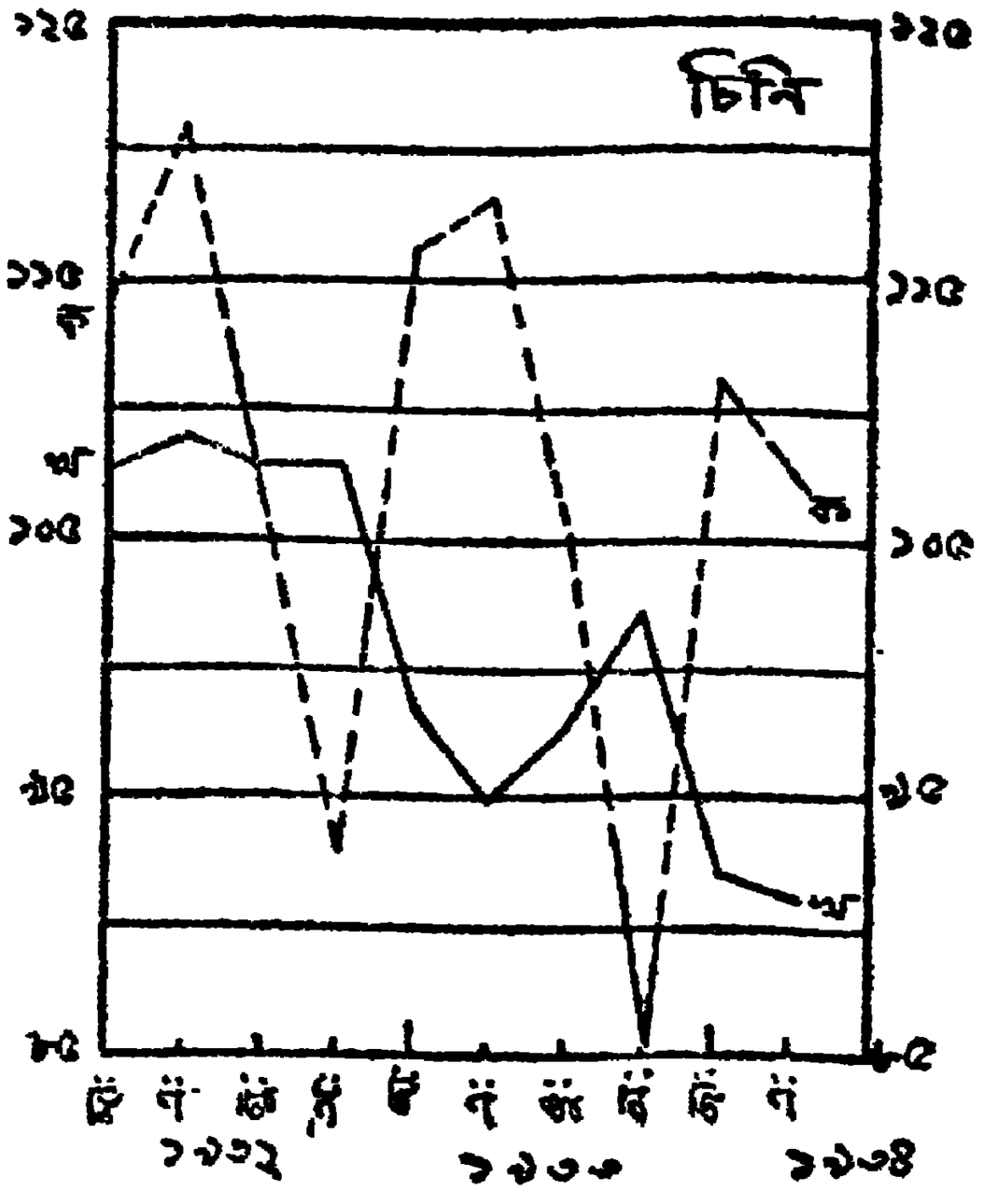
সূচি-সংখ্যা
১৯৩১=১০০
সূচি-সংখ্যা
চিনি
ক
খ
১২৫
১১৫
১০৫
৯৫
৮৫
১৯৩২
১৯৩৩
১৯৩৪
ক—দুনিয়ার মজুদ
খ—ভারতীয় দর

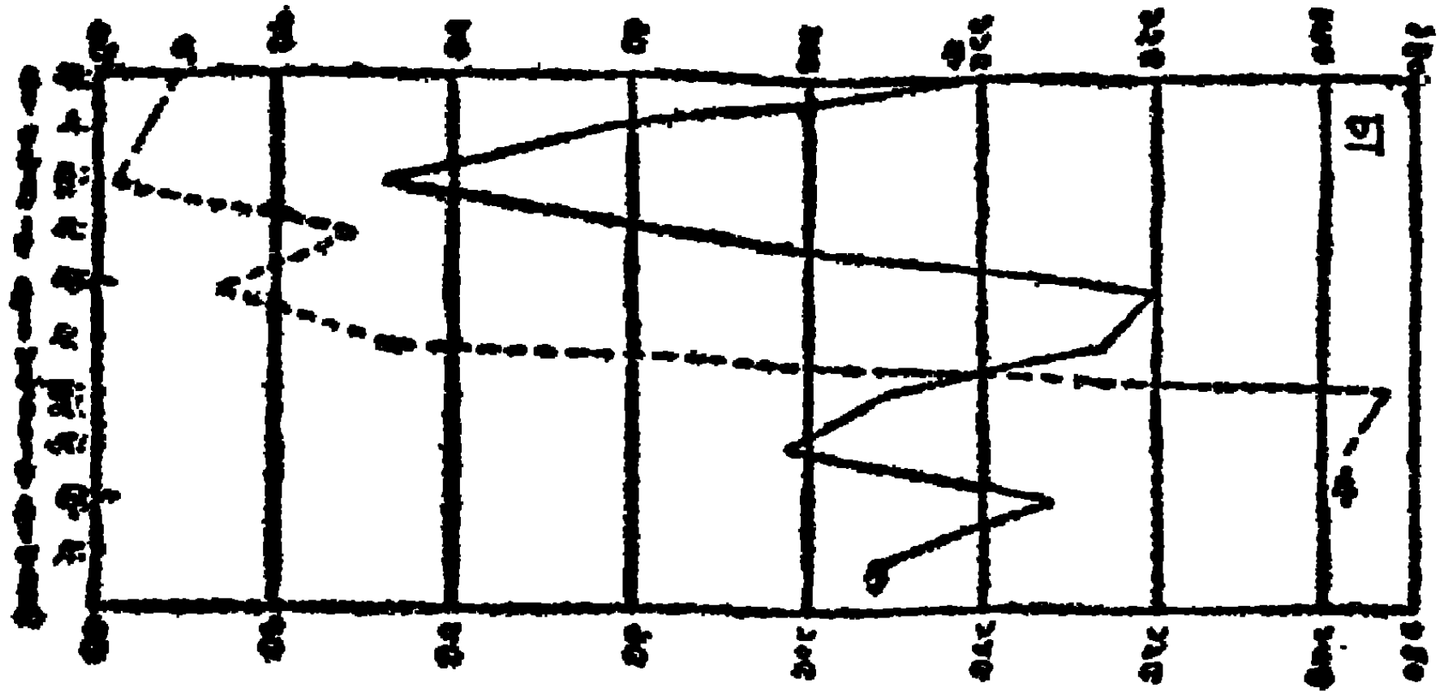
সূচি-সংখ্যা ১৯৩১—১০০ সূচি-সংখ্যা
চা
ক—ক দুনিয়ার মজুদ
খ—খ ভারতীয় দর

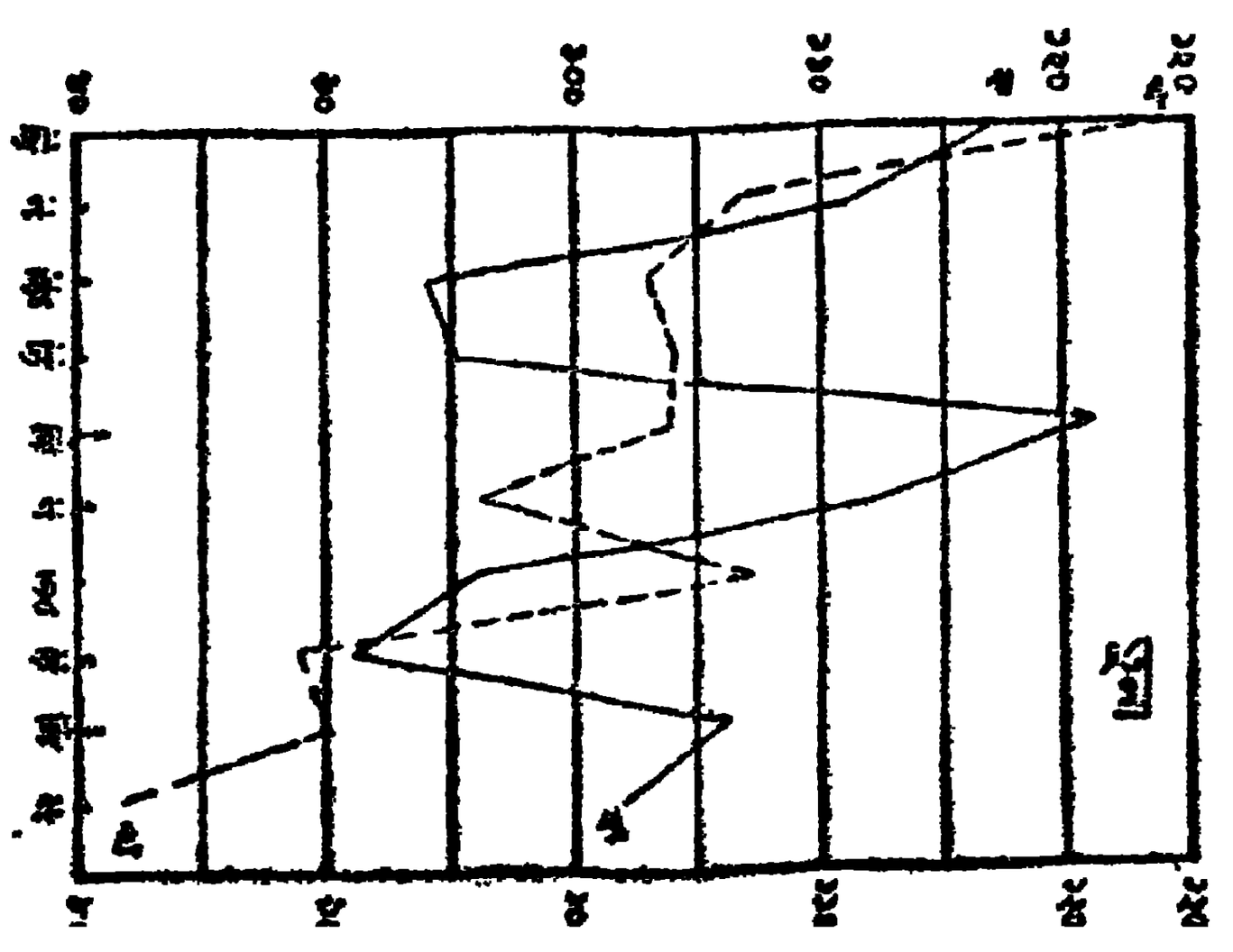
সূচি-সংখ্যা ১৯৩১=১০০ সূচি-সংখ্যা
তুলা
ক—ক দুনিয়ার মজুত
খ—খ ভারতীয় দর

টাকাকড়ি

গত বৎসরের মজুত কত ছিল জানিতে পারিলে, দর নামার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাইত। যে সব ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্‌ প্রকাশিত হয়, তাহাতে বৎসর-শেষে কত ষ্টক্‌ রহিয়া গেল তাহা বোঝা যায় না, সুতরাং উৎপাদকগণ পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার সুবিধা পান না; ফলে বাজারে পর্য্যাপ্ত মাল থাকার ফলে, চাষী যাহাই উৎপাদন করে তাহা বাহুল্য হইয়া দাঁড়ায় এবং উৎপাদন খরচা না পোষাইলেও তাহাকে বেচিতে হয়। ১৬৪ পৃঃ তিনটী চিত্রে দেখান হইয়াছে, যে চা, তূলা ও চিনির 'ওয়ার্ল্‌ড্‌ ষ্টকে'র সহিত সেই পণ্যের ভারতীয় দর কিভাবে ওঠা-নামা করিয়াছে। প্রত্যেক পণ্যের ভারতীয় ষ্টকের যদি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভারতীয় পণ্যের দর-নিয়ন্ত্রণের কিছু সুবিধা হইত। ইকনমিক প্ল্যানিং বোর্ডের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

পরবর্ত্তী কয়েকটী চিত্রে পণ্যের দরের ওঠা-নামা দেখান হইয়াছে। আর সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, সেপ্টেম্বর ১৯৩১ অর্থাৎ যে-বৎসর ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে, সেই সময়ের তুলনায়, সেপ্টেম্বর ১৯৩৪শে বিভিন্ন পণ্যের দর, শতকরা কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে।

কয়েকটী প্রধান উৎপাদনের দর

	সেপ্টঃ ১৯৩১	সেপ্টঃ ১৯৩২	সেপ্টঃ ১৯৩৩	সেপ্টঃ ১৯৩৪
গম (কলিঃ)	১০০	১৪৬	১২০	১০৪
গম (বোঃ)	১০০	১৬৫	১৩৮	১০৫
চাউলঃ (কলিঃ)	১০০	৮৩	৮৮	৯৭
সরিষা (করাঃ)	১০০	১১১	৮৯	৮৮

	সেপ্টঃ ১৯৩১	সেপ্টঃ ১৯৩২	সেপ্টঃ ১৯৩৩	সেপ্টঃ ১৯৩৪
চা (কলিঃ)	১০০	৯২	১৭৩	১৭৬
তূলা (বোঃ)	১০০	১৭০	১৩৪	...
তূলা বীজ (বোঃ)	১০০	১১৬	৮৭	৯৩
নীল (কলিঃ)	১০০	৮৪	৬৬	৬৬
পাট (ঐ)	১০০	৯৮	৮৪	৭২
চিনি (ঐ)	১০০	১০৭	১০৩	৯৫
ঘি (ঐ)	১০০	৯১	৮১	৯১
সরিষার তৈল (ঐ)	১০০	৯৩	৭৩	৮১
তামাক (ঐ)	১০০	১২৩	১৪৬	...
চিনি (ঐ)	১০০	১৩৪	১৮৬	১৯৪
কয়লা (ঐ)	১০০	৯৭	৭৮	...
পশম (করাচী)	১০০	৮৫	১০৭	...
পিগ্ লোহা (কলিঃ)	১০০	১০০	৭৩	৭৩
কেরোসিন তৈল (ঐ)	১০০	১০২	১০২	৮৯
নারিকেল তৈল (বাঙ্গা)	১০০	১২৫	৯৩	...
চিনা বাদাম (মাদ্রা)	১০০	৯৬	৭০	৮৫

কয়েকটী পণ্যের দরের ওঠা-নামা

(শতকরা বাড়া কমা)

পণ্য	টাকায় দর সেঃ ১৯৩১ হইতে সেঃ ১৯৩২	সোণায় দর সেঃ ১৯৩১ হইতে সেঃ ১৯৩৪	সোণায় দর সেঃ ১৯৩১ হইতে সেঃ ১৯৩২
১। চাউল (কলিঃ)	—১৭	—৩	—৪২
২। পাট (কলিঃ)	—২	—২৮	...
৩। গম (বম্)	+৬৫	+৫	+২০

	টাকায় দর		সোণায় দর
	সেঃ ১৯৩১ হইতে সেঃ ১৯৩১	সেঃ ১৯৩১ হইতে সেঃ ১৯৩২	সেঃ১৩৩১ হইতে সেঃ ১৯৩২
৪। তূলা (ঐ)	+৭০	+৪৯	+২৪
৫। কার্পাস বীজ (ঐ)	+১৬	−৭	−১৫
৬। নীল (কলিঃ)	−১৬	−৩৪	−৩৯
৭। চা (কলিঃ)	−৮	+৭৪	...
৮। ডাল (ঐ)	+৩	−৮	...
৯। চিনি (ঐ)	+৭	−৫	...
১০। ঘি (ঐ)	−৯	−৯	−৩০
১১। পাত গালা (ঐ)	−১৯	+৬৭	−৭০
১২। চাউল (রেঙ্গুণ)	−১১	...	−৩৫
১৩। গম (কলিঃ)	+৪৬	+৪	+৬
১৪। সরিষার তৈল (ঐ)	−৭	−১৯	...
১৫। তামাক (ঐ)	+২৩	...	−১১
১৬। দিয়াশালাই (কঃ)	+৩২	+৬৯	−১৭
১৭। সেগুন কাঠ (কলিঃ)	−১৫	−১৯	...
১৮। টিন (ঐ)	+৩৪	+৯৪	−৩
১৯। কয়লা (কলিঃ)	−৩	...	−৪৩
২০। কেরোসিন তৈল (কলিঃ)	+২	−১১	−২৬
২১। পশম (করাচী)	−১৫	...	...
২২। লবণ (কলিঃ)	−১১	−১৬	−৩৫
২৩। পিগ্‌লোহা (কলিঃ)	±	−২৭	...
২৪। চামড়া (কলিঃ)	+৩	−১৪	...
২৫। নারিকেল তৈল (বাঙ্গাঃ)	+২৫	...	−৮
২৬। বাদাম (মাদ্রাজ)	−৪	−১৫	−১৭
২৭। সর্ষপ (করাচী)	+১১	−১২	−১৯

সূচি-সংখ্যা
১৯২৯ সেপ্ট = ১০০
সূচি-সংখ্যা
তামাক
চিনি
তামাক

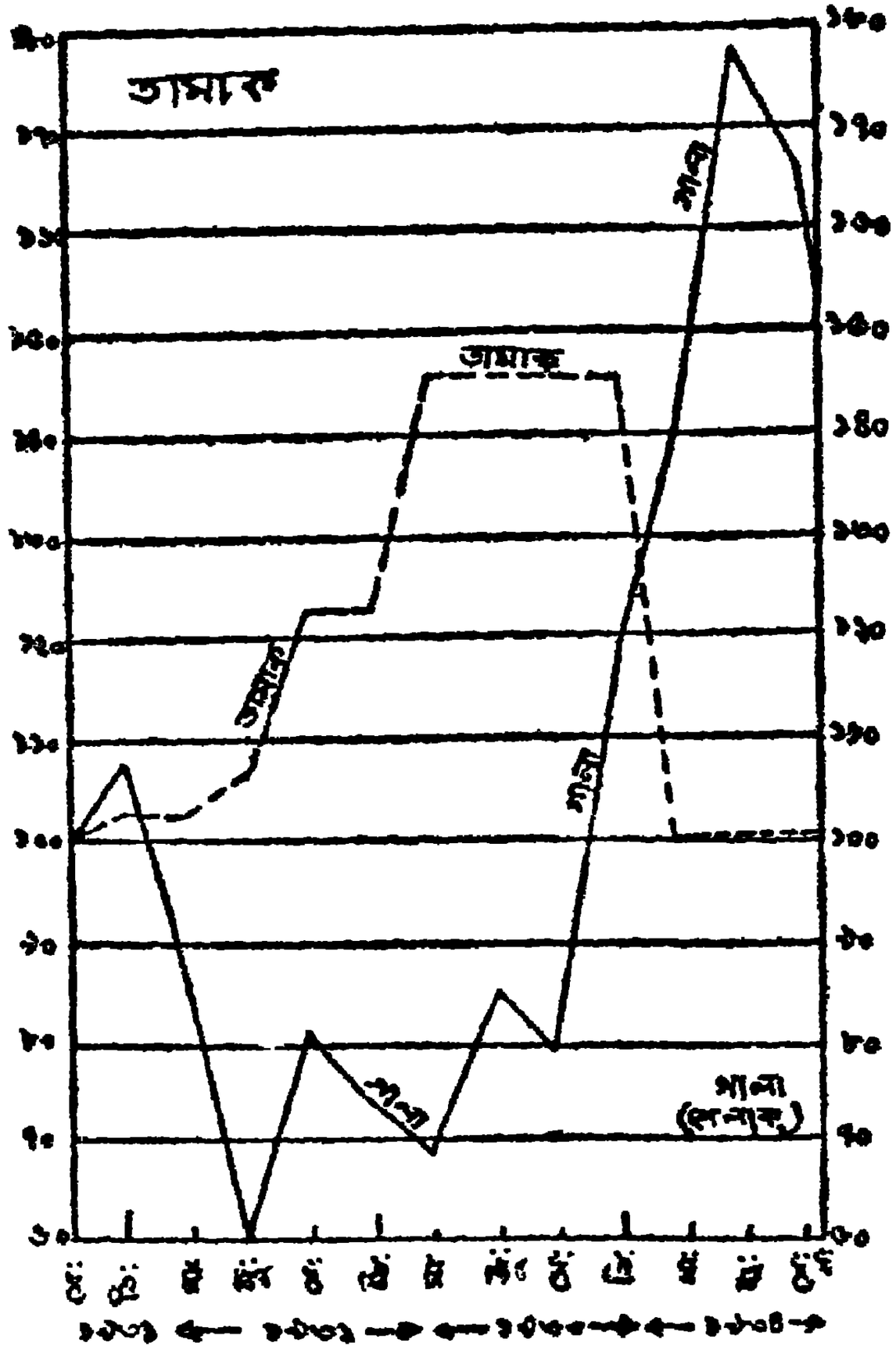

সূচি-সংখ্যা
১৯২৯ সেপ্ট = ১০০
সূচি-সংখ্যা

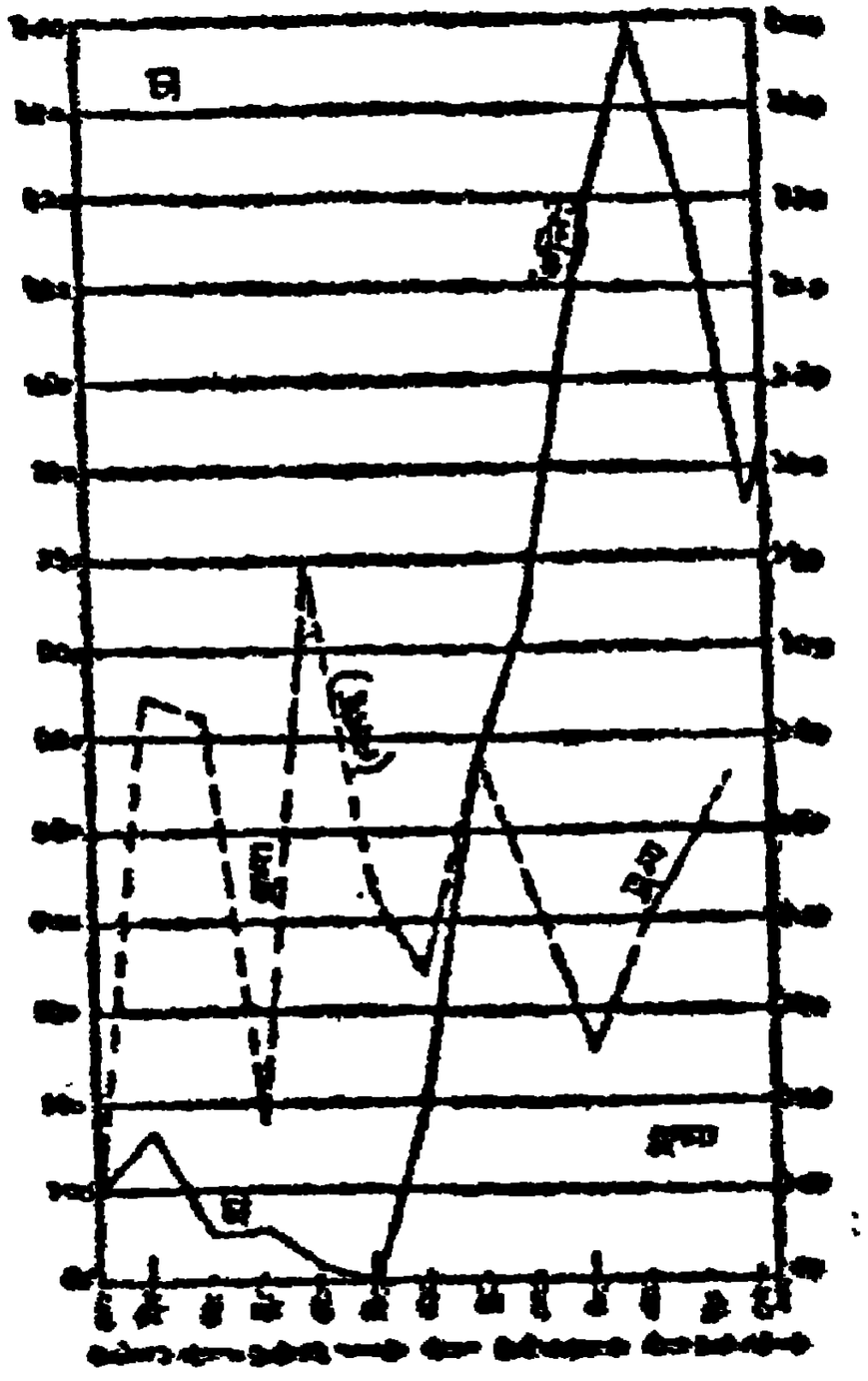

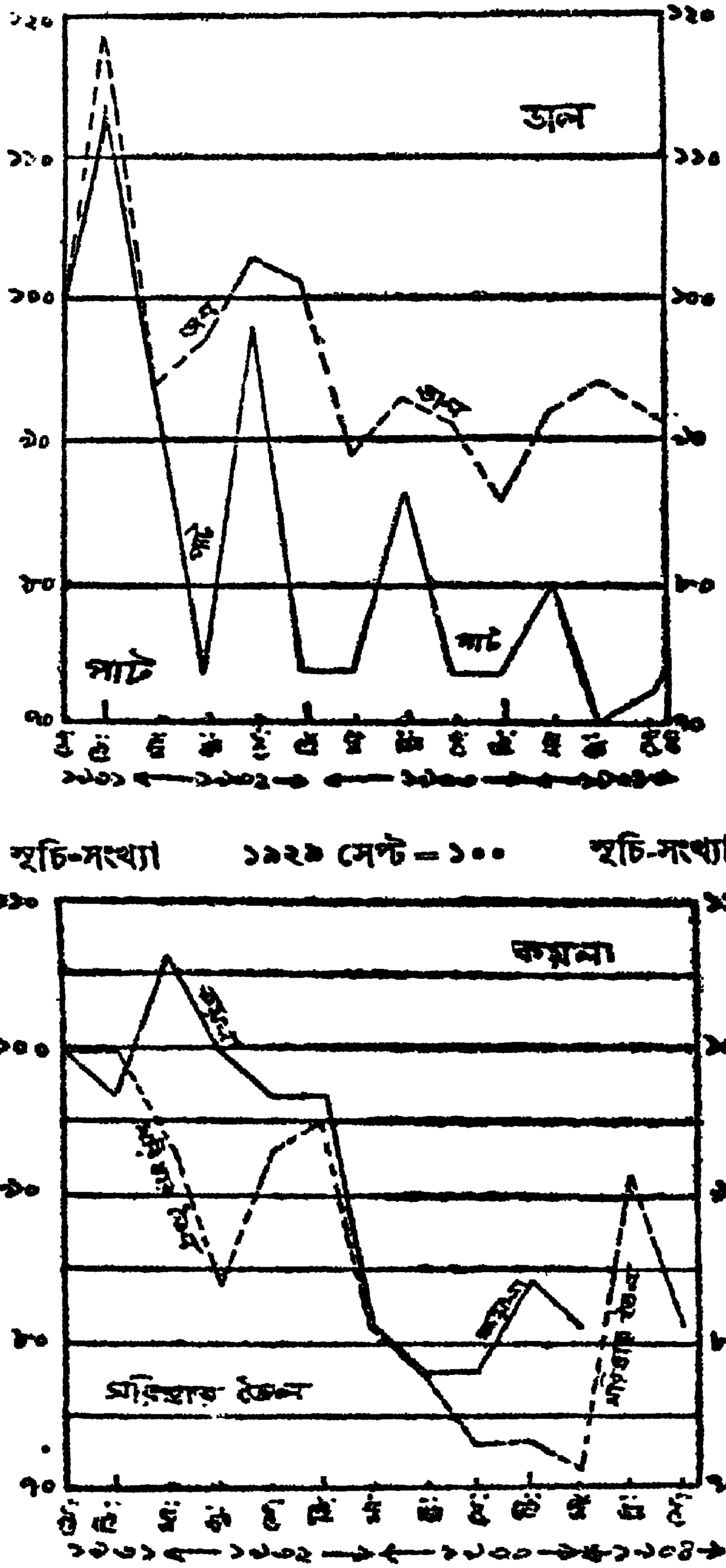

সূচি-সংখ্যা
১৯২৯ সেপ্ট = ১০০
সূচি-সংখ্যা
ডাল
পাট
১৯৩১
১৯৩২
১৯৩৩
১৯৩৪

সূচি-সংখ্যা
১৯২৯ সেপ্ট = ১০০
সূচি-সংখ্যা
কয়লা
১৯৩১
১৯৩২
১৯৩৩
১৯৩৪

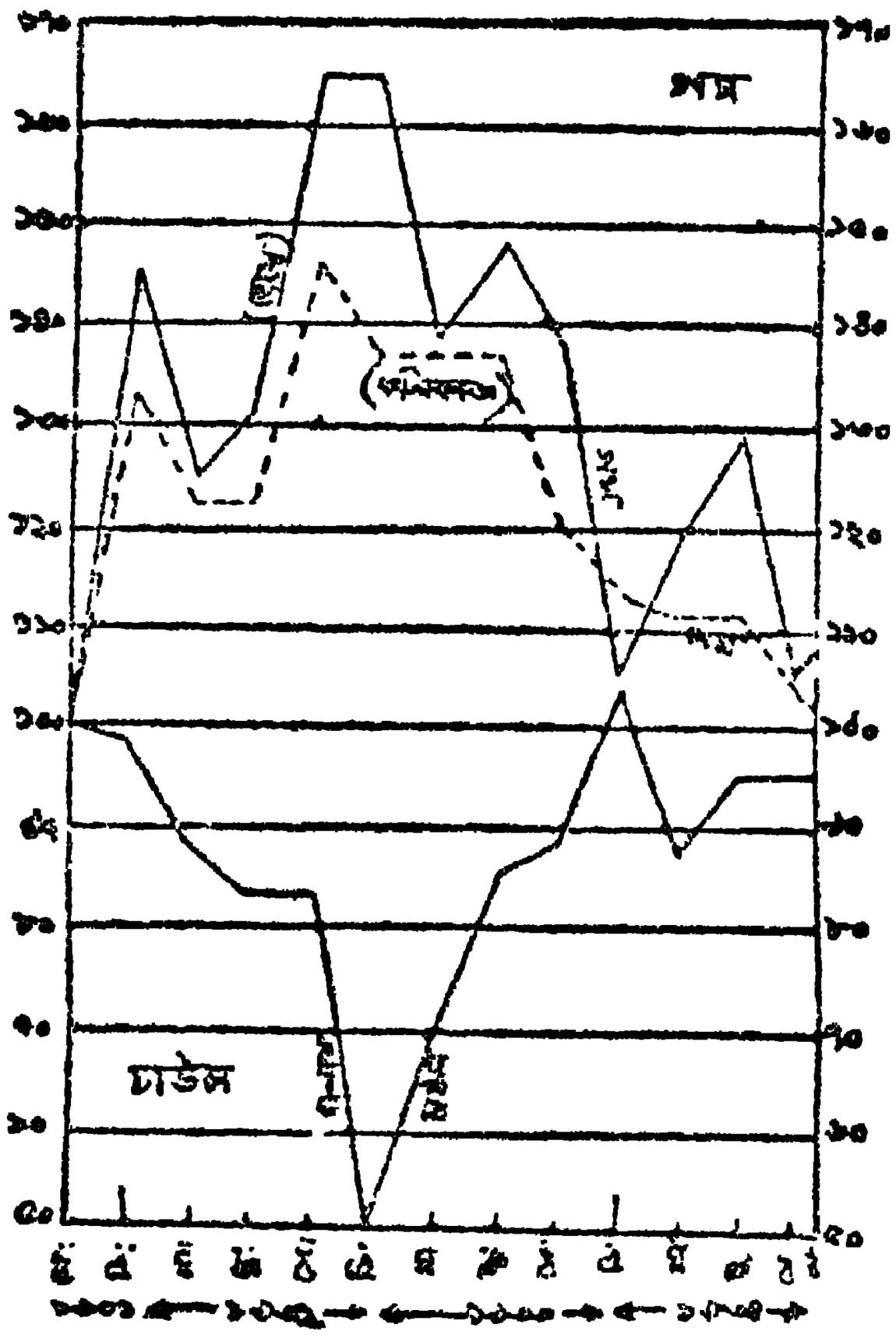

দেখা যাইতেছে যে, ভারত স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া পাউণ্ডের সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে গম, কার্পাস বীজ, তূলা, চিনি, তামাক দিয়াশালাই, টিন্, নারিকেল তৈল, সরিষা, চাম্‌ড়া এবং চিনাবাদামের দর কিছু বাড়িয়া যায়; বাকী সব পণ্যের দর তুলনায় বরং নামিয়াই যায়। কেবলমাত্র টিন ও দিয়াশালাই এবং কিছু পরিমাণে চা ও তূলার দর একটানা বাড়িয়াছে। পাট, নীল, সরিষার তৈল, সেগুন কাঠ, পিগ্‌লোহা, লবণ ও চীনাবাদামের দর অন্যান্য পণ্যের তুলনায় অধিক পড়িয়াছে। পাটের দর জুন '৩৪শে ৩০%, চিনাবাদাম

মার্চ '৩৪শে ৫০%, চাম্‌ড়া জুন '৩২শে ২৮%, পিগ্‌ লোহা মার্চ '৩৩শে ২৭%, লবণ সেপ্টেম্বর '৩৩শে ২২%, সরিষা মার্চ' '৩৪শে ২১%, সরিষার তৈল মার্চ' ৩৪শে ২৯%, গালা জুন' ৩২শে ৩৯%, নীল জুন '৩৩শে ৩৪% এবং ঘি ডিসেম্বর '৩৩শে ২৩% নামিয়া যায়। স্বর্ণমান-ত্যাগের অব্যবহিত পরেই গম, তূলা, তামাক, দিয়াশালাই, টিন ও নারিকেল তৈলের দর ২৫% হইতে ৭০% পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়; তবে এই 'প্রেসিপিটেটেড্‌ রাইজ্‌' বা বিপর্য্যয় বাড়া অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। মাত্র টিন ও দিয়াশালাইয়ের দর ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বরে যথাক্রমে ৬৪% ও ৯৪% বাড়িতে দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে চা ও পাত গালার দর প্রথম এক বৎসরে যদিও ৮% ও ১৯% নামিতে দেখা গিয়াছে, তথাপি তিন বৎসরের শেষে ১৯৩৪এর সেপ্টেম্বরে ৭৪% ও ৬৭% চড়িতেই দেখা যাইতেছে। পাট, নীল, সেগুন কাঠ, কেরোসিন তৈল, পিগ্‌ লোহা, চাম্‌ড়া, চিনাবাদাম ও ও সর্ষপের দরের নামার দিকেই ঝোঁকটা বেশী। পিগ্‌ লোহা, নীল, তামাক, দিয়াশালাই ও লবণের দর ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে 'ষ্টেডি' বা স্থির থাকিতে দেখা যাইতেছে। বিভিন্ন পণ্যের যে কার্ভ বা চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে মনে হয় যে আর্থিক দুর্গতির চরম সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন দুনিয়া উন্নতির পথে চলিতেছে।

অটাওয়া

বাংলা দেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ পাট এবং তাহার পরই ধান। বাংলার আর্থিক অবস্থা এই দুইটী ফসলের অবস্থা দেখিলেই বোঝা যায়। এই ১৯৩১ সনের হিসাবেই দেখা যায় যে, বাংলা দেশ হইতে

বিদেশে মোট-রপ্তানীর মূল্য প্রায় ৫২ কোটী টাকা এবং তন্মধ্যে কাঁচা পাট ও পাটজ পণ্যের মূল্য প্রায় ৩১ কোটী টাকা অর্থাৎ পাটের দরুণই বিদেশ হইতে ১০০ ভাগের ৬ ভাগ টাকা আসিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে ভারতের মোট রপ্তানীর মূল্য ছিল ৩৭৪·৮৪ কোটী টাকা; ইহার মধ্যে পাট ও পাটজ পণ্যের জন্য পাওয়া গিয়াছিল ৯৬·৭৯ কোটী টাকা; ১৯৩১-৩২ সনে তাহাই দাঁড়াইয়াছে ৩৩·১১ কোটী টাকা। ব্যবসা-মন্দার ফলে পাটের দাম যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে কলিকাতার বাজারে পাটের দর ছিল মণ প্রতি ১১৵৭ পাই আর ১৯৩৪ সনে বিকাইয়াছে ৫৵১ পাই মণ দরে। ১৯২৯ সালে ৩০ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল; ইহার পরবর্ত্তী ৫ বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ কম করা হইয়াছে, তথাপি দর বাড়ে নাই। ১৯২৭ সন হইতে স্থানীয় চটকলে মজুতের পরিমাণ অধিক হওয়ায় পাটের দর বাড়িতে পারে নাই।

বৎসর	চটকলে মজুত পাট	গড়-দর গাঁট প্রতি
১৯২৬	১৬·০ লক্ষ গাঁট	৯৮·৭
১৯২৭	৩৬·০ ,,	৭৬·৪
১৯২৯	৩৮·০ ,,	৭১·৩
১৯৩১	৫১·৫ ,,	৩৭·৩
১৯৩২	৪২·০ ,,	৩১·৭
১৯৩৩	৪৬·৫ ,,	২৮·৮
১৯৩৪	৪৪·২ ,,	২৫·৫

অধিকন্তু পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। বিদেশে অধিকতর পরিমাণে মাল বেচিতে পারিলেও দর উঠিতে পারিত। পাট সম্বন্ধে ভারতের একচেটিয়া থাকিলেও, যথেচ্ছা দামে

বেচিতে পারে না ; তাহার কারণ, যদি যোগানের তুলনায় চাহিদা প্রচণ্ড হইত, তাহা হইলে ভারত ইচ্ছামত মূল্য আদায় করিতে পারিত। আবার কাঁচা পাট সম্বন্ধে ভারতের একচেটিয়া থাকিলেও, পাটজ পণ্য প্রতিযোগিতায় বেচিতে হয়।

সহস্র টনে

রপ্তানী	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
কাঁচাপাট	৮০৬'৯	৬১৯'৬	৫৮৬'৬	৫৬৩'১	৭৪৮'৩
পাটজ পণ্য	৯৫৮'০	৭৬৬'৬	৬৬৩'৬	৬৭৯'৭	৬৬৩'১

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাটজ পণ্যের বড় খরিদ্দার। ১৯২৯-৩০ সনে ১৮,৭৬,৬১,০০০ টাকার পাটজ পণ্য যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে আমদানী করে। ১৯১৩-১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় আমদানীর ৪১'৫% ছিল পাটজ পণ্য। আর্থিক দুর্য্যোগের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। কাঁচা পাটের বাজার হিসাবে যুক্তরাজ্যের পরই জার্ম্মানীর স্থান। ১৯২৯-৩০ সনে জার্ম্মানী ৭,৪০,৬৪,০০০ টাকার কাঁচা পাট ভারত হইতে আমদানী করে ; কিন্তু ১৯৩১-৩২-শের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৩,৬৯,০০০ টাকা। অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য জার্ম্মানীও পাট আমদানী কম করিয়া আনিয়াছে। যুক্তরাজ্যই পাট ও পাটজ পণ্যের বড় বাজার। কিন্তু এই বাজারে পাটজ পণ্যের জন্য ব্রিটিশ, ইতালী ও জার্ম্মানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। ইতালীর পাট শিল্পে ৫,০০০ তাঁত ও ৮৫,০০০ টাকু নিয়োজিত আছে। ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ মধ্যে পাটজ-পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯২৯ সনে ইতালী ১,৪৫,০০০ কুইন্ট্যাল পাটজ পণ্য রপ্তানী করে। সুতরাং এই প্রতিযোগিতাও আমাদের পাটশিল্পকে বেগ দিতেছে।

১৯২৯ সনে বাংলা চাউল বেচিয়া পাইয়াছিল ১৭১ কোটী টাকা আর ১৯৩৩ সনে পাইয়াছে ৮৩ কোটী টাকা অর্থাৎ ৪।৫ বৎসরে এক চাউল হইতেই ৮৮ কোটী টাকা কম পাইয়াছে। পাট ও চাউলের হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বাংলা এক বৎসরে প্রায় ১২০ কোটী টাকা কম পাইয়াছে। কৃষকের ক্রয়শক্তি এরূপ বিপজ্জনকভাবে কমিয়া যাইলে, পণ্যের দর বাড়িবে কি প্রকারে? ভারত, শ্যাম দেশে চাউল বিক্রয় করিয়া থাকে। ১৯৩০-৩১ সনে ভারত ১৮৷৷০ লক্ষ টাকার চাউল শ্যামে রপ্তানী করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ হইতে শ্যামে ভারত হইতে চাউল রপ্তানী করা ত' দূরে থাকুক—শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীন হইতে ভারতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে চাউল-আমদানীর বিভীষিকা দেখা দিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ এ জাপান হইতেও চাউল আমদানী হইয়াছিল; জাপানে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ঐ রপ্তানী বন্ধ করা হয়। শ্যামদেশ হইতে যে চাউল এদেশে আসে, তাহার মূল্য ভারতের চাউল অপেক্ষা থলিয়া-প্রতি ১ টাকা কম। ফলে যে সকল বন্দরে এই চাউল নামে, সেইখানে ও আশে-পাশে চাউলের দর পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্রই চাউলের বাজার পড়িয়া যায়।

১৯৩১ সনে বিদেশ হইতে গম আমদানী হওয়ায় গমের বাজারেও ঐরকম বিপদ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে ভারতের গম-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ টন, আর আমদানী হইয়াছিল মাত্র আড়াই লক্ষ টন গম। গমের বাজারকে নিরাপদ করিবার জন্য ভারত-সরকার গম-সংরক্ষণ আইন 'পাস' করেন।

চিনি সম্বন্ধে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকার প্রয়োজনীয়তা গত মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তাই যুদ্ধের

পর ভারত-সরকার ভারতের ইক্ষু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিনিখাদক দেশ। ট্যারিফ বোর্ডের বিবরণী লিপিবদ্ধ হওয়ার সময়ে বৎসরে ১০ লক্ষ টন চিনি ভারতে আমদানী হইত; দেশের মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ টনের কাছাকাছি চিনি প্রস্তুত হইত। ভারত চিনি সম্বন্ধে সহজেই স্বাধীন হইতে পারে। ৩।৪ বৎসর হইল চিনিশিল্পের জন্য সংরক্ষণী শুল্কের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহার ফলে এই শিল্প প্রগতির পথে যাইতেছে। ১৯২৯ সনে ভারতে চিনি-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৭,৯৬২ কুইন-ট্যাল আর ১৯৩৩শে দাঁড়ায় ৫১,৪৮৩ কুইন্ট্যাল। শুল্কপ্রাচীরের আড়ালে চিনি-শিল্প ভারতে নবজীবন লাভ করিলেও, জাভাচিনির প্রতিযোগিতায় ভারতীয় উৎপাদকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

চা-শিল্প ভারতের একটী প্রধান শিল্প। দুনিয়ার অন্যান্য দেশ একত্র যত চা রপ্তানী করে, ভারত একা তার চেয়ে বেশী রপ্তানী করে। বিলাতই চা-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল এবং পৃথিবীর উৎপন্ন চায়ের প্রায় ⅝ অংশ বিলাতে রপ্তানী হয়। দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগের ফলে চা-খোর দেশগুলির অধিবাসিদিগের ক্রয়শক্তি কমিয়াছে; অধিকন্তু সেদিন পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চা উৎপন্ন হইয়াছে। তাই মজুত চায়ের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। বিলাতের বাজারের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মজুত চায়ের বাড়া-কমার সহিত চায়ের দর উঠিয়াছে-নামিয়াছে। চা-উৎপাদন যে অনুপাতে বাড়িয়াছে, সে অনুপাতে চা-পান বৃদ্ধি পায় নাই। ভারতীয় চা-অ্যাসোসিয়েশন চা-পান-বৃদ্ধির প্রচার-কল্পে ভারতে ও ভারতের বাহিরে যথেষ্ট টাকা খরচা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। চা-ব্যবসায়ের সঙ্কট-দূরীকরণার্থ ভারতবর্ষ, সিংহল, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিসের মধ্যে চা-উৎপাদন

সম্বন্ধে ৫ বৎসরের জন্য একটী চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। চা-নিয়ন্ত্রণের প্রথম নয় মাসের মধ্যেই সাধারণ চায়ের দর দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। ১৯৩৩ এর জানুয়ারী মাসে চায়ের গড়-দর ছিল পাউণ্ড-প্রতি ৭·৭১ পেঃ, ডিসেম্বর মাসে দর দাঁড়ায় পাউণ্ড-প্রতি ১ শিং ২·৮৩ পেঃ। মাঝারি চায়ের মূল্য ও চাহিদা কিছু বৃদ্ধি পাইলেও, উৎকৃষ্ট চায়ের চাহিদা মোটেই বাড়ে নাই। পক্ষপাতমূলক শুল্ক-নীতির জন্য নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় চা বিক্রী সুবিধাজনক হয়। কিন্তু আমেরিকায় ডাচ্ চা-ই বেশী বিকাইয়াছে। ১৯৩৩ সনে এক বৎসরে আমেরিকায় ব্রিটীশ চা-আমদানী ৭৭,৫০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজনের হ্রাস পাইয়াছে আর ডাচ্ চা-আমদানী বাড়িয়াছে ৭৫,০০,০০০ পাউণ্ড ওজনের।

ভারতবর্ষে গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া কয়লার ব্যবসায়ে খুব মন্দা দেখা যায় এবং তাহার ফলে কয়লার দরও হ্রাস পায়। মাইনিং ফেডারেশনের রিপোর্ট-অনুসারে ১৯৩১ সন খুব দুর্ব্বৎসর। ১৯৩০ সনের তুলনায় ১৯৩১ সনের শেষ পর্য্যন্ত টন-প্রতি ৪ আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত দর কমিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার ফলে চটকল ও অন্যান্য কল কম পরিমাণে কয়লা ব্যবহার করে; আমদানী-রপ্তানী কম হওয়ার জন্য ষ্টীমার ও রেল কোম্পানীর কয়লার চাহিদা কমিয়া যায়, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে কয়লার বদলে, তৈল ব্যবহার বেশী হইতে দেখা যায়। এই সব কারণে কয়লার চাহিদা হ্রাস পাওয়ায়, দরও নামিয়া যায়। অধিকন্তু কয়লার রেল-মাশুলের উপর ১৫% সার্-চার্জ্জের ব্যবস্থা হওয়ায় কয়লা-উৎপাদকগণ অসুবিধা ভোগ করেন। তাই কয়লা উৎপাদন ও আমদানী রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে।

খৃঃ	উৎপাদন (সহস্র মেট্রিক্ টন)	আমদানী	রপ্তানী
১৯৩০	২৩,৭২১	২১৭,০২৯ টন	৪,৬১,১৮৮ টন
১৯৩১	২১,০২৬	৮৮,০৩৫ ,,	৪,৪১,২৪৯ ,,
১৯৩২	১৯,৪০১	৪৭,৫৪৪ ,,	৫,১৯,৪৮৩ ,,
১৯৩৩	১৮,৩০৬	—	—

দেশে যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহাতে সঙ্কুলান হয় না; বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর কয়েক কোটী গজ কাপড় আমদানী করিতে হয়। ইংলণ্ড ও জাপান হইতেই উহা আসে। যুদ্ধের পরে ভারতে বিলাতী কাপড়-বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত কমিয়া আসে; কিন্তু বিলাতী কাপড়-আমদানী হ্রাসের সহিত জাপানী বস্ত্র-আমদানী বাড়িতে থাকে। ভারতীয় কলওয়ালারা সস্তা জাপানী কাপড়ের সহিত টক্কর দিতে পারে না; তাই জাপানী বস্ত্র আমদানি প্রতিরোধ করার জন্য শতকরা ৫০৲ টাকা হারে অতিরিক্ত শুল্কের ব্যবস্থা হয়। জাপান ভারতীয় তূলার সব চেয়ে বড় খরিদ্দার। এই প্রতিরোধমূলক শুল্ক কায়েম করায় জাপানীরা অসন্তুষ্ট হইয়া ভারতীয় তূলা বর্জ্জন করে। এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয় জাপান ও ভারতের মধ্যে চুক্তি করিয়া।

ভারতই একমাত্র গালা উৎপাদন করিয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতি হন্দর গালার (শেল্যাক্) দর ছিল ৬১ শিলিং; তাহাই ১৯১৯ ডিসেম্বরে দাঁড়ায় ৫৭০ শিলিং। ১৯২০ সালে ১টন গালার দর দাঁড়ায় ১০০০ পাউণ্ড। গত কয়বৎসরে দরের এই অস্বাভাবিকরূপ আর দেখা যাইতেছে না—

	সর্ব্বোচ্চ মাত্রা হন্দর প্রতি	সর্ব্বনিম্ন মাত্রা হন্দর প্রতি
১৯৩০-৩১	১৩০ শিলিং	৭০ শিলিং
১৯৩১-৩২	৭৮।৬ ,,	৬৬ ,,
১৯৩২-৩৩	৬৭ শিলিং	৫০ শিলিং
১৯৩৩-৩৪	৯৩ ,,	৫৫ ,,

এক শ্রেণীর ভারতীয় গালাকে 'টি-এন্' মার্কা দেওয়া হয়; ১৯৩৩ সনে ইহার দর ছিল ১২৲ টাকা মণ; ১৯৩৪ সনে ইহা মণ প্রতি ৪০৲ দাঁড়ায়। ১৯২৬ হইতে ১৯২৯ এর মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গালা বিদেশে রপ্তানী হয় কিন্তু ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যায়।

১৯২৬ সন	৩,১৭,৬৭৮ হন্দর
১৯২৯ ,,	৫,৫৪,৯০৯ ,,
১৯৩০ ,,	৪,২৩,৭৫৩ ,,
১৯৩১ ,,	৩,৩৯,৪৭৭ ,,
১৯৩২ ,,	৩,০২,৩৯৫ ,,

মার্কিণে আর্থিক দুর্য্যোগের ফলে ১৯২৯-৩২ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চাঁচ-গালা বেচা সুবিধাজনক হয় নাই; তা'ছাড়া রেডিও-প্রচলন হওয়ার ফলে গ্রামোফোনের আদর কমিয়া গিয়াছে এবং সাথে সাথে গালার চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আমরা যুক্ত-রাজ্যকে চাঁচ-গালার বড় খরিদ্দাররূপে পাইয়াছি।

		যুক্তরাজ্য	আমেরিকা
১৯৩২	চাঁচগালা (শেল্যাক্)	৮১,৮৬৪	৮১,৬১৮
,,	গার্ণেট	৫,৭৭৬	৪,৬০৭
,,	বোতাম (বাট্‌ন্)	১২,১৯০	৯৫৪
১৯৩৩	চাঁচগালা	১,৭৩,৪১১	৫৫,১৩৯

		যুক্তরাজ্য	আমেরিকা
১৯৩৩	গার্ণেট্	৬,৮৬৪	১,৮৮২
,,	বোতাম	১৬,০৫৭	১,৬৮৭

ভারতে লবণ আসে সাধারণতঃ এডেন, লিভারপুল ও হ্যামবুর্গ হইতে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্পেনের করকচ ও লোহিত-সাগরের সস্তা নুন যথেষ্ট আমদানী হয়; ফলে লিভারপুলের নুন আমদানী ১০% আর হ্যাম্‌বুর্গের ৪% কমিয়া যায়। কলিকাতার নুনের দর শতকরা ৩৬৲ টাকায় নামিয়া আসে। করাচী ও ওখার নুন সরবরাহকারীদের আন্দোলনের ফলে মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা হারে রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য হয়। ফলে দর চড়িয়া যায়। ১০ই মার্চ্চ ১৯৩১ কলিকাতার বাজারে এডেন লবণের দর ছিল শত মণের দাম ৩৬৲ টাকা, তাই ২০শে মার্চ্চ দাঁড়ায় ৬২।৬৩৲ টাকা; ১৯৩২ সনের শেষ অবধি এই দর ছিল। লিভারপুল লবণের দর ১৯৩৪ সনের প্রথমে দাঁড়ায় ৫১৲ টাকা।

তৈরী মালের তুলনায় কাঁচা মালের উৎপাদন এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে, তৈরী ও কাঁচা মালের মধ্যে মূল্যের সামঞ্জস্য লোপ পাইয়া কাঁচা মালের দর পড়িয়া যায়। ফলে কৃষকদের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায় এবং তৈরী মালের দরও নামিয়া যায়। অন্যান্য পণ্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের দর বেশী নামে, ইহার হেতু এই যে, কারখানাজাত পণ্য বা ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল প্রডাক্টসের চাহিদা-মাফিক উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু কৃষিজ পণ্যের বিশেষতঃ খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন-সঙ্কোচ সহজে করা সম্ভব হয় না। ১৯৩৪ সনের মার্চ্চ মাসে, ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বরের তুলনায় তৈরী মালের দর ৪% বাড়িলেও, কাঁচা মালের দর ৭% নামিয়া গিয়াছে দেখা যায়।

শতকরা পরিবর্ত্তন

	১৯৩১ সেঃ হইতে ১৯৩২ „ পর্য্যন্ত	১৯৩১ সেঃ হইতে ১৯৩৩ „ পর্য্যন্ত	১৯৩১ সেঃ হইতে ১৯৩৪ মাঃ পর্য্যন্ত
কাঁচামাল		—৭	—৭
খাদ্যদ্রব্য		+৪	+৮
তৈরীমাল	+১	+৫	+৪

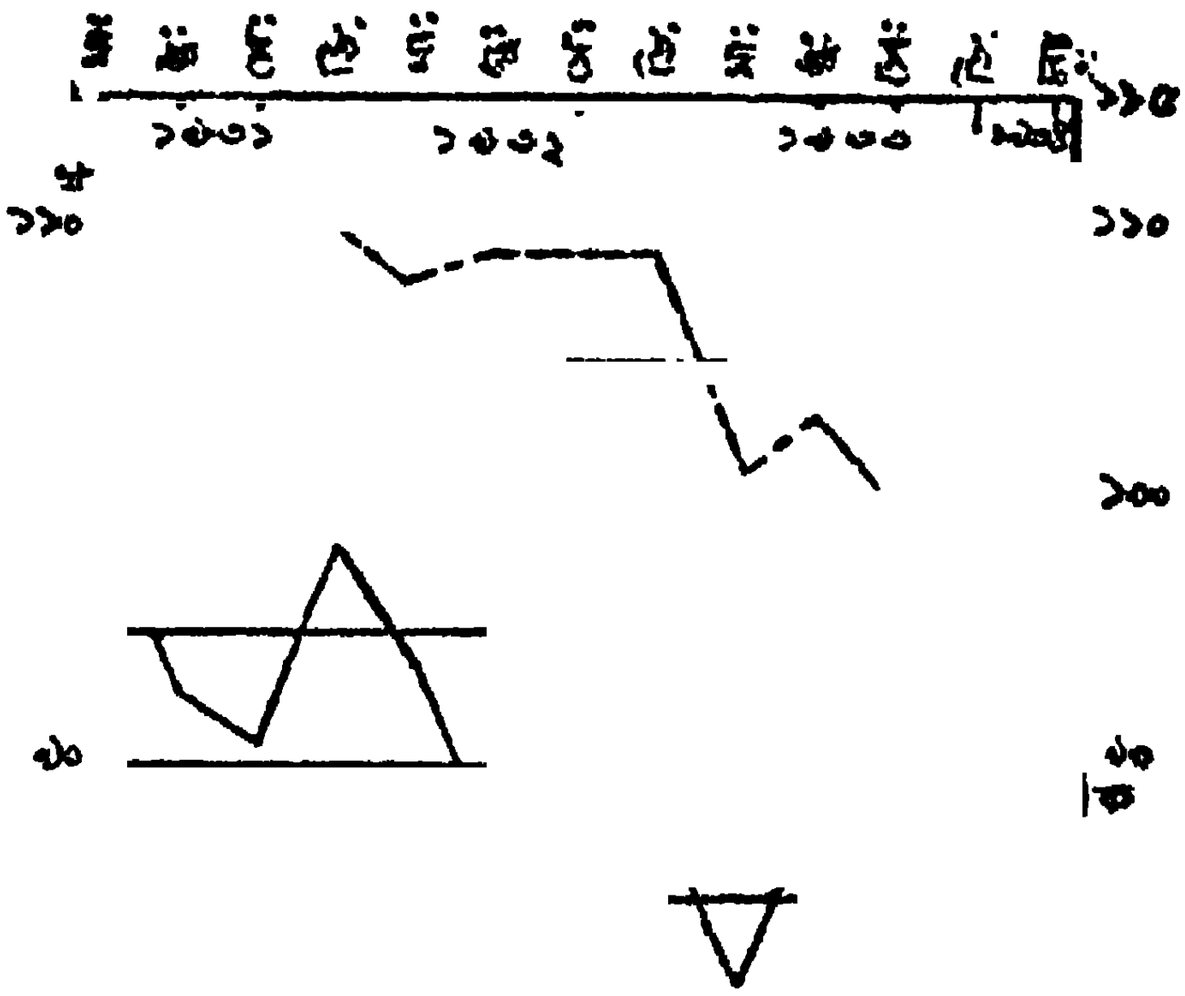

পাইকারী ও খুচরা দর বা হোল্‌সেল ও রিটেল প্রাইসেস্ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, খুচরা দরের তুলনায় পাইকারী দর দ্রুত পড়িয়াছে। ১৯৩১শের সেপ্টেম্বরের তুলনায় পাইকারী দর ১৯৩২শের জানুয়ারীতে ৬ পয়েন্ট বাড়িলেও ডিসেম্বরে তিন পয়েন্ট নামিয়া

কাঁচা মাল বেচিতে পারিতেছে না, তাই সোণা দিয়াই তাহা পরিশোধ করিতে হইতেছে। সোণাও একটী পণ্য। যেখানে পণ্যের দাম বেশী পাওয়া যাইতেছে, তথায় ইহা সরিয়া পড়িতেছে। ১৯২৩ হইতে ১৯৩০ এর মধ্যে ভারতে রপ্তানী বাদ দিয়া মোট ২১০ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার সোণা আসিয়াছে; আর স্বর্ণমান-ত্যাগের সময় হইতে ২৪শে নভেম্বর '৩৪ পর্য্যন্ত ২০৪ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার সোণা ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে। বাণিজ্যিক লেন-দেনে সোণা যেমন আমদানী হইয়াছিল, তেমনি আবার রপ্তানী হইতেছে; আবার ফিরিয়া আসাও কিছু বিচিত্র নয়। তবে মনে হইতে পারে যে, নোটের তুলনায় 'গোল্ড্ রিসার্ভ' বা মজুত সোণা বুঝি কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু সে রকম কোন ভয়ের কারণও দেখা যাইতেছে না।

খৃঃ	নোট সার্কুলেশন্ (০০০,০০০)	গোল্ড রিজার্ভ (০০০,০০০)	রূপা রিজার্ভ (০০০,০০০)
১৯৩০	১,৬১৩ টাকা	৩৫২	১,২০০
১৯৩১	১,৭৯৩ ,,	৪৪৩	১,২৩০
১৯৩২	১,৭৪৮ ,,	৪৪৪	১,১০৭
১৯৬৩	১,৭৮১ ,,	৪৪৪	১,০১২

রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য ভারতকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় আর্থিক দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে দর নামিতে থাকে। আমদানী পণ্যের তুলনায় রপ্তানী মালের মূল্য প্রায় ২৷৷০ গুণ কমিয়া যায় এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের দরুণ লোকের ক্রয়শক্তিও কমিয়া যায়। এই আর্থিক সঙ্কটের প্রতিকারকল্পে

উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণমান-ত্যাগ, পক্ষপাতমূলক শুল্ক প্রভৃতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলে। ১৯৩২ সালে অটাওয়ায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহা পক্ষপাতমূলক। ইংলণ্ডের যে সকল উপনিবেশ আছে, তাহাদের লোক-সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০,০০০। এই উপনিবেশগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের; দিন দিন ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতের মোট সামুদ্রিক বাণিজ্যের তুলনায় ইহা প্রায় সমান। সুতরাং এই উপনিবেশগুলিতে ভারতের মাল বেচার যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অটাওয়া চুক্তিতে ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলিকে পক্ষপাত দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ইংলণ্ড বা উপনিবেশগুলি যদি ভারতে পণ্য বেচিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে শুল্ক দিয়া আসিতে হইবে; কিন্তু ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যে-সব দেশ আছে, তাহারাও যদি সেই একই পণ্য ভারতে বেচিতে চায়, তবে সেই সব দেশজাত পণ্যকে যে-পরিমাণ শুল্ক দিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে হইবে, সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে তাহাপেক্ষা কম শুল্ক দিতে হইবে এবং ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারতীয় পণ্যও ঐসব দেশসমূহে পক্ষপাত পাইবে। সুতরাং উপনিবেশগুলিতে ভারতের পক্ষে মাল বেচা সুবিধাজনক হইবে এবং পণ্য বেচিবার সুবিধা হইলে যে দরও চড়িবে, ইহা অনুমান করা যায়। কিন্তু, পণ্যকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যে শুল্ক ধার্য্য করা হয়, আর পক্ষপাতমূলক যে শুল্ক তাহার ফল একটু বিভিন্ন হইয়া থাকে। সংরক্ষণ-শুল্কের ফলে পণ্যের দর চড়িয়া যায়, কিন্তু পক্ষপাতমূলক শুল্কের ফলে যে পণ্যের দর চড়িবেই, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। পক্ষপাত যদি

আবার সংরক্ষণমূলক হয়, তবেই দর বাড়িতে পারে। অটাওয়া-চুক্তিতে যে সকল পণ্যে পক্ষপাত দেখান হইয়াছে, সেই সকল পণ্যে শুল্ক পূর্ব্ব হইতেই ছিল, ভারতীয় পণ্যকে রক্ষা করিবার জন্য নূতন কোন শুল্ক ধার্য্য করা হয় নাই, মাত্র সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে একটু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, কয়েকটী পণ্যের শুল্ক ধার্য্য ছিল ২৫%; এখন পক্ষপাতমূলক চুক্তি অনুসারে বলা হইল যে পণ্য যদি ব্রিটীশ হয় তাহা হইলে এই ২৫% এর স্থলে ২০% শুল্ক দিতে হইবে; আর অন্যান্য দেশজাত পণ্যকে ২৫% এর স্থলে ৩০% শুল্ক দিতে হইবে অর্থাৎ ব্রিটীশ পণ্য পাইল ১০% সুবিধা। শুল্ক হারের নাম মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ পণ্যকে সুবিধা দেওয়া হইল। এরূপ ক্ষেত্রে পণ্যের দর যে বাড়িবেই, এমন কথা বলা যায় না। তাই আমরা অটাওয়া-চুক্তির ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ কিছু বাড়িতে দেখিলেও, সব পণ্যের দর বাড়িতে দেখি না।

ষোড়শ অধ্যায়

টাকার বাজার ও সরকারী কর্জ্জ

ভারত সরকারের যে ঋণ আছে, তাহার মধ্য থেকে প্রায় ৩৭ কোটী টাকার ঋণ এই বৎসরে (১৯৩৫) পরিশোধ করার কথা। ৫% সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১,৪৩,৪০,০০০ টাকার ৬½% কোম্পানীর কাগজ ১৬,১০,২০,০০০ টাকার এবং ৬½% সুদের বম্বে ডেভেল্‌পমেণ্ট লোন ৯৩,৮৯,৩৩,০০০ টাকার, একুনে ৩৬,৯২,৫৩,৩০০ টাকার ঋণ ১৯৩৫ সালে সরকারের পরিশোধ করার কথা। ঋণ দেয় হইয়া উঠিলে ও সরকারের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হইলে, টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হয় না; সাধারণতঃ ঋণ পরিশোধের সময় আসিলে সরকার একটা নূতন ঋণ গ্রহণ করেন। যাদের হাতে পরিশোধনীয় কাগজ থাকে তারা সেই কাগজের বদলে নতুন কাগজ গ্রহণ করে। গভর্ণমেণ্ট যদি ঋণের টাকাটা পরিশোধ করিয়া দেন, তাহা হইলে টাকার মালিকদের আবার ভাবিতে হয় আবার কিসে টাকাটা খাটাইবেন, তাই নতুন ঋণে টাকা খাটান যদি লাভজনক মনে হয় তাহা হইলে পুরানো কাগজের বদলে এই নতুন কাগজ নিতে তাঁহারা একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। ভারত সরকারও তাই শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে সুদে ১৫ কোটী টাকার ঋণ সংগ্রহের সঙ্কল্প করেন। টাকার বাজার যে রকম যাইতেছিল তাহাতে শতকরা ৩৲ হারে ঋণ গ্রহণ খুব যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। শতকরা ৫৲ ও ৬৷৷০ টাকা সুদের বদলে সুদের

হার ৩৲ টাকা হওয়ায় দেশের লোকের সুবিধা হইয়াছে, কেননা সুদের টাকা গভর্ণমেণ্ট মিটাইয়া থাকেন করদাতাদের টাকায়। ঋণ-গ্রহণের আবেদন গ্রহণের সময় হইতে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই ১৫ কোটী টাকার মধ্যে ১৩ কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছে ৫% ও ৬½% কোম্পানীর কাগজের মালিকদের কাছ হইতে। বাকী টাকার মোটা অংশ লইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক। এই ঋণের টাকার জন্য অপর্য্যাপ্ত আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। যাঁদের আবেদন গ্রাহ্য করা হয় নাই, তাঁদের টাকা অনতিবিলম্বেই ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল। টাকা খাটাবার ব্যগ্রতা যেখানে এতখানি, সে বাজারে যে ঋণের মূল্য শতকরা ১৲ টাকা অনতিবিলম্বে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। মাত্র দুদিন পরের কথা যদি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে ১৯৪৭-৫০শের কোম্পানীর কাগজের আয় বা 'রিডেম্প্‌শান্ ইল্ড' হইতেছে শতকরা ৩'১৪ টাকা আর ১৯৫৫-৬০ কাগজের শতকরা ৩'৫০ টাকা; আর এই নতুন ১৯৫১-৫৪ কাগজের দর যদি ৯৭৷৷০ আনা ধরা যায় তাহা হইলে, এই নতুন ঋণের রিডেম্প্‌শান্ ইল্ড হইল শতকরা ৩'১৮ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই নতুন ঋণের জন্য সিকিওরিটীর বাজারে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় নাই, বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে।

এই নতুন ঋণের দর সরকার দিয়াছিলেন শতকরা ৯৬৷৷০ আনা অর্থাৎ ১০০৲ টাকার ঋণ পত্রখানি (কাগজটী) নগদ ৯৬৷৷০ আনায় বিক্রয় করিয়াছেন। ১৯৩৪শের সেপ্টেম্বরে গভর্ণমেণ্ট ৩% সুদে ঋণ গ্রহণ করেন; ঐ ৩% কাগজ বিক্রয় করেন নগদ ৯৯৲ টাকায়। নতুন ঋণের ইস্তাহার দিবার সময় তাহার দাম ছিল ১০১৷৵০ আনা।

সরকারের আর্থিক অবস্থা কিছু গত বৎসরের চেয়ে খারাপ হয় নাই এবং ৩% কাগজের দামে একটা ধরাট্ (প্রিমিয়াম) রহিয়াছে ; সে ক্ষেত্রে নতুন কাগজ ৯৬৷৷০ আনায় বিক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, ৯৮৷৯৯ টাকায় বেচা উচিত ছিল অনেকের এই মত। সরকার ৩৭ কোটী টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্য যাঁহারা টাকা পাইতেন, এ বাজারে তাঁহারা শতকরা ৩৲ টাকার বেশী সুদে দীর্ঘ-মিয়াদে টাকা খাটাইতে পারিতেন না বলিয়াই বোধ হয় ; সুতরাং বর্ত্তমান ঋণে কিছু টাকা খাটান ছাড়া তাঁহাদের উপায় থাকিত না ; ঋণের টাকা ওঠার কিছু গোলমাল হইত না অথচ করদাতাদের কাঁধ হইতে কয়েক লক্ষ টাকার বোঝা নামিয়া যাইত।

আপাতঃ দৃষ্টিতে অবশ্য তাই মনে হয় ; কিন্তু একটু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলিলে বোঝা যাইবে যে স্যার অস্‌বার্ণ স্মিথ ও স্যার্ জেম্‌স্ গ্রিগ্ কিন্তু অন্যায় করেন নাই বরং ঠিকই করিয়াছেন। তাঁদের এই নীতির ফলে কোম্পানীর কাগজের দর (গিল্ট-এজেড্ সিকিও-রিটিস্) এখন কিছুকাল স্থির থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কের তহবিলে এখন অনেক টাকার সিকিওরিটী আছে ; ব্যবসা-বাণিজ্যের চাহিদার জন্য ব্যাঙ্ককে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে অতিরিক্ত পরিমাণ যে সিকিওরিটী হাতে আছে, তাই বেচিতে হবে ; এর ফলে কোম্পানী কাগজগুলির দর নেমে যাওয়ারই সম্ভাবনা। ঋণ গ্রহণের কিছুদিন পূর্ব্ব থেকে ১৯৪৭-৫০ কাগজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কই বেশী করিয়া বেচিয়াছেন। তার ফলে ৩½% সুদের কাগজের দর চড়িতে পায় নাই। যদি নতুন ঋণ ৯৮৷৯৯৲ টাকা দরে ছাড়া হইত তাহা হইলে লোকে ৩% কাগজ না কিনিয়া ১৯৪৭-৫০ কাগজ কিনিতে বেশী উন্মুখ হইত, কেননা তাহাতে তাহাদের লাভ ছিল,

তার ফলে নতুন ঋণটা তুলিতে বেগ পাইতে হইত। অধিকন্তু, শুধু বাজারের দরের দিকে নজর রাখিয়া যদি নতুন ঋণ ৯৮।৯৯ টাকা দরে ছাড়া হইত তাহা হইলে ৩½% কাগজের দর চড়িয়া যাইত এবং নগদ টাকা তহবিলে বাড়াবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেই ১৯৪৭-৫০, ৩½% সুদের কাগজ বেচিতে সুরু করিতেন, অম্‌নি ৩½%কাগজের দর ঝপাৎ করিয়া নামিয়া যাইত। যে ব্যবস্থা এখন করা হইয়াছে, তাতে কোম্পানীর কাগজের দর বিপর্য্যয় ভাবে ওঠা নামা করিতে পারিতেছে না। অবশ্য এখানেও বলা যায় যে ১৩ কোটী টাকা বাদ দিলেও কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ২৪ কোটী টাকা (৩৭ কোটী—১৩ কোটী) গভর্ণমেণ্ট পরিশোধ করিবেন; এই টাকাটা যখন সিকিওরিটীর বাজারে এসে পড়িবে তখন ৩১/২% কাগজের দাম কিছু চড়া হওয়ারই সম্ভাবনা। এবৎসর নোটের প্রচলন বেশ বাড়িয়া গিয়াছে; ক্লিয়ারিং হাউস রিটার্ণেও টাকার হিসাব বাড়িতে দেখা যাইতেছে; সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা সাড়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব ঋণ পরিশোধের কিছু টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে বলা অন্যায় হইবে না বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই জুলাই হইতে ট্রেজারি বিল ছাড়া বন্ধ করিয়াছেন। ট্রেজারি বিলও সরকারের ঋণ, কিন্তু এগুলির মিয়াদ মাত্র তিন মাস। ট্রেজারি বিল ছাড়া বন্ধ হওয়ায়, পরিশোধনীয় (আউট্‌ষ্ট্যাণ্ডিং) বিলের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিল্ ছাড়িতে আরম্ভ করিলে, টাকা খাটাবার একটা পথ হইবে। যদি অপ্রত্যাশিত একটা গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সিকিওরিটীর দরও স্থির (ষ্টেডি) থাকিবে, বেশী ওঠা নামা করিবে না বলেই বোধ হয়।

পরিশিষ্ট

ভারতীয় টাকাকড়ি

স্বর্ণ-মুদ্রা ও স্বর্ণতালের আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ

		আমদানী	
		কত আউন্স	মূল্য টাকায়
(ক)	১৯০০-০১ হইতে ১৯০৪-০৫ (গড়)		১৫,০৭,১৫,৫৩৯
(খ)	১৯০৫-০৬ ,, ১৯০৯-১০ ,,		১৭,৪৯,৬০,৪৯৫
(গ)	১৯১০-১১ ,, ১৯১৪-১৫ ,,	৪,৯০২,০২২	২৯,৯২,১৪,২৭২
(ঘ)	১৯১৫-১৬ ,, ১৯১৯-২০ ,,	৩,২২০,৮৬৮	১৯,৬৪ ৮৪,৭০৮
(ঙ)	১৯২০-২১ ,, ১৯২৪-২৫ ,,	৫,৫২৮,৬৯৯	৩৬,৪৫,২২,২৫০
(চ)	১৯২৫-২৬	৬,২০১,৫১৫	৩৫,২২,৯৯,৩৬৩
(ছ)	১৯২৬-২৭	৩,৪০৩,০০৬	১৯,৫০,১২,০০২
(জ)	১৯২৭-২৮	৩,১৮৮,০২৬	১৮,১৩,৪৪,০৬২
(ঝ)	১৯২৮-২৯	৩,৭৮৮,৫৮৫	২১,২১,৮৯,৬৯২
(ঞ)	১৯২৯-৩০	২,৫২৫,২৪৭	১৪,২৩,১১,৪৭৭
(ট)	১৯৩০-৩১	২,৩২৯,৬২৬	১৩,২৪,৫২,৪৫৩
(ঠ)	১৯৩১-৩২	৪৫০,০৫০	২,৭৯,৯৫,৩৬৪
(ড)	১৯৩২-৩৩	১৭২,৪১২	১,৩১,৮১,৩৯১
(ঢ)	১৯৩৩-৩৪	১৩৪,৯০১	১,০৯,৯৪২,৮৫
(ণ)	১৯৩৪-৩৫	৭৯,৯৯২	৭১,৯৩,১০১
(ত)	১৯২০-২১হইতে ১৫বৎসরের মোট	৪৯,৯১৬,৮৫৫	৩০৯,৭৫,৮৪,৪৪০

বর্ষ	রপ্তানী: কত আউন্স	রপ্তানী: মূল্য টাকায়	নিট্ আমদানী (+) বা রপ্তানী (−): কত আউন্স	নিট্ আমদানী (+) বা রপ্তানী (−): মূল্য টাকায়
(ক)	—	৮,৮৩,৭১,৭৬৫	—	+৬,২৩,৪৩,৭৭৪
(খ)	—	৫,৭৫,০৭,৪৩০	—	+১১,৭৪,৫৩,০৬৫
(গ)	৭৯০,৬৩৪	৪,৫৭,৯২,৫৫৫	+৪,১১১,৩৮৮	+২৫,৩৪,২১,৭১৭
(ঘ)	১,০৭৫,০৩৪	৬,২৩,৪১,৯৩২	+২,১৪৫,৮৩৪	+১৩,৪১,৪২,৭৭৬
(ঙ)	১,০০৮,৮৯২	৭,৭৪,২৬,৯৬৮	+৪,৫১৯,৮০৭	+২৮,৭০,৯৫,২৮২
(চ)	৬৫,৯৩৪	৩৭,৫৩,৫৬৪	+৬,১৩৫,৫৮১	+৩৪,৮৫,৪৫,৭৯৯
(ছ)	১৭,৪৭৭	১০,০৬,৫৫৪	+৩,৩৮৫,৫২৯	+১৯,৪০,০৫,৪৪৮
(জ)	৬,২৬৭	৩,৪৪,০৩৯	+৩,১৮১,৭৫৯	+১৮,১০,০০,০২৩
(ঝ)	৩,১৪৪	২,০২,৭১৪	+৩,৭৮৫,৪৪১	+২১,১৯,৮৬,৯৭৮
(ঞ)	১,৬৮৫	১,০৩,০৮১	+২,৫২৩,৫৬২	+১৪,২২,০৮,৩৯৬
(ট)	৮৬,৯৭৩	৪৯,৩৪,৩৩৮	+২,২৪২,৬৫৩	+১২,৭৫,১৮,১১৫
(ঠ)	৮,০৭৯,৪২৭	৬০,৭৭,২৩,২০৬	−৭,৬২৯,৩৭৭	−৫৭,৯৭,২৭,৮৪২
(ড)	৮,৫২৬,২৪১	৬৬,৮৪,০৯,৩৪৭	−৮,৬৫৩,৮২৯	−৬৫,৫২,২৭,৯৫৬
(ঢ)	৬,৮৩০,১৯৯	৫৮,১৫,৩০,২৪৬	−৬,৬৯৫,২৯৮	−৫৭,০৫,৩৫,৯৬১
(ণ)	৫,৭৭৪,৮১২	৫৩,২৫,৬৭,৭০৮	−৫,৬৯৪,৮২০	−৫২,৫৩,৭৪,৬০৭
(ত)	৩৪,৪৩৬,৬১৯	২,৭৮,৭৭,০৯,৬৩৭	+১৫,৪৮০,২৩৬	+৩০,৯৮,৭৪,৮০৩

শেষ চার বৎসরে প্রায় ২৯,২১০,৬৭৯ অাউন্স সোণা রপ্তানী হইয়াছে ; অর্থাৎ শেষ ১৫ বৎসরে যতটা পরিমাণ সোণা রপ্তানী হইয়াছিল তাহার ৫৮%-এর কাছাকাছি রপ্তানী হইয়াছে। সুতরাং এযাবৎ যত সোণা আসিয়াছে সে তুলনায় খুব ভয়ানক রকম রপ্তানী হইয়াছে বলা যায় না।

বাজারে ফি বৎসর কত টাকা চলে

চল্‌তি টাকাকড়ির পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

	টাকা	নোট	মোট
১৯১৯-২০	২০,০৯	২০,২০	৪০,২৯
১৯২০-২১	—২৫,৬৮	—৫,৯০	—৩১,৫৮
১৯২১-২২	—১০,৪৬	৯,৩৫	—১,১১
১৯২২-২৩	—৯,৫৬	৩,৮৭	—৫,৬৯
১৯২৩-২৪	৭,৬২	৭,৯৬	১৫,৫৮
১৯২৪-২৫	৩,৬৫	—২,৫১	১,১৪
১৯২৫-২৬	—৮,১৭	১,১৬	—৭,০১
১৯২৬-২৭	—১৯,৭৬	—৩,৪০	—২৩,১৬
১৯২৭-২৮	—৩,৭৫	১০,২২	৬,৪৭
১৯২৮-২৯	—৩,০৩	৩,৫৭	৫৪
১৯২৯-৩০	—২১,৭১	—১৮,৮০	—৪০,৫১
১৯৩০-৩১	—২১,৫৮	—১১,৩৭	—৩২,৯৫
১৯৩১-৩২	৩,৯৩	১৭,২৪	২১,১৭
১৯৩২-৩৩	—৭,৫৬	—১৪,৮৩	—২২,৩৯
১৯৩৩-৩৪	—৩	১৩,৫৪	১৩,২৪
১৯৩৪-৩৫	—৩,২১	— ৩২	—৩,৫৩
মোট	—৯৯,৪৮	২৯,৯৮	—৬৯,৫০
অ্যাভারেজ (গড়)	—৬,২২	১,৮৭	—৪,৩৫

চল্‌তি নোটের পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

গ্রস্ চল্‌তি	অ্যাক্‌টীভ	অ্যাকটীভ সার্কুলেশন কত বাড়িয়াছে
১৯২৬-২৭	১,৮৯,১৩	১,৫৬,৩৬	—৬,৮০
১৯২৭-২৮	১,৮০,১৬	১,৬৩,৬২	+৭,২৬
১৯২৮-২৯	১,৮৪,৮৬	১,৭১,৯০	+৮,২৮
১৯২৯-৩০	১,৮৩,১১	১,৬৩,০০	—৮,৯০
১৯৩০-৩১	১,৬৫,৪৯	১,৫১,১৩	—১১,৮৭
১৯৩১-৩২	১,৬৩,৬৪	১,৫২,৬২	+১,৪৯
১৯৩২-৩৩	১,৭৩,৮৩	১,৫২,০৪	—৫৮
১৯৩৩-৩৪	১,৭৮,১৩	১,৫৭,৪৭	+৫,৪৩
১৯৩৪-৩৫	১,৮৩,২৪	১,৬১,৬০	+৪,১৩

ক্লিয়ারিং-হাউসের হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

বর্ষ	কালকাতা	বোম্বাই	মোট
১৯১৮-১৯	৭,৪১,১৩		১৪,৩২,১৯
১৯১৯-২০	১০,৫৫,৭৬	৮,৮৩,০২	২০,৯০,৬০
১৯২০-২১	১৪,৩৯,৯৩		২৯,৭৬,৫৪
১৯২১-২২	৯,০৫,০১		২০,২৪,৯০
১৯২২-২৩	৯,৮০,২৬		২০,৬০,০৮
১৯২৩-২৪	৮,৫৩,০৫	৭,০৭,৯৮	১৮,০৩,০১
১৯২৪-২৫	৯,৫৪,১১	৬,২১,৬৬	১৮,০৬,৩৬
১৯২৫-২৬	১০,১২,১৯	৪,৪৫,০৫	

বর্ষ	কলিকাতা	বোম্বাই	মোট
১৯২৬-২৭	৯,৬১,০১	৪,২২,৬৮	১৬,০৯,৫৭
১৯২৭-২৮	১০,৫৪,০২	৩,৮৯,৮০	১৬,৭৪,৫৯
১৯২৮-২৯	১০,৯৪,০০	৬,৫২,৩৫	১৯,৮১,১০
১৯২৯-৩০	৯,৬০,৯৭	৭,৯৩,৬৬	১৯,৯৯,৭৪
১৯৩০-৩১	৮,৬৬,২৮	৬,৬৬,৬১	১৭,৩০,৬৫
১৯৩১-৩২	৭,৩১,০৯	৬,২৩,৮২	১৫,১৫,৬৬
১৯৩২-৩৩	৭,৯০,৩৭	৬,৬৭,৪২	১৬,১৮,৫৩
১৯৩৩-৩৪	৮,৩০,৮৮	৬,৫৫,৪৭	১৬,৪১,২০
১৯৩৪-৩৫	৮,৭৫,৬৯	৬,৮৯,১৭	১৭,৩৩,০১

১৯২৮ আগষ্ট মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল কারবার ক্লিয়ারিং হাউসের মারফৎ হইত না।

ডিস্‌কাউণ্ট রেট

১৯২৪	অ্যাভারেজ্‌	...	৬·৬৮
১৯২৫	,,	...	৫·৬৪
১৯২৬	,,	...	৫·১৭
১৯২৭	,,	...	৫·৭৩
১৯২৮	,,	...	৬·২০
১৯২৯	,,	...	৬·৩৩
১৯৩০	,,	...	৫·৮৯
১৯৩১	,,	...	৭·০৯
১৯৩২	,,	...	৫·০৩
১৯৩৩	,,	...	৩·৫৬

১৯৩৪	জানু	...	৩·৫
,,	ফেব্রুঃ	...	৩·৫
,,	মার্চ্চ	...	৩·৫
,,	এঃ	...	৩·৫
,,	মে	...	৩·৫
,,	জুন	...	৩·৫
,,	জুলাঃ	...	৩·৫
,,	আগঃ	...	৩·৫
,,	সেঃ	...	৩·৫
,,	অঃ	...	৩·৫
,,	নভে	...	৩·৫
,,	ডিঃ	...	৩·৫
১৯৩৫	জাং	...	৩·৫
,,	ফেঃ	...	৩·৫
,,	মাঃ	...	৩·৫

সোণা ও বিদেশে গচ্ছিত রিজার্ভ

(যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহার পর ছয়টী শূন্য বসিবে অর্থাৎ মিলিয়নে হিসাব দেওয়া হইয়াছে)

	ট্রেজারীতে (টাকায়)		বিদেশে গচ্ছিত (পাঃ)			
	সোণা	রূপা	পেঃ কারেন্সী রিজার্ভ	স্বর্ণমান রিজার্ভ	বিলাতে ট্রেজারীতে	মোট
১৯২৫-২৬	২৯৮	৮৩৩	২৯·০	৪০·০	১৫·৮	৮৪·৮
১৯২৬-২৭	২৯৮	১০৩৫	৫·৬	৪০·০	৯·২	৫৪·৮
১৯২৭-২৮	৩২৭	১০৮৫	২·৬	৪০·০	৭·৬	৫০·২

	সোণা	রূপা	পেঃ কারেন্সী রিজার্ভ	স্বর্ণমান রিজার্ভ	বিলাতে ট্রেজারীতে	মোট
১৯২৮-২৯	৩৪০	১০০৯	৫·১	৪০·০	৪·১	৪৯·২
১৯২৯-৩০	৩৫১	১০৮১	১·৪	৪০·০	১৫·৬	৫৭·০
১৯৩০-৩১	৩৫২	১২০০	—	৩৯·৬	১·৩	৪০·৯
১৯৩১-৩২	৪৪৩	১২৩০	—	১২·৩	১৩·৮	২৬·১
১৯৩২-৩৩	৪৪৪	১১০৭	—	২২·৯	১৯·০	৪১·৯
১৯৩৩ ৩৪	৪৪৪	১০১২	—	৩১·৭	১২ ৭	৪৪·৪

ব্যবসায় পুঁজি প্রয়োগ

১৯২৫-২৬	৩৪২,৬৫৮ সহস্র টাকা
১৯২৬-২৭	১৯৭,৪৬৪ ,, ,,
১৯২৭-২৮	২০৭,৩৩৬ ,, ,,
১৯২৮-২৯	২৮২,২২০ ,, ,,
১৯২৯-৩০	৬৬৭,৫১৮ ,, ,,
১৯৩০-৩১	২৮৯,৪৫১ ,, ,,
১৯৩১-৩২	৩২৯,৭৭৭ ,, ,,
১৯৩২-৩৩	৩৯৭,৪৩৮ ,, ,,
১৯৩৩-৩৪	৩৪১,৫০১ ,, ,,

গ্রন্থপঞ্জী

(বাংলা)

'অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার'—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

'একালের ধনদৌলৎ ও অর্থশাস্ত্র' ১ম ও ২য় ভাগ—
বিনয়কুমার সরকার

'টাকার কথা'—নরেন্দ্রনাথ রায়

'টাকার কথা'—অনাথগোপাল সেন

'দরিদ্রের ক্রন্দন'—রাধাকমল মুখার্জ্জী

'দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক'—নরেন্দ্রনাথ লাহা

'ধনবিজ্ঞান'—গিরীন্দ্রকুমার সেন

'ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা'—নরেন্দ্রনাথ রায়

'ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি'—শিবচন্দ্র দত্ত

'নয়া বাংলার গোড়া-পত্তন' ১ম ও ২য় ভাগ—বিনয়কুমার সরকার

'বাড়তির পথে বাঙালী'—বিনয়কুমার সরকার

'ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ্'—জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(ইংরেজী)

'আওয়ার রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক'—বি. ঘোষ.

'ইংলিশ্ প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ব্যাঙ্কিং'—মক্সন্

'ইণ্টার্ন্যাশান্যাল্ ট্রেড্'—পি. বি. হোয়েল্

'ইন্‌ট্রোডাক্‌শান্ টু দি ষ্টাডি অফ্ প্রাইসেস্'—ডব্লু. টি. লেটন্

'ইন্‌টার্ণ্যাশান্যাল্ ফাইনান্স'—উইদার্স্

'ইন্‌টার্ণ্যাশান্যাল্ বাইমেটালিজ্‌ম'—ওয়াকার্

'ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সী অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ'—কে. সি. মাহিন্দ্র
'ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেমস্'—বিনয় সরকার
'ইণ্ডিয়ান্ ব্যাঙ্কিং কমিটী রিপোর্ট'
'ইণ্ডিয়ান্ সেণ্ট্র্যাল্ ব্যাঙ্কিং কমিটীস্ রিপোর্ট'
'ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স'—বিনয় সরকার
'এক্স্চেঞ্জ কণ্ট্রোল্'—পল্ আইন্ৎসিগ্
'এক্সটার্ণ্যাল্ ক্যাপিট্যাল্ কমিটী রিপোর্ট'
'এ ট্রিটিজ অন্ মানি'—জে. এম. কেইন্স্
'এপ্লায়েড্ ইকনমিক্স্—প্রথম ভাগ'—বিনয় সরকার
'এ-বি-সি অফ্ ফরেন্ এক্স্চেঞ্জ'—ক্লেয়ার্
'এভলিউশন্ অফ্ দি মানি মার্কেট'—পাওয়েল্
'ওয়ার্ টাইম্ ফাইনান্সিয়্যাল্ প্রব্লেম্স্'—উইদার্স্
'কারেন্সী রিফর্ম ইন্ ইণ্ডিয়া'—কালে
'কারেন্সী অ্যাণ্ড ক্রেডিট্'—আর্ জি হট্রে
'থিওরী অফ্ ইন্টার্ণ্যাশান্যাল্ ট্রেড্'—ব্যাষ্টেব্ল্
'দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ অ্যাণ্ড ইট্স্ ফিউচার'—টি, ই, গ্রেগরী
'দি ইণ্ডিয়ান্ মানি মার্কেট'—কে, কে, শর্ম্মা
'দি রিটার্ণ অফ্ প্রটেক্শান্'—স্মার্ট
'দি মেকানিজ্ম্ অফ্ এক্সচেঞ্জ'—জে, টড্
'দি প্রিন্সিপ্ল্ অফ্ মানি অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং'—সি, কোনাণ্ট
'দি মডার্ণ ব্যাঙ্ক'—ফিস্ক্
'দি ফেডারেল্ রিজার্ভ সিষ্টেম্ ইন্ অপারেশন্'—ই. এ. গোল্ডেন্
-ভাইজার
'দি পার্চেজিং পাওয়ার্ অফ্ মানি'—ফিশার

'দি কেস্ এগেন্স্ট্ বাইমেটালিজ্ম্'—গিফিন্
'দি এফেক্ট অফ্ ওয়ার অন্ দি এক্সটার্ণ্যাল্ ট্রেড্ অফ্ ইউনাইটেড্ কিংডাম'—বোলে
'পেপার্স অন্ গোল্ড অ্যাণ্ড প্রাইস্ লেভেল্'—জে, সি, ষ্ট্যাম্প
'পপুলার ফ্যালাসিজ্ রিগার্ডিং বাইমেটালিজ্ম্'—আর, পি, এজ্কাম্ব্
'পার্চেজিং পাওয়ার অ্যাণ্ড দি ট্রেড্ ডিপ্রেশন্'—ই, এফ্, এম্, ডাবিন্
'প্র্যাক্টিক্যাল্ ব্যাঙ্কিং'—ব্যাগ্শ
'প্রেজেণ্ট ডে ব্যাঙ্কিং ইন্ ইণ্ডিয়া'—রাও
'ফাইন্যান্শিয়্যাল্ ডেভলপ্মেণ্ট ইন্ মডার্ণ ইণ্ডিয়া'—ভকিল্
'ফরেন্ এক্সচেঞ্জ'—টি, ই, গ্রেগরী
'ফরেন্ এক্সচেঞ্জ অ্যাণ্ড ফরেন্ বিল্স্'—স্পাল্ডিং
'ফরেন্ ব্যাঙ্কিং সিষ্টেম্'—উইলিস্ অ্যাণ্ড বেক্হার্ট
'ফাউণ্ডেশন্স্ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ ইকনমিক্স্'—রাধাকমল মুখার্জ্জী
'বাইমেটালিজ্ম্'—ডারুইন্
'ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ক্রেডিট্'—উইদাস্
'ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড কারেন্সী'—সাইক্স্
'ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল্ ফাইনান্স ইন্ ইণ্ডিয়া'—এন্, দাস
'মানি'—ডি, এচ্, রবার্টসন্
'মানি'—ই, কেনান্
'মানি'—জেভন্স্
'মানি, এক্সচেঞ্জ অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং'—ইষ্টন্
'মানি মার্কেট প্রাইমার'—ক্লেয়ার্
'মানি অ্যাণ্ড ইট্স্ রিলেশন্ টু প্রাইস্'—প্রাইস্

'মানি অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং—অ্যান্ ইণ্ট্রোডাক্শান্ টু দি ষ্টাডি অফ্ মডার্ণ কারেন্সীজ্'—স্কট্

'মাইনরিটী রিপোর্ট অফ্ দি ইণ্ডিয়ান্ ব্যাঙ্কিং কমিটী'

'রিপোর্টস্ অফ্ কারেন্সী কমিটীস্'

'লম্বার্ড ষ্ট্রীট'—ব্যাজ্হট্

'সেফ্টী অফ্ ক্যাপিট্যাল্'—ই. এম্. হার্বি

'হোয়াট্ এভ্রিবডি ওয়াণ্টস্ টু নো এবাউট্ মানি'—কোল্

'হিষ্ট্রী অফ্ মডার্ণ ব্যাঙ্কস্ অফ্ ইস্থ্'—কোনাণ্ট

'হিষ্ট্রী অফ্ দি ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড'—অ্যান্ড্রিড্স্

নির্ঘণ্ট

		পৃষ্ঠা
উদ্ধৃতি	...	১১৮
কন্‌ভার্টিবিলিটি	...	৩৮
কাগজী মুদ্রা, গচ্ছিত অর্থের নিদর্শন	...	৭৯
,, প্রতিজ্ঞা সম্বলিত অর্থ	..	৭৯, ৮০
,, অপরিশোধনীয় অর্থ	...	৮০
,, ও ধাতু মুদ্রার তফাৎ	...	৮০, ৮১
,, কেন চলে	...	৮২
,, কতটা চলিতে পারে	...	৮৩
,, সুবিধা	...	৮৪
,, অপব্যবহার	...	৮৪, ৮৫
,, অতি মাত্রায় ছাড়ার লক্ষণ	...	৮৬, ৮৮
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, নোট ছাড়ার নিয়ম	...	১০২, ১০৩
,, ঋণদান	...	১০৫, ১০৮
,, ও টাকাকড়ির পরিমাণ	...	১০৭
,, ও বাট্টার হার	...	১৩২
ক্রয়শক্তির সাম্য	...	৩৮, ৩৯
ক্রেডিট্	...	৯১
,, ও স্বর্ণমান	...	৯২
,, ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টস্	...	১২৩
,, ট্র্যাভলিং লেটার্স	...	১২৩

ক্রেডিট্ সার্কুলার নোট্স্ ... ১২৩
গ্রেশাম বিধি ... ৫০, ৫১
,, কখন খাটে ... ৫৩, ৫৪
,, ও মিশর ... ৫৩
টাকাকড়ি, বিনিময়ের বাহন ... ২
,, সাধারণ পরিজ্ঞাপক ... ৩
,, মূল্যের মান ... ৪
,, মূল্যের ভাণ্ডার ... ৫
,, ও বিনিময়সাধ্য সিকিওরিটীস্ ... ৫
,, স্থগিত পরিশোধের নিদর্শন ... ৬
,, স্বেচ্ছাচারী নিদর্শন ... ১৪
,, ক্রয়শক্তি ... ৩৩
,, দালাল ... ৯৮
দর, টাঁকশালী ... ১৪, ১৬
,, লণ্ডনে ... ১৫
,, ও মূল্য ... ২২, ২৩
,, ও খাতক-মহাজন ... ২৪, ২৫
,, ও শ্রমিক-মসীজীবী ... ২৫
,, ও অসভ্য জাতি ... ২৬
,, ও সুদ ... ২৬
,, ও সূচিসংখ্যা ... ২৭, ২৮
,, ও টাকাকড়ির পরিমাণ ... ৩১, ৩৭
দ্বিধাতুমান ও খোলা টাঁকশাল ... ৫৯
,, ও ইংল্যাণ্ড ... ৬০, ৬১, ৬২

দ্বিধাতুমান ও ফ্রান্স ... ৬২, ৬৩, ৬৪
,, ও জার্ম্মাণী ... ৬৪, ৬৫
,, ও ল্যাটীন ইউনিয়ন্ ... ৬৬
,, ও ভারতবর্ষ ... ৬৬—৭০
,, ও যুক্তরাষ্ট্র ... ৭০, ৭১
,, প্রচলন সম্ভাবনা ... ৭৬, ৭৭
বাণী ... ১৪
ব্রাসেজ্ ... ১৪
বিনিময়-সাম্য ... ৩৩—৩৭
বিনিময় হার, ওঠানামা ... ১১৯—১২১
,, ও ব্যাঙ্ক ... ১২২
,, ও আর্বিট্রেজ্ ... ১২৪
,, ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ ... ১২৬
,, ও বৈদেশিক ঋণ ... ১২৬
,, ও সিক্কা ... ১২৬
বিল্ অফ্ এক্স্চেঞ্জ ৯৯, ৮৭, ৮৮, ১০৪
ব্যাঙ্ক তহবিল ... ১২৭
,, আমানৎ ৯৩, ৯৭, ১০৫, ১০৬, ১০৯
,, ও বাট্টার হার ... ১২৯
মান, একবিধ ধাতু ... ৪০
,, দ্বিধাতু ... ৪১
,, স্বর্ণবিনিময় ... ৪১, ৪২
,, লিম্পিং ... ৪২
,, স্বর্ণতাল ... ৪৩

,, গোল্ড ক্যার্ণহ্বেরুং ... ৪৪

,, পরিশোধনীয় কাগজ ... ৪৫

,, অপরিশোধনীয় কাগজ ... ৪৬

,, পরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক নোট্ ... ৪৭

,, অপরিশোধনীয় ব্যাঙ্ক নোট্ ... ৪৭

মিণ্ট পার্ ... ১১৪

মুদ্রা ... ১২

,, বিভিন্ন দেশে ... ১৭—২১

,, অবাধ তৈরী ... ১৩

,, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ... ১৭

,, গৌণ ... ১৭

,, লিগ্যাল টেণ্ডার ... ১৭

সূচিসংখ্যা ও বেস্ প্রাইস্ ... ২৭

,, ও জীবন যাত্রার ধারা ... ২৮—৩০

,, ও ওয়েটড্ অ্যাভারেজ্ ... ২৯

স্বর্ণবিন্দু ... ১১৭

হুণ্ডী ... ৯৯, ১০০

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার-প্রণীত

প্রথম ভাগ;—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার। সূচী :— যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্প-গবেষণা; জমিজমা ও ঘরবাড়ীর নববিধান; ফ্রান্সে দুধের দর; একালের গৃহস্থালী ও নারী-সমাজ; মজুর-আইন ও মজুর-আন্দোলনের ধারা; লোক-চলাচল, পুঁজি-চলাচল ও মাল-চলাচল; ব্যাঙ্কের দৌলত, ব্যাঙ্কের ঝুঁকি ও ব্যাঙ্ক-শাসন; মুদ্রা-সংস্কার, সোনার টাকা আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক; রকমারি অর্থ-সাহায্য; বিলাতী রাজস্বের একাল-সেকাল; শিল্প-বাণিজ্যের কার্টেল ও ট্রাষ্ট; ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাংলা; সম্পদ্‌বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল; দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের আবহাওয়া।

৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৷০।

দ্বিতীয় ভাগ,—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা। সূচী :— ধনবিজ্ঞানে যুক্তিনিষ্ঠা কি চীজ? আর্থিক ইতিহাসের দু-এক টুক্‌রা; অর্থনৈতিক চিন্তার নমুনা; পল্লী-বিজ্ঞান ও কিষাণ-তত্ত্ব; লোক-সমস্যা ও লোক-বিজ্ঞান; মজুর ও মজুরি; আন্তর্জ্জাতিক মাল-বিনিময় ও পুঁজি-লেনদেন; মুদ্রা-নীতি ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা; বীমা-ব্যবসার একাল-সেকাল; সরকারী গৃহস্থালীর অর্থশাস্ত্র; সোভিয়েট শাসনের আর্থিক দরদ; ফরাসী ও ইতালিয়ান আর্থিক পত্রিকা; অর্থ-সাহিত্যের মার্কিণ-জাপানী-বিলাতী পত্রিকা; জার্ম্মাণ পত্রিকায় ধনবিজ্ঞান; অর্থশাস্ত্রে লীগ অব নেশ্যন্‌স্; দুনিয়ার আর্থিক দুর্য্যোগ ও আরোগ্য-লাভ; সমাজ-তন্ত্র, পুঁজিনিষ্ঠা ও দেশোন্নতি, রকমারি

অর্থশাস্ত্রী ; সীমান্ত-ভোগের অর্থশাস্ত্রী ফোন ভীজার ; গণিতনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রী লেঅঁ ভাল্‌রা ; স্বাধীনতার অর্থশাস্ত্রী কাস্‌সেল ; পান্তা-লেঅনি ও পারেত ; চক্রশাস্ত্রী কার্লি ; ইতালির ভূমি-সংস্কার ("বনিফিকা")-শাস্ত্রীর দল ; সংখ্যাশাস্ত্রী বেনিনি ; জিনি, মর্ত্তারা, পিয়েত্রা ; ভূমি-শাস্ত্রী সাঁ-জেনি ; ফরাসী লোক-শাস্ত্রীর দল ; বাণিজ্যবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী জিদ্‌ ; জমিজমার অর্থশাস্ত্রী জেরিং ; "বিশ্বদৌলৎ"-শাস্ত্রীর দল ; রোশার-শ্‌মোল্লার-সোম্বার্ট বনাম "ক্লাসিক"-মেঙ্গার-শুম্‌পেটার ; আডাম ম্যিলার-মণ্ডল ও ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিষ্ট অর্থশাস্ত্র ; অর্থশাস্ত্রের মাকিণ ধারা ; জন বেট্‌স্ ক্লার্ক ; প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র ; অর্থকথার সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন ; সমাজ-সেবার অর্থশাস্ত্রী পেথিক-লরেন্স, পিগু ও হব্‌সন ; আয়-শাস্ত্রী বোলে ; উদারীকৃত পুঁজিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী কেইন্‌স্ ; মূল্যশাস্ত্রী মার্শ্যাল ; বাড়্‌তি-নিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী কেনান্‌ ; জাপানী অর্থশাস্ত্রীর দল ; রাজস্বশাস্ত্রী ওহুচি ; লোকশাস্ত্রী উয়েদা ; গুজরাত-বোম্বাই-মাড়োয়ারের প্রভুত্ব হইতে বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের মুক্তিলাভ (১৯২৬) ; ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের ধরণ-ধারণ ; তুলনা-সাধন ও "সাম্য-সম্বন্ধ" ; রাণাডে ও রমেশ দত্ত ; সতীশ মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা উকিল ; কৌটল্য-শুক্র-আবুলফাজ্‌ল্‌-রামমোহনের বংশধরগণ ; "আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী ; ধনবিজ্ঞানে পরিভাষার মামলা ; বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত ; বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচিত বিষয়সমূহ ও অর্থনৈতিক কর্ম্মকৌশল ; সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব।

৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲ ।

(৩)

ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত-প্রণীত

সূচীপত্র ঃ—ভারতে বৈদেশিক মূলধন ; সমবায়ে দোকানদারী ; ক্যাপিটাল লেভি ; ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার বর্ত্তমান ঝোঁক কোন্ দিকে ; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা ; ভারতের লোক-সংখ্যা সমস্যা ; সংরক্ষণ-শুল্কের কুফল ; র‍্যাশনালিজেশন ও বেকার-সমস্যা ; ১৯১১ সনের ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইন ; মূলধনের যোগান ; ফ্যাক্টরি-সঙ্ঘ লাভবান হয় কখন ; বৈদ্যুতিক রেলওয়ে বিস্তার অবশ্যম্ভাবী ; আসামের চা-শিল্প ; বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ; কয়লার খনির মজুর ; কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-বিক্রয় ; ব্রিটিশ শিল্প-প্রদর্শনীর জন্মকথা ; বার্ম্মিংহাম চেম্বার অফ্ কমার্স ; জার্ম্মাণ মজুরের "কর্ম্মসভা" ; ব্রজেন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মতামত ; মার্কিণ শিল্পগুলার কি দুর্দ্দিন উপস্থিত ? ইউরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাতের শিল্পসমূহ ; রুশিয়ার গস্‌প্ল্যান ; বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার ; অষ্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক মজুরি-নির্দ্ধারণ ; ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার আবশ্যকতা ; ডাইয়োসেসন কলেজের ধনবিজ্ঞান সমিতি ; কারখানা-শিল্প বনাম কুটির-শিল্প ; বাঙ্গালা দেশের রাস্তা-সমস্যা ; বিলাতের বেকার-সমস্যা ; ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপনের সুফল ; সংরক্ষণ-শিল্প ও মার্কিণ শ্রমিক-সঙ্ঘ ; সোভিয়েট রুশিয়ার আর্থিক নীতি ; স্থানবদ্ধ শিল্প-সমাবেশের সুফল ; নিখিল জগত বাণিজ্য-আদালত।

৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত

সূচী ঃ—ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার ; যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কের কারবার। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক-বৈচিত্র্য ; ক্যানাডার ব্যাঙ্ক-রহস্য ; অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক-সম্পদ ; জাপানে ব্যাঙ্কের বহর ; ব্যাঙ্ক-বিস্তারে ইতালি ; জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ; ফরাসী ব্যাঙ্ক-প্রসঙ্গ ; বিলাতী ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা ; আধুনিক ব্যাঙ্ক-জগতের গতি।

৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০।

ধনদৌলতের রূপান্তর

(ফরাসী অর্থশাস্ত্রী পোল লাফার্গ্-প্রণীত)

অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সূচী ঃ—সমাজ-চিন্তায় নবীন দর্শন ; বর্ত্তমান জগতের ধনদৌলত ; জাতিগত ধনদৌলত ; ধনবিজ্ঞানে নৃতত্ত্বের কথা ; চাষ-আবাদের জন্ম-কথা ; পরিবারগত ধনদৌলত ; পরিবারের ইতিহাস ; চাষ-আবাদের ক্রমবিকাশ ; ফিউদ্-যুগের ধনদৌলত ; পাশ্চাত্য জমিদার ; সেকালের রাইয়ৎ ; বুর্জোআ-সমাজের ধনদৌলত ; ঐতিহাসিক ক্রম-গঠন ; বর্ত্তমান জগৎ ; আর্থিক নববিধানের সূত্রপাত।

২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

(জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্‌-প্রণীত)

অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সূচী :—কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ ও ফ্রীড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্‌ ; মান্ধাতার আমল ; পরিবারের ইতিহাস ; বিবাহ-তত্ত্ব ; ভাইয়ে-বোনে বিবাহ ; পুনালুয়া পরিবার ; জোড় পরিবার ; একপতি-পত্নীত্ব-মূলক পরিবার ; ইরোকোআ-দের গোষ্ঠী-প্রথা ; গ্রীক সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা ; আথেনিয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ; রোমাণ সমাজে গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র ; কেল্টিক ও জার্ম্মাণ জাতির গোষ্ঠী-প্রথা ; জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ; বার্ব্বার জীবন ও "উৎকর্ষ" ; জানোআর-চাষে আর্থিক বিপ্লব ; কৃষি ও শিল্পের আবিষ্কার ; লোহার আর্থিক প্রভাব ; বিনিময় ও শ্রম-বিভাগ ; মুদ্রার আবির্ভাব ; আধুনিক সভ্যতার সু-কু ; মানবজাতির ভবিষ্যৎ ।

৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৹ ।

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি

(জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ্‌ লিষ্ট-প্রণীত)

অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সূচী :—অনুবাদকের ভূমিকা ; ইতালিয়ান শিল্প ও বাণিজ্য ; হান্সা-নগরাবলীর শিল্প ও বাণিজ্য ; ওলন্দাজ শিল্প ও বাণিজ্য ; বিলাতের শিল্প ও বাণিজ্য ; স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজ শিল্প ও বাণিজ্য ; ফরাসী শিল্প ও বাণিজ্য ; জার্ম্মাণির শিল্প ও বাণিজ্য ; রুশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য ; ইয়াঙ্কিস্থানের শিল্প ও বাণিজ্য ; ইতিহাসের উপদেশ ।

২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ ।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

শ্রীবিনয়কুমার সরকার-প্রণীত

প্রথম ভাগ,—তত্ত্বাংশ। সূচী ঃ—প্রকাশকের নিবেদন ; নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত ; ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি ; ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈববীম। ; জমিজমার আইনকানুন ; মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ ; ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ ; আর্থিক জগতে আধুনিক নারী ; কাউন্সিল-বাছাইয়ের অর্থকথা ; বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন ; ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা।

৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, মূল্য ২৷৷০ ।

দ্বিতীয় ভাগ,—কর্ম্মকৌশল। সূচী ঃ—যুবক বাংলার কর্ম্ম-ক্ষেত্র ; অর্থশাস্ত্রে ভাঙ্গন-গড়ন ; নয়া বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি ও অর্থ-শাস্ত্র ; ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে বাঙ্গলার ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার মুক্তি-লাভ ; আর্থিক জীবনে পরের ধাপ ; বাঙালী, ভারত ও দুনিয়া ; বঙ্গ-সমাজের রূপান্তর ও নিরক্ষরের অধিকার ; আত্মপ্রতিষ্ঠার সমাজশাস্ত্র।

৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

বাড়্‌তির পথে বাঙালী

শ্রীবিনয়কুমার সরকার-প্রণীত

ভূমিকা (অধ্যাপক বাণেশ্বর দাশ কর্ত্তৃক লিখিত) ;

সূচী ঃ—বাড়্‌তির পথে বাঙালী ; এই সাত বৎসর ; বাঙালীর ব্যাঙ্ক-দৌলত ; মজুর-শক্তি ও দেশোন্নতি ; রেলসম্পদের বাড়্‌তি-জরীপ ; আঠার পেন্সের রূপৈয়ায় চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের উপকার ; জন্মমৃত্যু-বৃদ্ধির হারে বাঙালী জাতি ; বঙ্গ-সমাজে চাষী-মধ্যবিত্ত-জমিদার।

৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩৷৷০ ।

বঙ্গ পরিচয়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

সূচী ঃ—বাঙলাদেশ ; বাঙলার ভূতত্ত্ব ; বাঙলার জলবায়ু ; বাঙলার উদ্ভিদ্ ; বাঙলার জীব-জন্তু ; বাঙলার নৃ-তত্ত্ব ; বাঙলা ভাষা ; বাঙলার সীমান্ত ; আয়তন ও জন-সংখ্যা ; বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু ; প্রবাসী ও 'পরদেশী' ; স্বাস্থ্য ও ব্যাধি ; শহর ও গ্রাম ; বাঙলার উপজীবিকা ; অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য ; বাঙলার সমাজ ; বাঙলার ইতিহাস ; বাঙলার জাতীয় জীবন ; বাঙলার শিক্ষা ; বাঙলার সাহিত্য ; শাসন ও ব্যবস্থাপক সভা ; বাঙলার শাসন ও বিচার বিভাগ ; পুলিশ বিভাগ ; পূর্ত্তবিভাগ ; স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ; মুন্সিপালটি ; জমি-বন্দবস্ত ও রাজস্ব।

৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৷৷০ ।

বাংলায় ধনবিজ্ঞান

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে আলোচিত এবং "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত রচনাবলীর সংগ্রহ। লেখকদের নাম ঃ—বিনয়কুমার সরকার, লেডী অবলা বসু, হীরালাল রায়, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, জগজ্জ্যোতি পাল, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সুধাকান্ত দে, নরেন্দ্রনাথ রায়, তাহের উদ্দিন আহম্মদ, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অমূল্যচন্দ্র উকিল, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শিবচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ অধিকারী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, সুষমা সেনগুপ্তা, মন্মথনাথ সরকার, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীশ রঞ্জন বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ লাহা, কামাখ্যা চরণ বসু,

মনীন্দ্র মোহন মৌলিক, বাদল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণেশ্বর দাশ, প্রমোদকুমার দাশগুপ্ত, গোপালচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রুক্মিনী কিশোর দত্তরায়, সন্তোষকুমার জানা, দেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, মধুসূদন মজুমদার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

প্রায় ১,০০০ পৃষ্ঠা (যন্ত্রস্থ)।

আর্থিক চিন্তার ইতিহাস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ-প্রণীত

সূচীপত্র ঃ—আর্থিক চিন্তার উৎপত্তি ; প্রাচীন হিন্দুর আর্থিক চিন্তা ; হিব্রুদের আর্থিক চিন্তা ; রোমান্ আর্থিক চিন্তা ; মধ্যযুগের আর্থিক চিন্তা ; মার্কেন্টিলিজ্‌ম্ বা বাণিজ্যবাদ ; কেমারেলিজ্‌ম্ ; ফিসিওক্র্যাট্‌স্ ; অ্যাডাম্ স্মিথ্ ও শিল্প-বিপ্লব ; ম্যাল্‌থাস্ ও জনবল-তত্ত্ব ; রিকার্ডো ও খাজনাতত্ত্ব ; কেরি ও আমেরিকান্ চিন্তা-পদ্ধতি ; বাস্তিয়ার মতামত ; সিনিয়র ; সে, রাও, ও অন্যান্য জার্ম্মাণ-ফরাসী অর্থশাস্ত্রী ; কোন ট্যুনেন ; লডার্ডেল ও রে ; সিসমঁদি ; ম্যালার, লিষ্ট ও কেরী ; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের সমাজতন্ত্র ; জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ; জার্ম্মাণীর বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র ; বিনিময়-মূল্যের অর্থকথা ; জার্ম্মাণীর ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞান ; পুঁজি, মুনাফা ও মূল্যতত্ত্ব ; মজুরী-তত্ত্ব ; লয়েড্, গস্‌সেন্, জেভন্‌স্ ও ভাল্‌রা ; অষ্ট্রিয়ান্ চিন্তা-পদ্ধতি ; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর্থিক চিন্তার অবস্থা ; জার্ম্মাণী, ইতালী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ; বিংশ শতাব্দীর ধনবিজ্ঞান ; বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় আর্থিক চিন্তা।

(৩০০ পৃষ্ঠা যন্ত্রস্থ)